মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড।

কলিকাতা।

বাগবাজার আদরিণী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
শ্রীমাখনলাল দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯০ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ খণ্ড] ১২৯০ সাল। [১ম সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

আজি আমাদের সাধের "আদরিণী" তৃতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। কয়েক বৎসরের মহাতরঙ্গ বিতাড়িত সাহিত্য সমুদ্রের প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে যেরূপ নির্ভিকহৃদয়ে অপ্রতিহত ভাবে আমাদের মনোরমা তরণীখানি ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছে—তাহা প্রিয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। যে উত্তাল তরঙ্গ প্রতিঘাতে—"বঙ্গদর্শন" রূপ রণতরি চূর্ণপ্রায়, "আর্য্যদর্শন" "বান্ধব" প্রভৃতি ডুবু ডুবু, সেই বঙ্গক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অসহায়া আদরিণীর প্রতিপত্তি শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ কি? আজ কাল গ্রাহকাভাবে এবং তাঁহাদের অনিয়মিত মূল্য প্রদানের অসৌজন্যে সাময়িক পত্রিকা সমূহের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে—ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা

আমোদসহকারে আমাদের চিরহিতৈষী প্রিয় গ্রাহকগণের গোচর করিতেছি যে, আদরিণীর সে সম্বন্ধে দুঃখ নাই বরং আহ্লাদ করিবার বিষয় আছে। ঈশ্বরেচ্ছায় আজি আদরিণীর গ্রাহক সংখ্যা দুই সহস্রের ন্যূন নহে এবং অধিকাংশ গ্রাহক মহোদয়ই আদরিণীর পরম মিত্র, তাঁহাদের নিয়মিত মূল্য প্রাপ্তিতেই আদরিণী এ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাহার চতুর্বার্ষিক জন্মদিনে আদরিণী তাহার প্রণম্যগণকে প্রণাম ও অপরাপরগণকে যথাযথ সম্বর্দ্ধনা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল। ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করিবেন এবং তাহার পরম হিতৈষী গ্রাহকগণ তাহার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ ও যত্ন প্রকাশ করিবেন ইহাই তাহার একান্ত ইচ্ছা।

শেষ কথা,—আদরিণীতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন গ্রাহকই কোন কথা উত্থাপন করেন নাই, বোধ হয় তাহাতে তাহাদের মনঃপুতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা গ্রাহকগণকে অনুরোধ করি যে তাহারা প্রবন্ধের উপযোগিতা অথবা কিরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে আদরিণী তাহাদের নিকট আরও আদর পাইবে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দেন, আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আদরিণী আনন্দময়ী বালিকা, আদরিণীর এখনও ততদূর চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই সেই নিমিত্তই আদরিণীতে কষ্টকল্পনাভূত গাঢ়-চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় নাই, সংক্ষেপে আদরিণী যে উদ্দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, আপনাকে যেরূপ ভাবের সাময়িক পত্রিকা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় সাহিত্য সংসারে অবতরণ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু গ্রাহকগণের রুচিই আদরিণীর রুচি, গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টিই আদরিণীর দীক্ষামন্ত্র সুতরাং গ্রাহকগণ যদ্যপি আদরিণীতে সেরূপ চর্ব্বিতচর্ব্বণ প্রভৃতির কূটতর্ক ভালবাসেন তাহা হইলে আদরিণী বালিকা হইলেও সে কার্য্যে যুবতীর বা কোন বিজ্ঞ যুবকের সমকক্ষ হইতে বোধ হয় অপারগ হইবে না, আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে অনেকে বঙ্গদর্শন প্রভৃতির অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন না—অধিক কি জোড়া পাতা জোড়াই থাকে কাটাও হয় না, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমরাও সাহসী নহি, সুতরাং আদরিণীর

কোমল কলেবরে সেরূপ কঠিন দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া বালিকার উদ্যম ভঙ্গ করিতে সাহস পাই না। আশা করি আদরিণীর চিরহিতৈষী প্রিয় গ্রাহক ও পাঠকগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যথাযথ মতামত লিখিয়া আমাদিগকে সন্তোষিত করিবেন।

উপসংহারে একটী কথামাত্র উল্লেখ করিয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিলাম। এ বৎসর সাহিত্য সংসারের সুপরিচিত গুটি কত নূতন লেখক তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত নূতন নূতন রত্নালঙ্কারে আদরিণীর কম কলেবর সুসজ্জিত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আরও যাঁহাদের অটুট যত্নে আদরিণী কয় বৎসরে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে আজি আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সহিত আমার এত আত্মীয়তা এত বন্ধুতা যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলে পাছে তাঁহারা কিছু মনে করেন সে নিমিত্ত তাহা উল্লেখে বিরত হইলাম।

এখন আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আদরিণী সাহিত্য জগতে দিন দিন প্রতিপত্তি লাভ করুক, প্রিয় পাঠক আপনিও একবার আমার সহিত এক মনে "স্বস্তি" "স্বস্তি" বলিয়া আদরিণীর প্রতি আপনার যত্ন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করুন।

শুভাগমন।

(মহামতী লর্ড রীপনের কলিকাতায় শুভাগমন উপলক্ষে।)

কেন শুনি আজি এ আনন্দ রোল,
সুখের লহরী উজান বয়,
হাসি হাসি হাসি এ ভারতবাসী,
এ ভাব কেন বা হ'ল উদয়?
বিষাদ আগার ভারত ভুবনে
এ আনন্দধ্বনি উঠিল কেন,

উৎসাহ উল্লাস, আনন্দ বিকাস,
সহসা কি ভাব উদিল হেন ?
আবাল বনিতা, বৃদ্ধ বযো যুতা,
সকলে নেহাবি আনন্দময,
বিষাদ আগাব, ভারত মাঝাব,
নূতন জীব কি হ'ল উদয় ?
অমনিশাকাশে হ'ল কি উদয
অকস্মাৎ হায পূর্ণ শশধব,
কিম্বা তাপদগ্ধ শুষ্ক তরুবর
বিকাশিল হেন কুসুমেব থব ?
সকলি সম্ভব এই ভবপুবে
কিন্তু অসম্ভব সুধু মনে গণি,—
সুখ স্বপ্ন যত, হযেছে বিগত,
ভাবত জননী চিব অভাগিনী।
কেহ নাহি মাব ভাবত ভুবনে
মুছাতে বিষণ্ণ কমল-বদন,
মোহিনী মাযায ভুলিযা সকলে
ভাগ্যহীন সুত ঘুমে অচেতন।

২

তবে কেন শুনি এ আনন্দ বোল
সঙ্গীত তবঙ্গ বহিছে কেন,
কাতাবে কাতাব লোক অগণন
ভুলি জাতি ভেদ ছুটিছে হেন।
আনন্দেব ছবি নয়নে নযনে,
এ উল্লাস আজি কিসেব তবে,
জযেব নিনাদ জয় জয ধ্বনি
কবিছে সকলে হৃদয ভবে ?

অহো বুঝিয়াছি ভারতের সেই
অভিন্ন হৃদয় বান্ধব রতন,
অভাগিনী এই ভারত জননী
মহা পুণ্যবলে পেয়েছে যে ধন।
সেই মহাশয় ইংরাজ ভূষণ
ভারতের বন্ধু অনাথ সহায়,
মানব আকারে দেবতা নিশ্চয়
আসিছেন সেই মনুজ হেথায়,
তাই আজি এত আনন্দ লহরী
তাই আজি দেশ আনন্দময়,
তাই আজি বলে সবে সমস্বরে
জয় জয় জয় রীপনের জয়।

৩

আর কি ভারত মাতা
শোক দুঃখ দূর কর,
তোমার সহায়, ওই
রীপন আসিছে হের।
সয়েছ মা কত জ্বালা
গণনা না হয় তার,
সে যাতনা দেখে মাগো
থামে না নয়নাসার।
অগণিত রীপুপদ
সহেছ জননী কত,
দলিত তোমার দেহ
হয়েছে মা কত ক্ষত,
অত্যাচারী ইংরাজের
ভ্রূকুটী ভঙ্গিমা স্মরি,

ভাসাযেছ বক্ষঃস্থল
জননী গো আহা মরি।
ইংবাজেব অবতাব
রীপনেবে হেব হেব,
ভুলে যাও ক্ষণ তবে
ইংবাজেব অত্যাচাব।
ওই দেখ ভাগিবথী
মাখিযে ভানুব কর,
হাসি মুখে সোনামেখে
চলে যায থব থব,
সেজেছে প্রকৃতি সতি
নূতন ভূষণে যেন,
আজি যাহা দেখিলাম
দেখি নাই কভু হেন।
মুছ মা নযনজল
রীপনের কোলে কব,
আশীশ তাঁহাবে মাগো
স্নেহভবে দেহ বব।

৪

দেব অবতাব অমানুষ তুমি
বিধিদত্ত নিধি দুঃখি ভাবতেব,
এসহে রীপন কবি আবাহন
অমূল্য বিভব তুমি আমাদেব।
সাধিযাছ যাহা ভাবতের তবে
অস্বপ্ন কল্পিত বলি সবে মানি,
কবিযাছ যাহা, কবে নাই কেহ
কবিবে না আব বলি তাহা জানি।

বিংশতি কোটী ভারতবাসীর
তুমিহে জীবন প্রধান সহায়,
তুমি তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বল
তুমিই তাদের সুখের উপায়,
অসীম অপার তব গুণচয়
নির্জীব ভাষায় না হয় বর্ণন,
জাগিতেছে তাহা ভারতবাসীর
হৃদয় মাঝারে হায় অনুক্ষণ।
তব প্রিয় নাম চিরদিন তরে
ভারত বাসীর কোমল অন্তরে
রহিবে অঙ্কিত, গাহিবে সতত
তব গুণগান পুলক ভরে।
সুদিন ভারত তব মুখ চেয়ে
আছে নিরন্তর বড়ই আশায়,
নয়নের জল মুছাইও তার
তোমা ভিন্ন আর নাহিক উপায়,
কি দিবে অনাথ এ ভারতবাসী
নাহি কিছু তার দিতে প্রতিদান,
লহ হৃদয়ের প্রীতি উপহার
সঁপিয়াছে তোমা সবে মন প্রাণ।

বিরজা।

—০*০—

(উপন্যাস।)

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেম সম্ভাষণ।

শতাব্দি বিগত হইয়াছে,—যখন বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রত্নময় সিংহাসনে বাদসাহ সিরাজ উদ্দৌলা আধিপত্য করিতেন, যখন সেই ঘোর নির্দ্দয় পাষণ্ডের অত্যাচারে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটী ঘটনা বিবৃত করিতে অগ্রসর।

গ্রীষ্মকাল, তপন দেব মনের সাধে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমাকাশে আপন বক্তিম লোচন বিস্তার করিতেছেন, যেন আশা মিটে নাই, আরও দগ্ধ করিতে ইচ্ছা আছে। বিহঙ্গমগণ যেন বিদায় পর মার্ত্তণ্ডদেবের হৃদয়গত ভয়াবহ ভাব অবগত হইয়াই কাকলিসহ সভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। ব্রততী মৃদু বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া সহকার তরুকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে, মনের আশা মিটাইয়া লইতেছে। তরুশিরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি যেন আপনাপন ক্ষণিক জীবনে পরিতৃপ্ত জানিয়া কাহারও বিষাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে হাসিতেছে, এমত সময়ে নন্দনপুরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তীরে ধীর পাদ বিক্ষেপে একটী যুবক উপস্থিত হইলেন, যুবকটীর বয়ঃক্রম অন্যুন বিংশতি বর্ষ, উন্নত নাসিকা, সুটানা ভ্রূযুগল, দীর্ঘ চক্ষু, গঠন লালিত্য ও অঙ্গাবয়বের পরিপাট্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ, কিন্তু কে জানে, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যেও যেন কিসের অভাব ছিল, সে সুন্দর চক্ষু যুগলে যেন সে পূর্ণ জ্যোতিঃ নাই, যৌবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি নাই, বদন বিরস। গোণ্ডস্মিথ বলিয়াছেন যে "লোকের দরিদ্রতা তাহার মুখভাবে প্রকাশ পায়," আমরাও এ কথাটী স্বীকার করি, যুবকটীর মুখভাব পরীক্ষা করিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যুবকটীর নাম অম্বিকাচরণ, অম্বিকাচরণের ইহ সংসারে কেহই নাই, মাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় দুইবৎসরাতীত হইল মৃতা হইয়াছেন, অম্বিকার অবস্থা অতি মন্দ, গোপালচন্দ্র গ্রামস্থ জমিদারের নায়েব, অম্বিকা তাঁহারই অধিনে চাকুরি করিতেন, যাহা কিছু পাইতেন তদ্বারা কায ক্লেশে দিনাতিপাত হইত। অম্বিকাচরণের বাল্যাবধি লেখাপড়ায় বড় মনোযোগ, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সফলতাও হইয়াছিল। অম্বিকা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু সহায় নাই, সুতরাং লেখাপড়া শিখিয়াও তাহার কোন ফল দর্শেনাই, অম্বিকা মূর্খ নায়েবের অধিনে চাকুরি করিয়া দিনাতিপাত করেন।

অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ সেই অস্তগামী সূর্য্যকর-দীপ্ত ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর বিমল বক্ষপ্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিস্তব্ধভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় একটী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল, রমণীর বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর—দেখিতে পরম রমণীয়, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, মুখের ভাব অতি সুন্দর মনোহর নাসিকা, দিব্য চক্ষু, তাহাতে মধুর যৌবনের সুখময়ী লালিত্য—সুন্দরী গ্রামস্থ জমীদারের নায়েব গোপালচন্দ্রের দুহিতা, নাম—“বিরজা”

বিরজা অম্বিকাচরণকে গ্রামসম্পর্কে দাদা সম্বোধন করিত, সুতরাং বলিল “দাদা তুমি এখানে ?”

অম্বিকাচরণ যেন সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, বলিলেন “বিরজা তুমি এখানে।”

বিরজা। আমি ত প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এখানে গা ধুতে আসি।

অম্বিকা। আমিও ত রোজ এখানে আসি।

বিরজা। কেন ?

অম্বিকা। তা জানিনা।

বিরজা। দাদা তুমি দিন দিন এমন মলিন ও কৃশ হচ্চ কেন ?

অম্বিকা। বিরজা! যে দুঃখী তাহার কি না সম্ভবে ? আমি যদি মলিন ও কৃশ না হইব তবে কে হইবে ?

বিরজা নিস্তব্ধ হইল, তাহার সেই সুন্দর চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিনির্গত হইল ।

অম্বিকা। বিরজা, তুমি কাঁদচ ?

বিরজা অধোবদন হইল, কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকা। কেন বিরজা, কেন তুমি কাঁদচ ?

বিরজা। তোমার অবস্থা দেখে।

অম্বিকা দরিদ্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে কি তোমার হৃদয় কাঁদে ?

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

"বিরজা কাঁদিতেছ" বলিয়া অম্বিকাচরণ বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন, অম্বিকার প্রাণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিল, বিরজা একবার অম্বিকার প্রতি চাহিল, তাহার নয়নযুগল হইতে আবার প্রবলবেগে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অম্বিকাচরণ সযত্নে বিরজার নয়ন বারি মুছাইয়া দিলেন, বিরজা ধীরে ধীরে আপন মস্তকটী অম্বিকাচরণের চিন্তোদ্বেলিত বক্ষে রক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অম্বিকাচরণের দারিদ্র্যনিপীড়িত বক্ষে যে কি অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, তখন তিনি জগৎ ভুলিলেন, দরিদ্রতা বিস্মৃত হইলেন, জগতের যাবতীয় ক্রূরতা বিস্মৃত হইলেন, হৃদয়াকাশে যে ঘোর ঘনঘটা এতকাল বিরাজ করিয়াছিল তাহা অপনীত হইল, সুখদ শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্ক যেন তাহার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, সে শোভার প্রভাবে দীন সম্রাজ্য পায়,—আজি দৈবানুগ্রহে দরিদ্র অম্বিকাচরণ সেই দেবতা বাঞ্ছিত সম্রাজ্যের অধিকারী। এখন এ কুটিল বিশ্ব সংসারে আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ? আমরা বলি অম্বিকাচরণ তুমি ধন্য, এখন তোমার দরিদ্রতা অনেকের স্পৃহনীয়, যাহার স্বপ্নের সফলতা হয় তাহার তুল্য সুখী এ সংসারে আর কে আছে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০—

মন্ত্রণা।

নন্দনপুরের জমীদার মহাশয়ের নাম উমাচরণ। উমাচরণের একমাত্র পুত্র। যৌবনকালে উমাচরণের চরিত্র ভাল না থাকায় তাঁহার পিতা তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব তদীয় পৌত্র বিজয় কৃষ্ণের নামে উইল করিয়া যান। উমাচরণ নামে ও কার্য্যে জমিদার বটেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণের। উমাচরণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন, তাঁহার প্রতাপে প্রজাবর্গ ব্যাকুল, কথায় বলে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়" বস্তুতঃ ইহার জমিদারিতে তাহাই হইত। যদিও উমাচরণ রাজ সরকার হইতে রাজ সম্মান সূচক কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাহাকে লোকে "রাজা বাহাদুর" বলিত। তিনিও মনে মনে আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেন।

জমীদার বা রাজা বাহাদুরের বাটী নন্দনপুরের এক প্রান্তভাগে, বাটিটী সেকেলে ধরণের, কিন্তু বৃহৎ—সদর অন্দর প্রায় একত্রেই—চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চক। বাটীর মধ্যে উমাচরণ বাবুর স্ত্রী তাঁহার ভগ্নী তিনি ও পুত্র বিজয় কৃষ্ণ এতদ্ব্যতীত আত্ম সম্পর্কীয় আর কেহ ছিলেন না।

বেলা প্রায় তিনটা, উমাচরণ বাটীর মধ্যে তাকিয়া হেলান দিয়া তামাকু খাইতেছেন, ভগ্নী তারাসুন্দরী ও স্ত্রী ভবসুন্দরী পার্শ্বে উপবিষ্ট, এক জনে গায়ের ঘামাছি মারিতেছেন ও অপরে বাতাস করিতেছেন, এমত সময়ে গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে কে ডাকিল "বাবা—বাবা!"

উমাচরণ বলিলেন "কেন বিজয?"

বিজয় কৃষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার বদনমণ্ডল গম্ভীর, বলিলেন "এরূপ করিলে জমিদারী রক্ষা হইবে না।"

উমা। কি হইয়াছে?

বিজয়। পাপিষ্ঠ অম্বিকা আমার অপমান করিয়াছে।

উমা। তোমার অপমান করিয়াছে?

বিজয়। হাঁ।

উমা। তার এত বড় স্পর্দ্ধা, সে জানে না যে তুমি কে?

বিজয়। আমি ত আর একবার আপনাকে বলিয়াছিলাম যে তার সঙ্গে দেখা হলে সে যেন অনিচ্ছাক্রমে আমাকে নমস্কার করে।

তারাসুন্দরী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, বলিলেন "আজ কি হয়েছে।"

বিজয়। আমার জুতায় কাদা লেগে ছিল, আমি তাকে পুঁছিয়া দিতে বল্লাম, সে বল্লে আমি ভদ্র সন্তান আমার ও কাজ নয়,—তার এত তেজ? আমার জুতা স্পর্শ করা তার ভাগ্যের কথা মনে কর্‌লে না। আর সে অনেক লোকের সাক্ষাতে আমাকে অপমান করেছে, এতে প্রজারা কত প্রশ্রয় পাচ্চে মনে কর দেখি।

উমা। তাই ত বটে, এর একটা বিশেষ প্রতিকার কর্‌তে হবে, "রাজা বা ঈশ্বরোবা" আঁা এতে তার লজ্জা, স্পর্দ্ধা। এখনি স্পর্দ্ধা বার কর্‌ছি,—গোপালকে ডাক্‌তে পাঠাও।

তারাসুন্দরী আবার বলিলেন "আচ্ছা বিজয়। অম্বিকাকে জুতা পরিস্কার করিতে বলা কি ভাল কাজ হয়েছিল? তোমার চাকরের কি অপ্রতুল ছিল?"

উমা। উত্তম কাজ হয়েছিল। প্রজা আর চাকরে ভিন্ন কি?

তারা। এ যে অত্যাচার।

উমা। শাসন ব্যতিরেকে কি রাজ্য রক্ষা হয়।

তারা। তবে এক সিরাজ নয়, অনেক আছে।

উমা। সিরাজে কি মন্দ লোক, প্রাতঃ স্মরণীয় লোক, ঈশ্বর যাদের ক্ষমতা দিয়াছেন, তারা যদি ক্ষমতা প্রকাশ না কর্‌বে তবে কে কর্‌বে?

তারাসুন্দরী আর কোন কথা কহিলেন না, এমত সময়ে তথায় গোপাল চন্দ্র নায়েব মহাশয় উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! গোপাল চন্দ্রকে বাটীর মধ্যে আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, পল্লী গ্রামে এরূপ প্রায় সচরাচরই হইয়া থাকে। বিশ্বাসী চাকরেরা প্রায়ই অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায়।

উমাচরণ গোপালকে দেখিয়া চক্ষু আরক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "অম্বিকা কেমন লোক?"

গোপাল পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জানেন সুতরাং বলিলেন "অতি মন্দ।"

উমা। আজ কি করেছে জান?

গোপাল সমস্তই জানিতেন তথাপি বলিলেন "আজ্ঞে না।"

উমাচরণ ঘটনাটীকে বিশেষ অলঙ্কার দিয়া বলিলেন। গোপাল তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বলেন কি, তার এত বড় স্পর্দ্ধা।"

উমা। আমার যদি গুলি দিবার ক্ষমতা থাকৃত, তা হলে আমি আজই তাকে গুলি দিতাম।

গোপাল। তা হলে উচিত কার্য্য হত।

উমা। ও তোমার সেরেস্তায় কাজ্ করে না?

গোপাল। আজ্ঞা হাঁ।

উমা। আজই দূর করে দাও, আর বলে দাও যেন সে আর এ দেশে না থাকে, যদি থাকে তা হলে যা করবার তা কর্‌বো।

গোপাল "যে আজ্ঞে" এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। উমাচরণ রাগভরে বসিয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০—

প্রিয় সম্মিলন।

আবার সন্ধ্যা কাল,—যে সময়ে প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেমের প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক জাগরিত হয়, যে সময়ে প্রেমের বিলাসক্ষেত্রে নবমল্লিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেই সুখদ সময়ে, সেই পূর্ব্বস্থানে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রণয়ীদ্বয় সম্মিলিত। কিন্তু পাঠক! মনে করিবেন না যে উভয়ে প্রেমের লহরী লীলায় লীন। হায় দরিদ্রতা, তোমার নিকট কি প্রণয়ীরও অব্যাহতি নাই?—প্রণয়ের অনন্তসুখ ইহাও কি তোমার অভাবে অলিক স্বপ্ন?

প্রণয়ীদ্বয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, পরে অম্বিকা বলিলেন, "বিরজা! তুমি আমায় ভাল বাসিয়া আপন সুখ নষ্ট করিলে?"

বিরজা সোৎসুকভাবে কহিল, "কেন অম্বিকা?"

অম্বিকা। দেখ বিরজা, আমি এমন অমূল্য নিধি, স্বপ্নের সুখৈশ্বর্য্য হাতে পাইয়াও সুখানুভবে অসমর্থ, একে দরিদ্রতা—মর্ম্মভেদী দরিদ্রতা, তদুপরে নৃশংস অপমানের ভয়ঙ্কর বিষে জর্জ্জরিত। বিরজা এ দরিদ্রের ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে কি প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুটিত হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত হইতে পারে?

অম্বিকার চক্ষে জল আসিল। বিরজা অম্বিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অম্বিক! কাঁদিও না, তোমার এক বিন্দু অশ্রুজল আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত তরল লৌহ ঢালিয়া দেয়, আমি সকল সহ্য করিতে পারি কিন্তু তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।"

অম্বিকা। বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা! আমি বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি কি মনে কর যে তুমি আমার হইবে, ইহা কি সম্ভব? তোমার পিতা কি আমার হস্তে তোমার ন্যায় অমূল্য কহিনুর সমর্পণ করিবেন?

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "প্রাণাধিক! কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা, আমি এ জীবনে আর কাহারও হইব না, ইহাতে আমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়।"

অম্বিকার চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইল, বলিলেন "বিরজা! তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, প্রণয়ের মূর্ত্তিমতী দেবী— বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা— বিবাহের কথা দূরে থাকুক, তোমার পিতা হয় ত আমাকে নিরপরাধে আমার কার্য্য হইতে অবসৃত করিবেন। প্রাণাধিকে, তাহা হইলে আমার দশায় কি হইবে ভাব দেখি? আমি হয়ত উদরপূর্ণ অন্নের জন্য লালায়িত হইব, হয় ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইব।"

বিরজা। কেন?

অম্বিকা। সে অনেক কথা।

অম্বিকাচরণের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, প্রেমময়ী বিরজা স্বীয়

বসনাঞ্চল দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল "প্রাণাধিক, তবে কি আমি পিতাকে তোমার নিমিত্ত বলিব ?"

অম্বিকা। না বিরজা! একথা তুমি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিও না। ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে, এই হইবে যে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যে সুখানুভব করিতাম, যে অনন্ত আশ্বাসে হৃদয়কে বদ্ধ করিতাম, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কাহার মুখে কথা নাই, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছিল। এমত সময়ে তথায় সহসা গোপাল চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। গোপাল চন্দ্রকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-ছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। উভয়ের তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, পাদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া কহিলেন, "বিরজা এ কি।"

বিরজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

গোপাল। কোথায় তোমায় রাজরাণী করিতে কৃতসংকল্প, না তুমি একটা কাঙ্গালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছ, তোমায়ও ধিক্, আর আমার জীবনেও ধিক্, আমার কন্যার যে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই। উভয়ের চক্ষুই মৃত্তিকা সংলগ্ন।

গোপাল। অম্বিকে, তোর কি সাহস যে তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিস্—তোর আবার বিবাহে সাধ, আপনি খেতে পাস্‌নে স্ত্রীকে খাওয়াবি কি ?

অম্বিকা বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি অন্যায়——"

গোপাল। রেখে দে তোর অন্যায়, তোর কথা শুন্‌লে আমার হাড় জ্বলে যায়, ফের যদি কথা কবি, তা হলে জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব, পাজি—ছুঁচো।

অম্বিকা কাঁদিতে লাগিলেন।

গোপাল। এই নে তোর মাইনে, আজ থেকে চাকবি গেল, কিন্তু তুই একেবারে এ দেশ ছাড়ে যাবি, যদি না যাস্, তা হ'লে দেখ্‌বি তোর কি হয়। তোব দুঃখে শেয়াল কুকুব কাঁদবে।

এই বলিয়া টাকা তিনটী ছুড়িয়া অম্বিকাব নিকট ফেলিয়া দিলেন।

অম্বিকা নিস্তব্ধভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডাযমান রহিলেন, তথন গোপাল বিরজাব হস্তধারণ করিয়া সজোবে টানিয়া বলিলেন; "ফের যদি কথন এমন দেখি, তা হ'লে মেরে ফেল্‌ব। চল, তোমার বেরুনো বার কর্‌বো, এই বুঝি তোমাব নদীতে গা ধুতে আসা?"

গোপাল বিরজাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বিকা যতক্ষণ বিরজাকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ অনিমেষলোচনে তাহাব প্রতি চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ বিরজা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মসি ঢালিয়া দিল। তিনি আকুলনয়নে একাকী নির্জ্জনে কাঁদিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার হৃদয় হইতে দারিদ্রের তামসীমুর্ত্তি অপসৃত হইল, বিরজা যে আর তাঁহাব হইবে না তথন ইহাই তাঁহাব দুঃখ, এ দুঃখের নিকট সকল দুঃথ পরাস্ত হইল।

অম্বিকাচরণ অনেকক্ষণ জড়বস্তুভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,আপন ললাটকে শত ধিক্কাব দিলেন, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বিরস হৃদয়ে তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। যেন কত দুর্ব্বল, যেন কত কাল দুর্দ্দম পীড়াব অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াছেন,---গোপাল চন্দ্র প্রদত্ত টাকা তিনটী সেই থানেই পড়িয়া রহিল, লইতে মনে হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

বিরজা ও বিজলী।

নন্দনপুরের এক পার্শ্বে জমিদারের বাটী এবং তাহার অপর পার্শ্বে গোপালচন্দ্রের বাটী। গোপালের বাটিটী মন্দ নয়—দ্বিতল, উপরে নীচে গুটি নয় ঘর, গৃহটীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচিরে বেষ্টিত। গোপালের ইহসংসারে একমাত্র কন্যা বিরজা ব্যতীত অপর কেহ নাই—ভয়ানক মহামারির সময় স্ত্রী গত হইয়াছেন। গোপালের গৃহে বিরজা ব্যতীত একটী দাসী ও একটী পাচিকা ব্রাহ্মণী ছিল, পল্লিগ্রামে এরূপ সামান্য সংসার লইয়া পাচিকা রাখায় গোপালের সংসার যে সচ্ছল ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা পাঠককে আর একটীমাত্র কথার উল্লেখ করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিব; এ সময়ে তাঁহাকে বাজে কথায় বিব্রত করায় হয়ত তিনি বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কথাটীর উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

পাঠক! দাসী বলায় মনে করিবেন না যে সচরাচর যেরূপ দাসী হইয়া থাকে এটীও সেইরূপ, কলিকাতায় যে রূপ সচরাচর বিগত যৌবনা, বিলাস-ভোগ-চরমাবস্থা প্রাপ্তা অনন্ত হাতে রসিকা দাসী দৃষ্ট হয়, এটী তদ্রূপ নহে, এ দাসীর চাকর মহলে রসিকতা করা নাই, লুকাইয়া ধুম পান করাও নাই।

দাসীর নাম বিজলী—বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসরের মধ্যে—বিবাহিতা, কিন্তু ভাগ্যদোষে স্বামীর উদ্দেশ নাই—দেহ খর্ব্বাকৃতি—নাসা চক্ষু প্রভৃতি মন্দ নয়—বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। বিজলী ভদ্রবংশজাত, তবে সহায়হীনা ও মন্দ-ভাগিনী হওয়ায়, আর বিরজা তাহাকে বড় ভালবাসে বলিয়া, তাহার নিকট দাসী ও সখী ভাবে আছে। বিরজা তাহাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিত, বিজলীও বিরজাকে মনে মনে বড়ই ভালবাসিত।

পাঠক! আপনাকে যন্ত্রণা দেওয়া আমার শেষ হইয়াছে, এখন আসুন অন্য কথা বলি। গোপালচন্দ্র বিরজাকে সেই নদীসৈকত হইতে বাটী আনিয়া পর্য্যন্ত আর একদণ্ড তাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করেন না, সততই চখে চখে রাখেন, পাছে বিরজা আবার সেই হতভাগাটার নিকট যায় ইহাই তাঁহার ভয়। বিরজার আর আহার নিদ্রা নাই—সদাই বিষণ্ণ—প্রাণাধিক অম্বিকাচরণকে দেখিতে পাইতেছে না, সে জন্য নহে, তাহার ভয়—গোপালচন্দ্র অম্বিকাকে এদেশ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র জীবিকা—তাহা হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে, এখন অম্বিকা কি করিবে, কি করিয়া দেশে থাকিবে। দেশে থাকাও সহজ নহে, জমীদার এবং তাহার আম্‌লাবর্গের অসাধ্য কার্য্য নাই—তাহাদের নিকট লজ্জা লজ্জা পায়, দয়া মায়া ইত্যাদি দূরদেশে পলায়ন করে। স্বার্থসিদ্ধিতে তাহাদের তুল্য পটুজীব আর এ জগতে নাই।

বিরজা দ্বিতলের একটী গৃহে, বিমর্ষভাবে বসিয়া নানা চিন্তা করিতেছে, দাসী বিজলী পার্শ্বে উপবিষ্টা, ক্ষণেক এইরূপ নিস্তব্ধতার পর বিরজা বলিলেন "বিজল, তিনি তোমায় কোন কথা বলিলেন না?"

বিজলী। সেখানে আরও অনেক লোক ছিল, সেই জন্য তিনি কথা কহিতে পারেন নি, আমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য একটী গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম, কিন্তু তিনি আমায় দেখিতে পেলেন্ না।

বিরজা। তাকে কিরূপ দেখ্‌লে?

বিজলী। মলিন, বিষণ্ণ।

বিরজা। বিজল! তুমি আমার প্রাণের ভগ্নী—তোমার কাছে আমার কি গোপন আছে ভাই,—আমি যে আর প্রাণ ধর্‌তে পারি না, যাকে কত কৌশলে—কত ছলে—নিত্য দেখে আশা মিটিত না, আজ যে আমি তাঁকে তিন দিন দেখি নাই,—ভাই আমি কি করে এখনও জীবিত আছি, আমার কি কঠিন প্রাণ!

বিরজা কাঁদিতে লাগিল, বিজলী স্বীয় অঞ্চল দ্বারা তাহার নয়নাসার বিমোচিত করিয়া কহিল "ছি কেঁদ না।"

বিরজা। সই, আমি ত বলি যে কাঁদ্‌ব না কিন্তু চোখ্ যে মানে না।

বিজলী। কাঁদ্‌লে ত উপায় হবে না, কেবল মনকে আরও খারাপ করা।

বিরজা। তিনি যদি দেশত্যাগ করেন তা হলে আমার দশা কি হবে সই, আমি কি শেষ আত্মঘাতিনী হব, আমার কপালে কি এই ছিল?

বিরজা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

বিজলী। বালাই—তা কেন হবে, তিনি কি তোমায় ফেলে যেতে পারেন।

বিরজা। অত্যাচারের অসাধ্য কাজ কি আছে?

বিজলী নিস্তব্ধ হইল, বিরজা আবার কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়গত অসহ্য যাতনার উপশম করিতে যেন সেই সুন্দর চক্ষু দিয়া অশ্রুবারি স্খলিত হইতে লাগিল—তাহাতে চক্ষু ভাসিল, কিন্তু হৃদয়ের শোকরাশি ভাসিল না; তাহা বড়ই বদ্ধমূল, তাহা অনন্ত, অপরিমেয়,—হয় ত হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে তাহা ইহজীবনে আর ফুরাইবে না, তাহার অবশেষ হইবে না।

শেষের সে দিন।

"Day presses on the heels of day,
And moons increase to their decay,
But you, with thoughtless pride elate,
Unconscious of impending fate,
Command the pillar'd doom to rise,
When lo! thy tomb forgotten lies."—

Francis

তুমি আমি, ধনী নির্ধন, অন্ধ খঞ্জ, সকলেই এই কর্ম্মভূমি-ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তবে পৃথক্ এই, কাহার দিন সুখে যাইতেছে, কাহার বা দুঃখে অতিবাহিত হইতেছে। সুরস ফলমূলাদি ভোজনে, সুমিষ্ট পেয়দ্রব্য পানে, দাসদাসীর সেবায় ধনীর দিন সুখে কাটিয়া যাইতেছে, আর সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমে, কদন্ন ভোজনে, কেবলমাত্র অযত্নলব্ধ স্রোতস্বতী বা কূপ তড়াগাদির

জলপানে দীনের দিন কষ্টে কাটিয়া যাইতেছে। সুখে হউক, দুঃখে হউক সকলেরই দিন এক বা অন্য রকমে কাটিয়া যায় কাহারও দিন থাকে না। এই সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানান্ধকারিণী-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই সংসার-সুখের অনুসন্ধানে সদাই বিব্রত। ধনীর ধনপিপাসার শান্তি হয় না, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের ত কথাই নাই। সকলেই আপন অবস্থার উন্নতি করিতে, পরিবার, আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নীদিগের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য মরীচিকামুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় সাগ্রহমনে সংসার মরুতে ছুটাছুটী করিতেছে। এই সংসারে যাহাকে দেখি, যে দিকে যাই, সংসার বাগুরা-বিজড়ীত লোক ভিন্ন অন্যকে দেখিতে পাই না। রাজপ্রাসাদে, ধনীর অট্টালিকায়, মধ্যবিত্তের ঘরে, নির্ধনের কুটিরে, যেখানে যাই, বিষয়কার্য্যের কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনিতে পাই না, বিষয় বুদ্ধির চেষ্টা ভিন্ন অন্য চেষ্টায় কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না। রাজা আপন প্রাসাদশিখরে রত্নাসনে বসিয়া অনুচরবর্গের সেবাতেও আপন সংসার-চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না; ধনী সংসারিক সকল অভাব পরিশূন্য হইয়াও ধনচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায় মন দেন না, মধ্যবিধ ব্যক্তিও পরিমিত ধনার্জ্জনে অকষ্টে পরিবার প্রতিপালনক্ষম হইলেও অধিকতর অর্থাগমের উপায় পরিচিন্তনে বিব্রত, এবং দরিদ্র ত সাংসারিক সকল অভাব স্কন্ধে করিয়া অর্থের জন্য পথে পথে ভ্রমণ করিতে ক্ষান্ত নহে। যাহার তিন কাল গিয়া এক কাল অবশিষ্ট আছে, শরীর নিস্তেজ, মাংস ললিত, শ্রবণ বধির, দৃষ্টি অন্ধ প্রায়, এরূপ স্থবিরও আপন পুত্র পৌত্রাদি কি উপায়ে সুখে সংসারক্ষেত্রে কালাতিপাত করিবে, ইহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত, তথনও বিষয়বাসনা পরিশূন্য হইতে পারে না, যুবা অভিনব যৌবন-বলে বলবান্ উদ্ধত স্বভাব, তাহার যৌবন-শোণিত এখনও শীতল হয় নাই, মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের উগ্রতা এখনও হ্রস্বীকৃত হইয়া আইসে নাই, সংসারসুখ তাহার একমাত্র লক্ষ্য, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত নাই, তল্লাভার্থে প্রবল পণ করিতেছে; সে এখন প্রমত্ত দুর্ব্বার যুথপতির পদ্মবনানুসন্ধানে গমনের ন্যায় সোৎসুক মনে সগর্ব্বে সংসারপথে ধাবিত হইতেছে। বালকও সংসারের অদৃষ্ট, কেবলমাত্র

কল্পিত, সুতরাং অতুল এবং অপরিমিত সুখ অনুমানে তল্লাভের আশায় তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অন্তঃপুর বিহারিণী অবগুণ্ঠনবতী অঙ্গনাও স্বামী, পুত্রের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল জানিয়া অনন্য চিন্তা হইয়া তাহারই অনুধ্যান করিতেছে। এই ঘোর সংসারমায়া সমাচ্ছন্ন জগতে আমি কাহাকেও বিষয় বাসনা বিরত দেখিতেছি না, এই ঐন্দ্রজালিক সংসারে সকলেই বিষয় বিমুগ্ধ। এই সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আসিয়া সকলেই অভিনেতবা নাটকের প্রত্যেক অংশ অভিনয় কালে সকলই প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত বিবেচনায় আমি রাজা, আমার রাজ্য, আমার মহিষী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, এই মোহে ভুলিয়া আভিনয়িক সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করিয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, কখন কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু যখন তাহাদিগের জীবনাঙ্কের অভিনয় পরিসমাপ্ত হইবে, যখন যবনিকার পতন হইবে, তখন কে কোথায় থাকিবে? তখন কি আর আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ থাকিবে?

সকলেইত এক সংসারমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই ইষ্ট মন্ত্র যপ করিয়া সিদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছ, কিন্তু মনে কর দেখি, তোমার একদিন আছে, যে দিন তোমাকে মহানিদ্রায় মগ্ন হইবার জন্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। সে দিন তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবে ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া পড়িবে, যে দেহের স্বাস্থ্যের জন্য সকাল সকাল আহার করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগে শান্তি লাভের চেষ্টা কর—সুনিদ্রায় রজনী যাপন জন্য সকাল সকাল শয্যায় গমন কর, যাহার সৌষ্ঠব সাধন জন্য সুগন্ধি সেবন কর, শুভ্রবস্ত্র পরিধান কর, তোমার সেই দেহ জীর্ণ, শীর্ণ বিবর্ণ হইবে। তোমার সেই রুগ্ন দেহ মল মূত্র নিষ্ঠীবনাদিতে সাধারণের, এমন কি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র কন্যাদিগেরও ঘৃণা হইবে, এবং তোমার প্রাণপক্ষী এই পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিবে, ধূলি কর্দ্দমময় ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইবে, যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যাতনায় অস্থির হও, তোমার সেই দেহ, সেই অতি সাধের, অতি যত্নের দেহ প্রজ্জ্বলিত চিতায় অর্পণ করিতে তোমার আত্মীয়, স্বজন, পুত্র, কন্যা কেহই ক্ষান্ত হইবে না।

ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সুখের জন্য তুমি এই সংসারক্ষেত্রে অম্লানবদনে, অকুণ্ঠিতভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ গর্হিত কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না—অপরের মর্ম্মবেদনার ভয় কর না—বিপন্নের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, পথ পাইলে তাহাকে পীড়ন করিতে ছাড় না—প্রভুর বিশ্বস্ত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে দ্বিধাবোধ কর না—স্ত্রীলোক পাইয়া অবিবার সর্ব্বস্ব হরণে ধর্ম্মভয়কে মন হইতে দূরীকৃত কর, লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দাও; কেবল মাত্র সংসার-সুখ সাধনীয় অর্থের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ আছ। তোমার এত সাধের, এত ভালবাসার সংসার কোথায় থাকিবে? তুমি যত বড় ধনী হও, যত সহস্র, যত লক্ষ, যত কোটী মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কুবের আখ্যা লাভ কর না, তোমার বহুল অর্থ রাশির এক কপর্দ্দকও তোমার সঙ্গে যাইবে না। মনে করিতেছ তোমায় পুত্র কন্যা পরিবারবর্গ সেই অর্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবে। সে আশা কখনও করিও না, তোমার বুঝিবার ভ্রম! তুমি নিতান্ত অবিবেচক, দেখ ইহ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। রাজার রাজ্য, মানীর মান, ধনীর ধন অতি সাধের, অতি যত্নের বস্তু কিছুই থাকে না। কালচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে, সেই সঙ্গে তুমি আমি, ধনী নিধন, পশু পক্ষী, এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড সকলেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সংসারের মধ্যে অতি আপনার বলিতে স্ত্রী পুত্র কন্যা অপেক্ষা বোধ হয় আর কেহ তোমার আত্মীয় নাই। সেই শেষের দিনে, সেই মহাদিনে তোমার সেই অতি প্রিয়, অতি সাধের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি কেহই তোমার সঙ্গের সাথী হইবে না। ভূলোক দুর্লভ অতি বিশাল রমণীয় অট্টালিকা, বহু মূল্য পরিচ্ছদ, মণি মুক্তা জড়িত ভূষণ হইতে একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে যাইবে না। এমন কি, যে দেহের কষ্টে তোমার কষ্ট, এতদূর সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই, সে দেহও তোমার সহগামী হইবে না। সেই দিন সেই ঘোর ভয়ঙ্কর বড় বিষাদের দিন মনে কর দেখি! ঘোরা তমস্বিনী যামিনীতে একাকী কোন দুর্গমপথে গমন করিতে হইলে জীবনের কত ভয় কর। সেই দিনে তোমার দর্শনশক্তি একবারে নষ্ট হইবে। নিবীড় অন্ধকার

দেখিয়া অন্তরাত্মা কাঁদিতে থাকিবে, নিকটে বৃদ্ধ জনক তোমার অন্তিম-কাল উপস্থিত দেখিয়া তোমার মৃত্যু দর্শন অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর ভাবিয়া ভগ্ন হৃদয়ে তাঁহার চেষ্টা করিবেন। আহা আজন্ম প্রতিপালিকা স্নেহময়ী জননী বক্ষে করাঘাত, ও মস্তকের কেশরাশি ছিন্ন করিতে করিতে উচ্চ আর্ত্ত স্বরে, সংসার জ্বালায় যদি কখন কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক সে সকল বিস্মৃত হইবেন, তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া রোদন করিতে থাকিবেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তোমার সুকুমার শিশু সন্তান গুলি তোমার মৃত্যুকালীন দারুণ যন্ত্রণা জনিত মুখ বিকৃতি দেখিয়া তোমার পার্শ্বে বসিয়া সজল নয়নে ক্রন্দন করিয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইবে, প্রাণ সম প্রেয়সী বিবাহকাল হইতে প্রত্যেক দিবসের কথা স্মরণ করিয়া অধো-বদনে বসিয়া অশ্রুজলে ধরাতল প্লাবিত করিবে, তখন তোমার বাক্‌শক্তি থাকিবে না, তাহাদিগের কাতরতা দেখিয়া শান্তনা করিতে না পারিয়া মর্ম্মভেদী যাতনা ভোগ করিবে, জগৎ শূন্য দেখিবে, সংসারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কত কষ্ট হইবে! উঃ!! কি ভয়ঙ্কর দিন!!! শেষের সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে কর দেখি। তুমি কি অপরিণামদর্শী! সংসার মদে মত্ত হইয়া ভ্রমেও তাহার বিষয় চিন্তা কর না। আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, তোমার সে দিন আসিবেই আসিবে। এক দিন না এক দিন তোমাকে যাতনা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোন দিন কোন ব্যক্তিকে এইরূপে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে বা কাহার মৃত দেহ দর্শন করিলে ক্ষণেকের জন্য তোমার মন হইতে বিষয় বাসনা, তোমার অভ্যস্ত দুষ্প্রবৃত্তি গুলি ক্ষণকালের জন্য তোমার মন হইতে অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্ম পথ অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? সেস্থান হইতে পাদৈক ভূমি অন্তর হইতে না হইতেই সকল ভুলিয়া যাও—কিছুই মনে থাকেনা—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং" আবার সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া আপনার দৈনিক কার্য্যের একজন প্রধান কার্য্যকারক হইয়া দাঁড়াও। যেন কিছু জানিয়াও জান না—বুঝিয়াও বুঝ না!

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

রচনা-বোধিনী শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সাহিত্য যন্ত্র, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনের এক স্থানে লিখিয়াছেন "এতদ্দ্বারা যে ভাষা শিক্ষার অভাব সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প ইহা বলা বাহুল্য" এ কথা আমরা স্বীকার করি কিন্তু ইহা পাঠে বালকগণের যে রচনা-সম্বন্ধে কতকটা উপকার দর্শিবে তাহা নিশ্চয়। গ্রন্থকার এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "বহুযত্ন ও আয়াস সহকারে 'রচনা বোধিনী' নামক এই সংক্ষিপ্ত পুস্তক খানি প্রচারিত হইল," কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত—শশিভূষণ বাবু আর একটু চেষ্টা করিলে এ গ্রন্থ খানির আরও উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই,—আমরা নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিলাম ঃ—

ব্যাকরণ দুষ্টতা—যেখানে ব্যাকরণ দুষ্টপদ প্রযুক্ত হয়, তথায় ব্যাকরণ দুষ্টতা দোষ হইয়া থাকে। যথা—

"হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরবনে।"—মেঃ ধ।

শ্রুতিকটুতা—যে স্থানে বাক্যান্তর্গত পদ সমূহ শ্রুতি মধুর না হইয়া কর্কশ বোধ হয়, তথায় শ্রুতি কটুতা দোষ হইয়া থাকে। যথা—

"দেখিলা রাক্ষস বল বাহিরিছে দলে
অলঙ্ঘ্য প্রতিঘ-অন্ধ চতুঃস্কন্ধরূপী।"—মেঃ ধ।

কিন্তু আমরা গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহাতে ছাত্রগণ কি বুঝিবে? গ্রন্থকার দোষগুলি দেখাইয়া দিলে তাহাদের বেশ উপকার দর্শিত। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে পুস্তকখানি বেশ সরল এবং বালকেরা যাহাতে আপনা আপনি বুঝিতে পারে, এমন করিবেন।

ধ্রুবোপাখ্যান।

উন্নতি বাসনা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম, ইহা বিরহিত লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, যে যেরূপ অবস্থায় স্থাপিত হউক না, সে সেই অবস্থা হইতেই আপনার মঙ্গল ও উন্নতি সংসাধনার্থে প্রধাবিত, কাহারও উন্নতি কল্পে ভয়ানক বিঘ্ন বিপত্তি থাকিলেও তিনি তাহার জন্য বদ্ধ পরিকর। ইহা শূন্য প্রাণী নাই—এই মর জগতে আকাঙ্ক্ষা শূন্য জীব কেহ কখন দেখে নাই। তবে এই উন্নতি কামনার সহিত স্বীয় স্বার্থ প্রায় জড়িত থাকে, যিনিই উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রায়শই তিনি এই স্বার্থপরতার দাস। যেন স্বার্থপরতার সহিত ইহার এমন কোন সম্বন্ধ আছে যে তাহা কেহ ছেদন করিতে পারে না;—যেন ইহার এমন কোন আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাহা মনুষ্যকে স্বার্থপরতার এই নীচাশয়তা উপলব্ধি করিতে দেয় না, সুতরাং মানব স্বীয় উন্নতি কামনার সহিত এই দুশ্ছেদ্য স্বার্থপরতা রক্ষা করিয়া থাকে। আবার উন্নতি কামনা আছে বলিয়াই মনুষ্য কখন এক ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না—প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন; এই জন্যই মনুষ্যের প্রায় যাবতীয় কার্য্যই স্বার্থ-পরতার এই আকর্ষণী শক্তির নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এই একই নিয়ম, এই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, প্রায় পরিবর্ত্তন নাই—পরিবর্ত্তনের চেষ্টা—আবার চেষ্টা থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য নাই, সুতরাং মানব কুল প্রায়ই স্বার্থ-পরতার দাস।

মানব এই পিশাচীর দাস বলিয়াই যাহারা পরস্বার্থে নিজ স্বার্থ বলি প্রদান করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা ইহ জগতে দেব বলিয়া পুজিত। মনুষ্য স্বীয় স্বার্থ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না বটে কিন্তু তাহার নীচতা সময়ে সময়ে সকলেই অনুভব করিয়া থাকে—তাই স্বার্থ বলিদানের কথা শুনিলেই তাহার হৃদয়ের দ্বার আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া

যায—তাই প্রাণ ভাবিয়া সেই মহাপুরুষের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। মানব নিজে অক্ষম হইলেও অকৃতজ্ঞ নহেন,—তাই এরূপ মহাপ্রাণের গুণ সঙ্কীর্ত্তনে তিনি আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন, আবার কেহ কেহ সেই মহাপুরুষের অনুকরণে আপনাকেও উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; কেহ বা তাহার রম্য ফল লাভে কৃতার্থ হন—আর কেহ বা ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। যিনি পরস্বার্থে নিজ স্বার্থ বলি দিতে পারিয়াছেন তিনিই ধর্ম্ম—তাঁহার চরিত্র দেবতার চরিত্রকেও অধঃকৃত করে—তিনি নররূপী দেব, এই প্রকার দেবতারই পূজা প্রার্থনীয় পদার্থ। পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিরা ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মে ত্রিংশৎত্রিকোটী দেবতার আবাহন। অমানুষিক ক্ষমতা বিশিষ্ট মানবে দেবতার আরোপ স্বভাব সিদ্ধ; তাঁহার প্রতি লোকের আন্তরিক ভক্তি আপনা হইতেই সমুত্থিত হয়। যে বুদ্ধদেব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞানাস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—যিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই সমুদায় ভারতবাসীকে এক সূত্রে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যিনি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান আদরে—সমান যত্নে আপনার বিমলাঙ্কে তুলিয়া লইতে পারিয়াছিলেন—যাঁহার সুনীতিমার্গ অনুসরণ করিয়া আজি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক পরিচালিত হইতেছে,—তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি তিনি ইহ জগতে দেবতা বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তিনি যে কেবল তদীয় শিষ্যানুশিষ্যগণেরই উপাস্য তাহা নহে, যে ব্রাহ্মণ তাঁহার চির বিদ্বেষী যাঁহারা এক সময় তাঁহাকে জীবিত ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে আপনাদের দ্রশ অবতারের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়া লইয়াছেন। শুধু বুদ্ধদেব কেন—মহাদেব বল—রামচন্দ্র বল—শ্রীকৃষ্ণ বল—নানক বল—চৈতন্য বল—কুশা বল—মহম্মদ বল কেনা এইরূপে দেব বলিয়া পূজিত হইতেছেন। পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিই—এই উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত সময়েই মহাপ্রাণ গারিবল্‌ডীর কথা ভাবিয়া দেখুন, তিনি পরস্বার্থে নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই—ইটালী উদ্ধারে আপন প্রাণোৎসর্গ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া

ছিলেন বলিয়াই আজি তিনি সমগ্র ইটালীর পূজিত দেবতা ;—কেবল ইটালী কেন সমগ্র জগতের পূজার পাত্র—তাঁহার পবিত্র চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়। জর্জ ওয়াসিংটন সেদিন স্বদেশ উদ্ধার কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজি তাঁহার সুযশ বার্ত্তা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—মার্কিনবাসীগণ জাতীয় কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই তাঁহার তেজঃপুঞ্জ হস্ত-স্থিত নূতন সাম্রাজ্যের রাজধানী তাঁহারই পবিত্র নামানুসারে আখ্যাত করিলেন—যাঁহারা তাঁহার প্রবল পরাক্রমে বিধ্বস্ত—পরাজিত—লাঞ্ছিত—অপমানিত হইয়াছিলেন—তাঁহারাও আজি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ প্রাণোৎসর্গের জন্য সহাস্য বদনে গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন—তাঁহারাও তাঁহাকে যথা বিহিত পূজার্চ্চন করিতেছেন। আহো! এই সকল মহাপ্রাণ যদি দেবতা বলিয়া গণ্য না হন—তবে আর দেবতা কে জানি না। হিন্দুর অধিকাংশ দেব দেবী এইরূপে তাঁহার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন—হিন্দু তাহা বুঝে না ; তাঁহারা বুঝেন না যে, তাঁহারা ত্রিংশৎ ত্রিকোটী দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই—কার্য্যবশতঃ দেব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন,—তাঁহারাও তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করতঃ কার্য্য বলে দেবতাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তাঁহারাও তাঁহাদের সমান আসন লাভ করিতে পারেন। বাঙ্গালী ইহা বুঝে না বলিয়াই আজিও তাঁহারা অধঃপতিত—জানি না কতদিনে তাঁহারা প্রকৃত দেবত্বের কারণ বুঝিতে সক্ষম হইবেন, হইয়া আপনাদিগকেও দেবোপম করিতে চেষ্টা করিবেন। গারিবল্ডী সে দিন ইটালীক্ষেত্রে জন্মিয়াও দেবোচিত কার্য্যে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন—তাই খৃষ্টাণ দেশেও তাঁহার প্রতিমা অর্চ্চিত হইল। তিনি যাহা করিয়া দেবত্ব পাইয়াছেন, অন্যের পক্ষে কি সে পন্থা অনভিগম্য ? কখনই নহে—পথ দুরভিগম্য হইতে পারে কিন্তু অনভিগম্য কখনই নহে। তাহা সকলকার জন্যই সকল সময়ে উদ্ঘাটিত আছে—পথ কণ্টকময় নহে—সুপরিষ্কৃত। কিন্তু তাহাতে যাইবার ইচ্ছা কই—প্রবৃত্তি কই ? সুতরাং তাহা রাজবর্ত্মের ন্যায় সুপ্রশস্ত হইলেও লোকের নিকট কণ্টকাকীর্ণ, যিনি এই পথের পথিক তিনিই ধন্য—তিনিই মনুষ্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেও দেবতা। কিন্তু মানবকুল

স্বার্থ মণ্ডিত,—সুতরাং এই বিস্তৃত পথ তাঁহারা স্বার্থের চক্রে পড়িয়া দেখিতে পান না,—তাই অপ্রশস্ত বর্ত্ম দিয়া প্রায়শঃই মানবের গতি। যে পথ স্বার্থান্ধ মনুষ্যের রুচির উপযোগী হইল—সেই পথেই তাঁহার গতিবিধি; সুতরাং রুচির বশীভূত হইয়া—আবার আপনার রুচিকে, সুরুচি বিবেচনা করিয়া মানব সেই পথেই প্রধাবিত। কাজেই যাহা সুপ্রসস্থ রাজবর্ত্ম যেখানে স্বার্থের দুশ্চিন্তা নাই—যথায় পথে বাঁচি নহে, নীতিপথ পরিদর্শক, সে পথে অধিক লোকে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন না—তাই মানবের দুর্গতি।

পৃথিবীতে উন্নতি প্রয়াসী নহেন এমন কোন মানব নাই; সকলেই এই উন্নতি প্রাপনার্থ নানাদিকে প্রধাবিত। সুসভ্য জর্ম্মাণ—ইংরাজ হইতে, অসভ্য এস্কুইমো—হটেণ্টট পর্য্যন্ত সকলেই ইহার জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। যে যত উন্নীত হইতেছে, তাহার বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন কামনাই তাহার উপভোগে প্রশমিত হয় না—প্রত্যুত তাহা ভূয়ো ভূয়, পরিবর্দ্ধিতই হইতে থাকে, যে ব্যক্তি কোন একটী কামনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—তাহার সেটি পূর্ণ হইলে তদপেক্ষা উন্নত কামনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করে—তৎপূরণের নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুলিত হয়, তাহা পূরিত হইলে আবার তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর কামনা তাহার হৃদয় মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কামনার পরিতৃপ্তি নাই—কামনা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। যতই ইহার ফল ভোগ করিবে ততই ইহা পাইবার নিমিত্ত হৃদয় প্রোৎসাহিত হইবে। তাই উন্নতি কামনা মনুষ্য হৃদয় হইতে তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য অন্তর্হিত হয় না—তাই মানবকুল অহর্নিশ ইহার নিমিত্ত ছুটাছুটী করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য সকল সময়ে ইহার পন্থা নির্ব্বাচন করিতে পারে না। উন্নতি লাভেরও দুটি পথ, একটি সুপ্রশস্ত—স্বার্থ জড়িত অথচ সুরুচি পূর্ণ; অপরটি প্রথম সঙ্কীর্ণ—পরিনাম প্রশস্ত—নিঃস্বার্থ মণ্ডিত—সুনীতি পরিপূর্ণ। প্রথম পথ অনুবর্ত্তন করিলে তাহার ফল উত্তম হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না; তাহা নিজের অভিপ্রায় মত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা আদর্শ হয় না, এদিকে দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করিলে তাহার ফল নিজের

নিকট উত্তম বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে কিন্তু তাহা ধ্রুব—তাহা সকলেরই অনুকরণীয়—তাহা সকলেরই পূজার বস্তু—তাহা উত্তমেরও পূজ্য। যে সকল মহাপ্রাণ এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন যাঁহারা মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতারও বরণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বিতীয় পথের অনুযাত্রী। আর যাহারা মনের সুখে খাইয়া গাইয়া হাসিয়া নাচিয়া আপনাদের রুচিমত কার্য্য সমাধা করিয়া পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত করিয়াছেন—যাঁহাদের খ্যাতি যাঁহাদের দেহের সঙ্গেই পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রথম পথের পথিক; তাঁহারা আর কোথাও নাই—জগতের সকলেরই কাছে তাঁহাদের বারতা জিজ্ঞাসা কর—কেহই আর তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না—কেহই আর তাঁহাদের কথা বলিতে পারেন না; তাহারা যেন কখন জগতে ছিল না—এই পৃথিবী যেন তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নহে। দুঃখের বিষয় এই পথেরই যাত্রীসংখ্যা অধিক, তাই পৃথিবীর এত দুর্গতি—তাই এত অধোগতি। যদি মানব সাধারণ এই দ্বিতীয় পথের পথিক হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গের আকার ধারণ করিত;—তাহাহইলে মানবে ও দেবে কোন ভিন্ন ভেদই থাকিত না, দেবতা হইতে, পৃথিবীর সেই অবস্থা প্রার্থনীয—ইহার এই রমণীয় অবস্থা সকলেরই আকাঙ্ক্ষনীয় হওয়া উচিত।

পৃথিবীতে মনুষ্য মধ্যে যে অবস্থাভেদ দর্শন করা যায়, তাহা এই পন্থা নির্ব্বাচনেরই ফল। একজনের দুই পুত্র; কিন্তু তাহার মধ্যে একজন মহাপ্রাণ—সকলেরই আদর্শ স্থানীয়—সকলেরই পূজ্য—দেববৎ মাননীয় এবং অপর জন হয়ত, পিশাচ হইতেও অধম—রাক্ষসীয় কল্পনাও হয় ত তাহার পাপ চিত্র যথাযথচিত্রিত করিতে সক্ষম হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি? উভয়েই এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া—এক মাতা পিতার যত্নে লালিত পালিত হইয়া এরূপ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয় কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই—অবশ্যই ইহার গূঢ় কারণ আছে। আমরা সেই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই; তাহারা উন্নতি লাভের এই পথ নির্ব্বাচন জন্যই কেহ দেববৎ হইয়া

উন্নতির উচ্চতোরণে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—আর কেহ বা পিশাচ-বৎ ব্যবহারে অধোগতির অধঃস্থানে যাইয়া পতিত হইয়াছেন। এক জনের পথ সুনীতি পরিপূর্ণ—অপরের সুরুচিময়, সুতরাং এক জন বাল্যকাল হইতেই নীতিপথে পরিচালিত হইয়া আপনার চরিত্রকে দেবতারও অনুকরণীয় করিয়াছেন—আর অপরজন আপনার রুচি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া দুষ্প্রবৃত্তি অনুরোধে আপনার চরিত্রকে পিশাচেরও ঘৃণ্য করিয়াছেন। তাই উন্নতি প্রারম্ভে পন্থা নির্ব্বাচন অতীব প্রয়োজনীয়; এই নির্ব্বাচন জন্যই কেহ দেবত—কেহ রাক্ষস। সুতরাং পথ নির্ব্বাচনের যথাযথ প্ররোচনা দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, না দিলে তাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য এবং এই জন্যই জগদ্গুরু মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ নানারূপে এই উপদেশ প্রদান করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে পৃথিবীস্থ সকলেই দেববৎ মান্যলাভে কৃতার্থ হন, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন: তাই যিনি যেরূপে উপদেশ সকলেরই গ্রহণীয় হয় বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি সেই রূপেই তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য মহাত্মা-গণ সকলেই এই একই উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রতীচ্য, পণ্ডিতগণের কথা ছাড়িয়া দিই; একবার আমাদের প্রাচ্য মহর্ষিগণের দিকে দেখি; দেখি তাঁহারা এই নীতি লোকের মনে কি ভাবে গাঢ়াঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তদীয় জগদ্বিখ্যাত বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ এক উপাখ্যানের অবতরনা করিয়াছেন;—"স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ নামে দুই পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে উত্থানপাদ সংসারী; তাঁহার দুই পত্নী, সুনীতি ও সুরুচি; রাজা দ্বিতীয়া পত্নীতেই সমধিক অনুরক্ত—তাঁহার ফল বা পুত্র উত্তম, প্রথমা ভার্য্যায় তিনি তত অনুরক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁহার ফল ধ্রুব। রাজা উত্তমকেই অধিকতর স্নেহ করিতেন—অঙ্কে লইতেন; ধ্রুব ক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা থাকিলেও সুরুচির ভয়ে তাহা করিতে পারিতেন না; কখন বা অঙ্কে উত্তোলন করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন। তাই ধ্রুব বাল্যকাল

হইতেই সন্ন্যাসী; তিনি মাতার নিকট উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া সংসারের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ; তাই মাতার অজ্ঞাতসারে রজনীর গাঢ়ান্ধকার তুচ্ছ করিয়া তিনি সেই অভীপ্সিত ফল লাভ করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; তাঁহার সেই প্রাণোৎসর্গের ফল ঈশ্বর সাক্ষাৎ; তিনি সেই বাল্যকাল হইতেই প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজিও তাঁহার নামধ্বনিত; তাই সাধারণ স্বর্গ তাহাকে স্থান দিতে পারিল না; তাঁহার জন্য অভিনব ধ্রুবলোক সৃজিত হইল। তিনি যে আশা করিয়াছিলেন 'আমি নিজগুণে এমন পদ লাভ করিব যাহা আমার পিতাও কখন প্রাপ্ত হন নাই," তাহাতেই কৃতকার্য্য হইলেন। পরিশেষে তাঁহার পিতাও তাঁহার অনুগ্রহের ভিখারী হইলেন।' মহর্ষি বেদব্যাস গল্পচ্ছলে এই মহান উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা বুঝে কে? এই রূপক ভাঙ্গিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয় কে? তিনি যে জন্য এই মহান হিতকর আখ্যায়িকার অবতরণা করিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ করে কে? পৃথিবীতে উত্থান পাদ বা উন্নতিলাভেচ্ছু সকলেই; কিন্তু প্রায় সকলেই সুরুচির বশীভূত—সুনীতি প্রায় সকলেরই নিকট পদ দলিত; তাই ধ্রুব ফল অবজ্ঞা করিয়া লোকে উত্তম লাভার্থ লালায়িত, তাই পৃথিবীর এত দুর্গতি। হায়! যদি পৃথিবীর সমুদায় মানব ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিত—করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইত তাহা হইলে এই পৃথিবী বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত।—যদি সকলেই সুনীতি প্রবর্ত্তিত পথে চালিত হইতে শিখিত তাহা হইলে এই বিলাস ভবন—নন্দন কাননে পরিণত হইত—তাহা হইলে এই নশ্বর পৃথিবী—অবিনশ্বর স্বর্গের আকার ধারণ করিত—তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতি একটি বিরাট দেবতা বলিয়া গণ্য হইত; সে পথ অধিকাংশেরই নিকট কণ্টকাকীর্ণ বলিয়াই আজি পৃথিবীতে ও নরকে কোন প্রভেদ নাই—ইহা যেন একটি বিভীষণ নিরয়।

পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দাও; একবার ভারত ভূমি—বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—ইহার ইদানীন্তন কতই অভাব দৃষ্ট করিবে। যে ভারতবর্ষ কিছুদিন পূর্ব্বে সুনীতির অগ্রণী ছিল আজি তাহা কুনীতি বা

সুরুচির পৃষ্ঠপোষক। যে ভারত এক সময়ে নৈতিক জগতে আপনার এতাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সমুদায় জাতিই সেই জন্য তাঁহার পদানত ছিলেন, তাহারা যাঁহার নিকট হইতে মূল সত্য গ্রহণ করিয়া আপনাপন দেশকে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ তোরণে অবস্থাপিত করিয়াছেন—যাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইবার জন্য কত দিন দিগন্তর হইতে লোক আসিয়া ইহার অমল ধবল গৌরব শ্রীর সমধিক দীপ্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই জগদারাধ্য ভারত আজি কুনীতির আশ্রয় স্থান। হায়! ইহার সে পূর্ব্ব গৌরব আজি কোথায়? অধিক দিনের কথা নহে যে ভারতবর্ষ চরিত্র গৌরবে—নীতি সৌরভে জগতের অনুকরণীয় ছিল—আজি তাহার সেই ভাস্করদীপ্তি কোথায় লীন হইল! যে ভারতে ত্রিংশৎ ত্রিকোটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া নৈতিক জগতে ক্ষমতা বিস্তার পূর্ব্বক দেবত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, সে ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটী সন্ততির মধ্যে আর কেহ দেবত্ব পাইবার অধিকারী নহেন, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা? যে সকল দেশ ইহার ছায়া মাত্র লইয়া উন্নতির উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছেন এবং তদবধি সূর্য্যকর-দীপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় আপনার শুভ্রকান্তিতে আপন অধিবাসীবৃন্দকে প্রফুল্লিত করিতেছেন---সেই সকল অধমর্ণ দেশে এখন আর মহাপ্রাণতার অসদ্ভাব নাই। অধমর্ণ এক্ষণে নিজের বলে বলীয়ান হইয়াছেন—সুতরাং উত্তমর্ণের দিকে আর ফিরিয়াও চাহেন না। উত্তমর্ণ সমুদায় দিয়া আজি পথের ভিখারিণী হইয়াছেন—সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—তিনি এক্ষণে তাহাদের অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন---হায়! সেই মহাকৃপাবতী এক্ষণে তাঁহাদেরই অধমর্ণ হইয়া তাঁহাদের কৃপাকণালাভের প্রত্যাশিনী, অহো!! ইহা অপেক্ষা তাঁহার কলঙ্কের কথা—তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহার কলুষিত সন্তানগণের ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও দুর্ভাগ্য আর কি আছে? যে ভারত এক সময়ে মহাপ্রাণতার আবাস ভূমি ছিল—এক্ষণে তথায় সেই শব্দেরও সম্পূর্ণ অভাব। বঙ্গবাসী—ভারতবাসী। আপন পন্থা নির্ব্বাচনের এমন জীবন্ত উপদেশ নয়ন সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও আর কেন ইতস্ততঃ করি-

তেছ; সুরুচি নহে—সুনীতি পথে পরিচালিত হইতে সচেষ্ট হও, তাহার ধ্রুব তোমার অনুবর্ত্তী হইবেই। এক্ষণে ধ্রুব ফল কামনা সকলেরই মানস মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি শান্তিলতা উপ্ত আছে দেখিতে পাইবে; না হইলে ভবিষ্যৎ চিরকালই ভীষণতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

প্রণয় উচ্ছ্বাস।

---

(১)

কয় দিন কতদুঃখে বিস্মৃতির নীরে,
ভাসাইয়া সে আনন, ছিল সুখে এ জীবন,
সহসা আবার কেন বল বরাননি ?
দেখাইলে স্বপনেতে সে সুখের খনি ?

(২)

কত দুঃখে সে অনল নিবাইয়া ছিনু,
কেন আজি পুনরায়, কাঁদাতে বল আমায়,
পুন সেই সুখ স্মৃতি জাগাইয়া দিলে,
দুঃখীরে কাঁদায়ে বল কি ফল লভিলে ?

(৩)

জানিতে যদ্যপি প্রিয়ে প্রণয়ের জ্বালা,
হতাশেতে নিরবধি প্রাণ কত জ্বলে যদি
জানিতে তাহলে কি এ দুঃখীর হৃদয়,
কাঁদাতে বাসনা তব হইত উদয় ?

(৪)

তা হ'লে হৃদয় তব হ'ত বিগলিত,

নয়নে নেহারি নীর, হত তব প্রাণাধীর
ভুলে নিষ্ঠুরতা—প্রিয়ে হ'তে দয়াবতী,
গলিত দুঃখেতে প্রাণ—কাঁদিতে এমতি।

(৫)

কিন্তু তা হবেনা প্রিয়ে হইবার নয়,
কাঁদিতে জনম যার, স্বর্গে সুখ নাহি তার
কাঁদাতেই সুখ তার জানি আমি মনে,
তাই কি কাঁদাও প্রিয়ে এ অধীন জনে?

(৬)

আর না, প্রেয়সী আন তিক্ষ্ণধার ছুরি,
কাট হৃদয়ের পট, দেখ প্রণয়ের ঘট,
সাত্ত্বিক প্রণয়ে দিয়ে আত্ম বলিদান
জুড়াই অনন্ত তরে বিদগ্ধ পরাণ।

(৭)

পারিবেনা?—দেখ তবে অটুট হৃদয়ে;
একটী একটী করি দেখাইব প্রাণেশ্বরি,
শিরা প্রতিশিরা যত রক্ত বিন্দু তার!
কেমনে তোমার প্রেম বিরাজে তথায়!

(৮)

দেখিবে প্রত্যেক বিন্দু শোণিতের মাঝে,
প্রণয়ের সিংহাসনে, বসে আছ সযতনে;
বাসনার অর্ঘ দিয়া তাপসের মত,
অচল হৃদয়ে আমি পূজি অবিরত।

(৯)

তাও দেখিবেনা?—প্রিয়ে দেখ একবার,
প্রত্যেক নয়ন-নীরে, মরি কিবা শোভা করে,
তোমার মূরতি জাগে প্রেম উপাদানে,
কত পূজা করি তার নিত্য মনে মনে।

(১০)

তাও যদি নাহি দেখ—দেখ একবার,
মলিন বদন ভাব, অজস্র নয়নাসার,
শত মুখে বাখানিবে আমার যাতনা
ভুলনা পুরাতে প্রিয়ে এ দীন-বাসনা।

(১১)

দেখিবেনা তাও প্রিয়ে, ওহো বুঝিয়াছি ;
ধর তবে প্রণয়িনি, সংহার মুরতি ধনি,
নাচুক করেতে অসি নাচুক কৃপাণ,
প্রণয়েতে আত্মঘাতি, লও বলিদান !

(১২)

নিবার নিবার প্রিয়ে জ্বলন্ত অনল,
দাও হাসি বলিদান, জুড়াক আমার প্রাণ,
তৃপ্তির নয়নে ওই দেখি রূপরাশি,
বিষাদ পরাণ তাহে হাসিবে উল্লাসী !

বিরজা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুভ সম্মিলন।

মনুষ্য চির দিন আপনার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা গণিয়া থাকে, অধিক কি তৎসম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শনেও সুখানুভব করে, এই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা যখন মানব মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন গোপাল চন্দ্র যে তাহার বিপর্য্যয় করিবেন, ইহা স্বপ্ন বা ঘোর দুরাশা মাত্র। গোপাল চন্দ্রের সাধের দুহিতা বিরজা অম্বিকাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্ম বা পাপের কার্য্য আর কি হইতে পারে? পণ্ডিতে আত্ম সমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সংসার বলিতেছে পণ্ডিত হইলে

ক্তি হইবে যাহার অর্থ নাই সে কি মনুষ্য? সে কি কখন প্রেমিক পদ বাচ্য হইতে পারে?—আমাদের গোপাল চন্দ্রেরও সেই ধারণা, বিরজার এই অসঙ্গত অলৌকিক আত্মসমর্পণ তাঁহার হৃদয় জর্জরিত করিতেছিল, তিনি তাহার প্রদাহনে অস্থির হইতেছিলেন।

গোপাল চন্দ্রের আশা বড় উচ্চ ছিল, তিনি মনে করিতেন বুঝি বিরজার তুল্য সুন্দরী আর দ্বিতীয় নাই, বস্তুতঃ গোপালের ধারণা নিতান্ত অলীক নহে। তাঁহার ধারণা ছিল বিরজা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত, তবে একটী রাজা খুজিয়া মিলেনা, কিন্তু তথাপি গোপাল তাঁহার আশালতার মূলে অবিরত বারিসিঞ্চন করিত। মনুষ্যের সকল আশা যদ্যপি সফল হয় তাহা হইলে সংসার ত সুখের, গোপালের এ দুরাশা সফল হওয়া কতদূর দুষ্কর তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু গোপালের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিরজা রাজরাণী হইবে; এবং সেই বিশ্বাসই তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল, বিরজার অম্বিকাকে আত্মসমর্পণ রূপ মহাপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই তাহাই ভাবিতে ছিলেন।

মনুষ্য একটী সূত্র ধরিয়া আশার অঙ্কপাতকরে। সুতরাং আমাদের বিচক্ষণ নায়েব মহাশয়ের আশা যে সূত্রহীন তাহা কি করিয়া বলিব?—কিন্তু সে সূত্রটী কি? নন্দনপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমীদার যাহাকে লোকে রাজা বলিয়া জানিত, তাঁহার বিজয় নামে একটী মাত্র পুত্র, তাহা বোধ হয় পাঠক অবগত আছেন। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু উমাচরণ যে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের সামান্য নায়েবের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন ইহা কি সম্ভব? কিন্তু গোপাল ভাবিত সম্পূর্ণ সম্ভব, গোপাল চন্দ্র সরকার হইতে ২৫ টী টাকা মাত্র বেতন পাইতেন কিন্তু গোপালের মাসিক ব্যয় দুই শত টাকার ন্যূন নহে, প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইত তাহাতেও বিলক্ষণ ব্যয় হইত,—এতদ্ব্যতীত আরও পূজা ও অন্যান্য প্রকার ব্যয় আছে, লোকজনকে ধার দেওয়াও আছে, সুতরাং গোপাল যে প্রভুর চক্ষে উত্তম রূপে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিতেন তাহা কে না স্বীকার করিবে?—গোপাল যে তাহার প্রভু অপেক্ষা বিচক্ষণ তাহাও ইহাতে বুঝা যায়। গোপাল রামচন্দ্র জন্মাইবার পূর্ব্বে রামায়ণ প্রকটনের ন্যায়

স্বীয় ভবিষ্যত সফলতার একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়ের চরিত্র বেশ জানিতেন, অর্থ সম্পন্ন জমীদারেরমুর্খ পুত্র যে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বিজয়ও যে সেই রূপ তাহা স্বীকার্য্য। গোপাল চন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বিজয় যদ্যপি কোন প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একবার বিরজার রূপে মুগ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। আর এ বিবাহে উমাচরণ বাবু বিরক্ত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তিনিই তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, বিজয় নাবালক, মনে করিলেই পিতৃ হস্ত হইতে বিষয় বাহির করিয়া লইতে পারিবে। বস্তুতঃ গোপালের এই আশাই দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিল, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। এবং এই আশাতেই বিজয়কে উত্তেজিত করিয়া অনাথা সহায়-শূন্যা আশ্রয় হীন অম্বিকাচরণের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন।

বেলা প্রায় অবসান সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভূমি হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ শাখ, বৃক্ষ শাখা হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে এই রূপে ক্রমান্বয়ে আকাশে উঠিতেছে এমত সময়ে এইরূপ দু-রা-দুশ্চিন্তা সহচরী সমভিব্যাহারে গোপাল চন্দ্র কত প্রকার কত কৌশল চিন্তা করিতে করিতে কার্য্যস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমত সময়ে দেখিলেন, বিজয় একাকী সেত পথে মৃদু পাদ বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন। বিজয়ের বয়ঃক্রম অনূ্যন ঊনবিংশতি বর্ষ— দেখিতে বেশ সুশ্রী কিন্তু শীর্ণ, যৌবনের যদৃচ্ছ অপব্যয়ে সাধারণতঃ যুবকের যে রূপ হইয়া থাকে ইনিও তদ্রূপ হইয়াছেন। গোপাল তাঁহাকে দূর হইতে চিনিলেন, মনে মনে বলিলেন "জগদীশ্বর আমাকে এমন দিন কবে দিবেন যে দিন বিজয়কে জামাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণ জুড়াইব," গোপালের চক্ষে প্রকৃতই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বিজয়ের বাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুধাধবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, মনে মনে বলিলেন "বিরজে! তুই এই অমরাবতীতে বিরাজ করিবি, নন্দন কাননের

প্রস্ফুটিত পারিজাত হইবি ইহা কি কম ভাগ্যের কথা।" তখনই আবার হত ভাগ্য অম্বিকাচরণের বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে স্থান পাইল, হৃদয়ে কে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল। এমত সময়ে গোপাল বিজয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন "আজ যে এ দিকে।"

বিজয়। এদিকে প্রায় আসি না বটে।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বল্‌তে সাহস্ হয় না, যখন এদিকে এসেছেন তখন একবার আমার কুটীরে পদার্পণ হবে না কি?"

গোপাল এখন সুযোগ খুঁজিতেছে।

বিজয়। ক্ষতি কি, বাটী কতদূর?

গোপাল। এই যে দেখা যাচ্চে, কাছে না হলে আপনাকে বল্‌তে পারি!

বিজয়। আচ্ছা চল।

উভয়ে চলিলেন, গোপাল বিজয়ের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমশ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল তাঁহার বাটীর সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্প কানন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়কে দেখাইলেন। বিজয় তাহার পারিপাট্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে বাটীর মধ্যস্থ উপরের ঘর—যে ঘরে বিরজা ও বিজলী বসিয়া ছিল সেই ঘরে লইয়া গেলেন, তথায় একটী সুন্দর পরিষ্কার শয্যা ছিল, গোপালচন্দ্র অতি সমাদরে বিজয়কে তাহাতে উপবেশন করাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজয় চন্দ্র।

সহসা কক্ষমধ্যে বিজয়কে দেখিয়া বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। বিরজার দাসী তাহার অনুসরণ করিল। বসন্ত যৌবন স্থিরা সৌদামিনী রূপা বিরজাকে দেখিয়া বিজয়ের মন যে বিচলিত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, বিজয় বিমূঢ়ের ন্যায় বালকের ন্যায় গৃহান্তর গমনপর বিরজার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। বিরজার অপূর্ব্ব মুখ শ্রী একবার মাত্র বিজয়ের কলুষিত নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহাতেই যেন কি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াবলে তথায় তাহা অঙ্কিত হইয়াছেন। গোপাল চন্দ্র সকল বিষয়েই বিচক্ষণ তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিজয়ের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা গণনা করিয়া পুলকিত হইলেন।

গোপাল বিরজাকে গৃহান্তরে গমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "বিরজা এদিকে এস মা ওঁকে লজ্জা কি?"

বিরজা আসিল না।

বিজয়। তোমার কন্যাটী পরমা সুন্দরী।

গোপাল "আজ্ঞা হুঁ।" বলিয়া আবার বিরজাকে বলিলেন "এস মা এস, এদিকে এস।"

বিরজা তথাপি আসিল না।

বিজয়। তাইত এনে বড় লজ্জা।

গোপাল। বিরজা! কথা শুন্‌চনা?

বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া দ্বারদেশে অধোবদনে দণ্ডায়মানা হইল, আবার বিজয় নির্নিমেষ লোচনে সেই সুধাময়ীর রূপবিভা অবলোকন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

বিরজার মুখে কথা নাই, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। গোপাল চন্দ্র এমত

সময়ে কোন কার্য্যের ভাণ করিয়া নিচেয় গেলেন, সেই সঙ্গে দাসী বিজলীকেও ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিরজাও যাইবার উপক্রম করিল কিন্তু গোপালচন্দ্র রাগভরে কহিলেন "উনি কি একা থাকিবেন, তুমি একটু থাকিতে পার না।"

বিরজার চক্ষু সজল হইল, দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবারি ধীরে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। বিরজা দাঁড়াইল।

বিজয়। একি তুমি কাঁদিচ!

বিরজা নিরুত্তর।

বিজয়। কেন বিরজা, কেন কাঁদচ?

বিরজা তথাপি কোন উত্তর দিল না।

বিজয়। দেখ বিরজা আমি তোমার রূপে বিমোহিত হইয়াছি, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি।

বিরজার ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল, ক্রমে কথা ফুটিল, বলিল "আপনার ও সকল কথা শুনিতে আমি এখানে দাঁড়াইয়া নাই।"

বিজয়। তবে কেন আছ?

বিরজা। পিতার অনুমতিতে।

বিজয়। তোমার পিতা কেন তোমায় একাকিনী আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন বুঝ নাই।

বিরজা। আমার তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই।

বিজয়। সম্পূর্ণ আছে, বিরজা আমার কাছে এস, তুমি রাজ মহিষী হইবে।

এই বলিয়া বিজয় বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন; বিরজা স্বীয় হস্তাকর্ষণ করিয়া সরোদনে প্রস্থান করিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় বিজয় কিছু মাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, দ্বারের পশ্চাৎ ভাগে গোপালচন্দ্র গুপ্তভাবে তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন, বিরজাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রোষভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "পাজি মেয়ে, যার খেয়ে এত বড়টা হলি তাঁর কথা শুনিস্ নে। তোর সৌভাগ্য যে উনি তোকে বিবাহ করতে চেয়েছেন।" বিজয়ের দিকে ফিরিয়া

কহিলেন “বিরজা বালিকা, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করিবেন না। আপনার প্রস্তাব আমার শিরোধার্য্য।”

বিজয়। তবে আমি এখন আসি?

গোপাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল ‘বলতে পারিনে জলখাবার আয়োজন হয়েছে, যদি—’

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন “না না আজ নয়, আর এক দিন হবে।

গোপাল আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, বিজয় ধীরপাদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। গোপাল বাটীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত বিজয়ের অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতা ও পুত্রী।

বিজয়চন্দ্র প্রস্থান করিলে গোপাল আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তথায় বিরসবদনে বিরজা উপবিষ্টা, যাহার একটীমাত্র কন্যা! ব্যতীত এ সংসারে আর কেহ নাই, তাহার সে কন্যাটী যে কত আদরের ধন, তাহা সাধারণে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহাই হউক বিরজা যে গোপালচন্দ্রের সমস্ত সুখের আধার তাহা স্বীকার্য্য। এতক্ষণ পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে তবে বিরজাকে সুখী করাই গোপালের ইষ্ট মন্ত্র, সুতরাং বিরজার অমতে তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু হতভাগিনী বিরজার কপালে আপনার স্থিরবুদ্ধি। ন্যায়সঙ্গত যুক্তি স্থান পাইল না। বিরজার মনোমত পাত্রে বিবাহ দিলে বিরজা ভবিষ্যতে সুখী হইবে—আপনি ইহাই স্থির করিতেছেন, কিন্তু কে জানে তাহাতে কি ফল ফলিবে, মনুষ্য অতীতের দ্রষ্টা, উপস্থিতের কর্ত্তা, কিন্তু ভবিষ্যতের কেহই নহেন। সে যাহাই হউক বিরজার মনোমত পাত্র

কে ? পাঠক। আপনি হয়ত বলিবেন—অম্বিকাচরণ। আমরাও তাহাই বলি, কিন্তু গোপালচন্দ্র তাহা ভাবিয়াও ভাবিলেন না, দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি স্ত্রীলোককে সংসারের জীব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, স্ত্রীলোকের মত নাই, বুদ্ধি নাই, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীতে কেহ অধিক অনুরক্ত হইলে তাঁহাকে স্ত্রৈণ্য বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, স্ত্রী না থাকায় গোপালচন্দ্রের এই ধারণা ও সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, সংক্ষেপে স্ত্রীলোক জগতের কেহই নহে ইহাই তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধির সুখফল।

স্ত্রীলোক বুঝে না সুতরাং বিরজা বুঝিবে কি প্রকারে? বিরজা যে আপনার সুখ দুঃখ বুঝে না ইহা গোপালচন্দ্রের বড় দুঃখ। কোথায় রাজরাণী হইবে, তিনি রাজশ্বশুর হইবেন, ইহাতে তাহার অনিচ্ছা, অথচ আশ্রয়, সহায়, সম্পত্তিশূন্য অম্বিকাচরণকে ভালবাসিতে, বিবাহ করিতে, বিনামূল্যে তাঁহার চরণে ইহ জন্মের তরে বিকাইতে প্রস্তুত। কিন্তু একথা কি কেহ শুনে? স্বার্থে পরিবর্দ্ধিত আশালতার মূলে, কে এমন অন্ধ আছে যে কুঠারাঘাত করিবে? যদি থাকে সে সংসারী নয়, সে নররূপী দেবতা। কিন্তু ভূত কখন মানুষ হয়? মানুষ ভূত হইতে পারে, গোপাল আমাদের সেই বিস্মৃত কিমাকার ভূত, সে স্বার্থান্ধ।

গোপালচন্দ্র বিরজাকে বলিলেন "তুই কি খুকি ?"

বিরজা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন ?"

গোপাল। কেন ?—বিজয়বাবুর সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার ?

বিরজা ভীতভাবে কহিল "আমিত কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই।"

গোপাল। আমি তাঁরে কত যত্নে এখানে নিয়ে এলাম, মনে করলাম তুই তার কত আদর করবি, তিনি তোর কথায় ভুলে যাবেন তার সব বিপরীত। তিনি বিবাহের প্রস্তাব করলেন আর তুই সেখান থেকে চলে গেলি।

বিরজা। আমার কাছে সে প্রস্তাব করা তাঁর নিতান্ত অন্যায়।

গোপাল। অন্যায়। তিনি তোকে বিবাহ করলে তোর সৌভাগ্য।

এ কথা বিরজা সহিতে পারিল না, বলিল—"তাঁর মত কাপুরুষকে কে বিবাহ করে।"

গোপাল। তুই বলিস কি? তোর জন্যে কি শেষ আত্মহত্যা কর্‌ব নাকি?

বিরজা। আমি সে কথা বলিনি,—আমার বিবাহের জন্য আপনি অত বিব্রত হবেন না।

গোপাল। তবে কে হবে?

বিরজা। আমার মত আপনি ত জানেন।

গোপাল। কি মত।

বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল, সেই সুন্দর নয়নযুগল হইতে দুই ধারে মুক্তাফল বর্ষিত হইতে লাগিল।

গোপাল। বিরজা তুই বলিস্ কি? তুই সেই ফকিরটাকে বিবাহ করতে চাস নাকি?

বিরজা নিরুত্তর।

গোপাল। সে মত ত্যাগ কর—আমার কথা শুন, আমি তোমার হিত ব্যতীত অপর চিন্তা করি না।

বিরজা। আপনি ও কথা বল্‌বেন না।

গোপাল। যদি আমায় চাও তবে সে কথা ছাড়।

বিরজা। আপনি যদি চরণে ঠেলেন তবে উপায় নাই।

গোপাল রাগভরে কহিলেন "কি আমায় ত্যাগ করিতে প্রস্তুত! সে তোকে খাওয়াবে কি?"

বিরজা। তিনি যা খাবেন।

গোপাল। তাঁর ত উপবাস।

বিরজা। তবে আমারও তাই হবে।

গোপাল। থাক্‌বি কোথায়?

বিরজা। গাছতলায়।

গোপাল "বটে—দেখা যাবে" এই কথা বলিয়া তিনি আপন

কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন, সে রাত্রে আহারাদি কিছুই করিলেন না, শুনিয়াছি ভালরূপে নিদ্রাও যান নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অপকার্য্যের শেষ।

গোপালচন্দ্রের বুদ্ধির দৌড় এত, যে ভাল ভাল প্রফেসার তাঁহার সমকক্ষ নহে। গোপাল দেখিলেন যে অমানিশানাশে প্রকৃতই পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার সাধের চারাগাছে সত্যই কুঁড়ি ধরিয়াছে। বিজয়ের মন যে ভিজিয়াছে তাহা তিনি বেশ অবগত হইলেন। কিন্তু উপায়। হতভাগিনী বিরজা ত বিজয়কে চায় না। রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে বাস তাহার অভিপ্রেত। রাজার পুত্র বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্র আশ্রয়শূন্য, কাহার সম্পত্তিশূন্য পথেরভিখারি অম্বিকাচরণে আশক্ত।

যিনি লেখনি সঞ্চালনের বলে একের সম্পত্তি অন্যের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন, তিনি যে একটী স্ত্রীলোকের মনের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন, এমন বুদ্ধি ধরেন না, একথা গোপাল প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিবেন না। তিনি ভাবিলেন স্ত্রীলোকের হৃদয় দর্পণবৎ, যাহা সম্মুখে থাকে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা কমিলে তাহা আর থাকে না। চাকরিটী না থাকায় অম্বিকার স্বাধীনবৃত্তিটুকু গিয়াছে বা দু দিনে যাইবে, কিন্তু বিরজার ত তাহাতে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন কর্ত্তব্য কি? অম্বিকাকে বিরজার নয়নান্তরাল করা আবশ্যক, তাহার উপায় কি? সহসা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। গোপাল কয়েক দিন এই উপায় চিন্তায় গাঢ়নিরত রহিলেন, বিজয়চন্দ্রের সহিত সেই অবধি বেশ মাখামাখি হইয়াছে, গোপাল যাহা বলেন বিজয় এখন তাহাই শুনেন।

গোপাল বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিলেন. অম্বিকার উপর কোন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ অর্পিত করাই স্থির হইল। সে অভিযোগ কি? এ সম্বন্ধে বিজয়ের পরামর্শ লওয়া হইল. শেষ রটনা করা হইল যে "অম্বিকা রাজকুমার বিজয়ের পরম শত্রু, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে." এই রটনা মুহূর্ত্ত মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইল. বিজয়ের পিতার কাণে গেল, তিনি তখনি অম্বিকাকে বাঁধিয়া আনিতে অনুমতি দিলেন, অনতি-বিলম্বে হস্ত পদ বদ্ধ অম্বিকাকে আনা হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবই সকল রাজা বা জমীদারের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিজয়ের পিতা উমাচরণের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় না থাকিলেও নবাব বাহাদুরের নিকট যে উমাচরণের প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্বীকার্য্য। গোপাল-চন্দ্রের প্রখর যুক্তিতে স্থির হইল যে অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হউক, নবাব বাহাদুর যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন তাহাই সকলের নিঃসন্দেহ অনুমোদনীয় হইবে। ইহাই স্থির হইল, হতভাগা অম্বিকা তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। বেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, কিন্তু সেখানে এমন কেহই ছিল না, যে অম্বিকার আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে। আমরা নিশ্চয় জানি অম্বিকার তখনও আহারাদি হয় নাই। ভাগ্যহীন নির্দ্দোষী অম্বিকা নির্ম্মল হৃদয়ে জ্ঞানবার্য্য হৃদয়ের উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিরজাকে ভালবাসিয়া মহাপাপ করিয়াছে বলিয়া, আজি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে অনশনে বন্দীভাবে মুর্শিদা-বাদাভিমুখে রক্ষি সমভিব্যাহারে চলিল।

পাঁচুর পাগ্‌লামি.

পাঁচু নিজে।

চতুর্ধুরীণ দাদা, সে দিন যে আমাকে ততটা বিরক্ত করিতেছিলেন সে কর্ম্মটা কি আপনার ভাল হয়েছিল?—আপনি বুদ্ধিমান্ বিবেচক বয়সে প্রবীণ, আপনাকে একথাটা বলছি অধিক—আপনি অনুগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে আমার নিকট সংসারের নানা কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাই আপনাকেও আমি আগ্রহ সহকারে বলি, কিন্তু আপনি যে সেই সকল কথা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পন্থা বাহির করিয়াছেন, তাহা জানিতাম না। আমি পাঁচু——আমার কথা সাময়িক পত্রিকায় স্থান পাইবে তাহা অগ্রে জনিতাম না। সেদিন অবকাশ কালে আপনাকে যাহা যাহা বলিয়া ছিলাম——আপনার সহিত যে যে কথা হইয়াছিল—দেখি না আদরিণীতে সেই গুলি অবিকল আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, যে আদরিণী সম্পাদকের লেখকের অসদ্ভাব, আর আপনার অর্থোপায়ের এক নূতন পন্থা বাহির হইয়াছে। আমার উক্তিকে "পাঁচুর পাগ্‌লামি" নামটী যে দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রযুজ্য বটে। আমি এই সংসারে যাহা যাহা করিয়াছি, যাহা যাহা দেখিয়াছি, আর সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া যে পাগলামী করিতেছি, তাহা ঠিক। আমার এই পাগলামীর কথা যদি আপনাকে একান্তই বলিতে হইল, তবে বলিয়া রাখি আমার পাগলামীর ভিতর সংসারটী নখদর্পণের ন্যায় দেখিবেন। আমি মিষ্ট্রী তরজমা করিব না, উপন্যাস লিখিব না। দিবা দ্বিপ্রহর জগৎ নিস্তব্ধ আকাশে আগুনের থালা সূর্য্যদেব অগ্নি ছড়াইতেছেন, এমন সময় একটী যুবক বর্দ্ধমানের কোন প্রান্তরের উপর দিয়া যাইতেছেন, যুবকের চলন ভঙ্গিতে বোধ হইতেছে তিনি চিন্তিত ইত্যাদি বাঁধুনিতে আমি পাঠক গণের মন ভুলাইতে পারিব না। যে হেতু "যার কর্ম্ম তারে

সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" ও সকল কাঁঠালতলার বাঁকা দাদার মুখেই শুনিতে ভাল। ছাতার পক্ষী ময়ূরের মত চলিতে গিয়া আপনার নৃত্য ভুলিয়া এখন লাফ দিয়া চলে। তবে আমি পাঁচু মোটা মোটা লোক সাদা কথায় সংসারের সার বিষয় গুলি বলিয়া যাইব, ইহাতে যিনি তুষ্ট হয়েন হউন, রুষ্ট হয়েন হউন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই সংসারে প্রতি দিন প্রতিক্ষণ যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহা সংসারের মনুষ্যের চক্ষের উপর ঘটিতেছে, মনুষ্যকে লইয়াই ঘটিতেছে। যার ঘটে, যাকে লইয়া ঘটে, সেই দেখে সেই শিখে. সাধারণে বড় তাহাতে একটা দৃষ্টি দেন না। ধনী ধনের চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত, ধন ধন করিয়া পাগল সদা ধন চিন্তায় মত্ত, যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী মরণাপন্ন পীড়ায় অভিভূত, তখন তিনি উপর দিকে দৃষ্টি করেন, ঈশ্বরকে চিন্তা করেন, প্রাণ ভরিয়া পুত্রের আরোগ্য কামনায় তাঁহাকে ডাকেন, তখন তাঁহার সংসার খেলার চটকা ভাঙ্গে, তখনই তিনি ঋষিভাব অবলম্বন করেন, সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, মুখে বলেন, সংসার কেবল ছায়াবাজি, সুখ দুঃখ ছায়া মাত্র, ঈশ্বর ছেলেটীকে সুস্থ করুন এবার হইতে তাঁহার সেবায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিবেন। ঈশ্বর পাপীর পরিতাপে প্রসন্ন —ছেলেটী আরোগ্য হইল, পথ্য পাইল, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, ফিটেনে চড়িয়া ইডেন উদ্যানে দুসন্ধ্যা দুবেলা বেড়াইতে আরম্ভ করিল, ধনী তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন ছেলেটীর পীড়ায় অনেক ব্যয় হইয়াছে, ছেলেটী বসিয়া থাকায় সাংসারিক আয়েরও অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে, কিসে এখন সেই ক্ষতি পূর্ণ হয়? তিনি আঁটিয়া সাটিয়া বসিলেন, ভিক্ষুকের ভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন, বিকৃত স্বরে তাহাদের আর্ত্তবচনের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। আমি পাঁচু পাগল হাজার বলি হাজার চীৎকার করি, তাঁহাদের কর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। তবে আপনি শুনিতে চাহেন তাই আপনাকে বলিতেছি। আমি মহাশয়

ইহ সংসারে এই সকল দেখিতে বসিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, দেখিয়া সংসারের পাঠ ভাল করিয়া শিখিয়াছি, সমস্ত আপনাকে ভাল করিয়া বলিব। সকল বিষয় লিখিত থাকুক, সকল সময়ে সকলের চক্ষে সকল ঘটনা ঘটে না। যিনি আমার পাগলামী পড়িয়া একটু পাগলের ছিট পাইবেন, তিনিই সংসারের সোজা পথে চলিতে পারিবেন। আমি আইন দেখিয়াছি, আদালত দেখিয়াছি, হাকিম দেখিয়াছি আমলা দেখিয়াছি, পুলিষ দেখিয়াছি, পাহারাওলা দেখিয়াছি, শঠ দেখিয়াছি, সরল দেখিয়াছি, ডাকাইত দেখিয়াছি খুনে দেখিয়াছি, এ সকলের উপর ইংরেজ দেখিয়াছি, ইংরেজের সেবক দেখিয়াছি, ধর্ম্ম দেখিয়াছি অধর্ম্ম দেখিয়াছি, ফল কথা সংসারে যাহা আছে সকলই দেখিয়াছি—তাহা দেখাইব, এস কে আছ, বৎসরে দুই টাকা দিয়া আদরিণী পড়।

চতুর্থ পাঠ দাদাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, দাদা মহাশয়, একটু দয়া করিবেন, পাচুর মস্তকে পা দিয়া ডুবাইবেন না, বড় দাদায়, পা দিলে ক্ষতি নাই, তবে ডুবিয়া গেলে কিছু ক্ষতি আছে। বড় আদরের জিনিষ জীবনটা পাছে যায় এই ভয়— কম্পোজিটার মহাশয়দিগকে বলিয়া দিবেন যেন কমা, সেমিকোলন চিহ্ন গুলার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বেচারাকে বজায় রাখা হয়, আজি কালি পাঁচু সাহেবের চাকরী করে, ইংরেজী বৎসর শেষ, শাল তামামীতে বড়ই বিব্রত। আজ এই পর্য্যন্ত, ইহাতেই আদরিণীর পৃষ্ঠা কয়েক পূর্ণ করিবার নিয়মটা রক্ষা করুন। শাল তামামীর শেষে আবার কলম ধরিব। দাদা তবে এখন আসি।

রণবীর এবং ধর্ম্মবীর।

প্রকৃতির আদিষ্ট শক্তি। শক্তি যোগে এই সুবৃহৎ বিশ্বযন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং অসংখ্য সৌর মণ্ডল শুদ্ধ শক্তিবলে নিজ নিজ কক্ষে নিবদ্ধ থাকিয়া শূন্যপথে সতত সঞ্চরণ করিতেছে। সংক্ষেপতঃ এই বিশ্বরাজ্যের সকল ব্যাপারই এক। শক্তি যোগে সিদ্ধ হইতেছে। সেই অখণ্ড অজেয় অনন্ত শক্তি দ্বারা বিশ্বমণ্ডল শক্তিময় হইয়া রহিয়াছে। শক্তির অভাবে ঊর্ম্মিমালা বিশোভিত—অনন্ত কলেবর সাগর বক্ষ শান্ত হইয়া যায়, যোদ্ধৃদেহ গৃধ্রচঞ্চুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এই বিশ্বযন্ত্র নীরব হইয়া যায়, সুতরাং শক্তিই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ। জড় শক্তি যেমন জড় জগতকে জীবিত রাখিয়াছে, সেইরূপ মানব সমাজও বিবিধ শক্তির সহায়তায় অনুক্ষণ চালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে আমরা দুইটী শক্তির বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাই। বীর্য্যশক্তি ও প্রেমের শক্তি। জনসমাজের এক দিকে প্রভুত্ব নির্য্যাতন, ও শোণিত নিঃসরণ,—অপর দিকে প্রেমালিঙ্গন দেখিতে পাই। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারিত্ব কাহার অধিক? ধর্ম্মোন্মত্ত মহাম্মদ উন্মুক্ত কৃপানে নরকণ্ঠ ছেদন করিতে করিতে যে মন্ত্র প্রদান করিলেন, শ্রীচৈতন্য নর নারীর চরণালিঙ্গনে তাহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই এক মন্ত্রে দীক্ষিত;—এক জনের রসনা হইতে শৌর্য্যস্ফুলিঙ্গ উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল, অপরের কণ্ঠে প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল, এক জনের বাক্যের পশ্চাতে দাম্ভিকতা প্রভুত্ব, অপরের পশ্চাতে বিনয়, এক জনের হস্ত নর রক্তে কলুষিত, অপরের হস্ত পদরজে শোভিত, এইরূপ উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়। উভয়েরই এক প্রভুর কার্য্য,—তাই বলি বীর্য্যবল ও প্রেমের বল এ উভয়ের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? মহম্মদের জ্বলন্তবাণী তদীয় সমাধির সহিত নিহিত হইয়াছে, কিন্তু ইঁহার সমাধিক্ষেত্র হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি মহানাদ সমুত্থিত হইয়া এখনও ধর্ম্মাকাশ বিকম্পিত করিতেছে। নেপোলিয়নের অত্যদ্ভুত রণ-পাণ্ডিত্য সমগ্র ইয়োরোপকে প্রকম্পিত করিতে পারে নাই, কিন্তু ঈশার কয়েকটি কথায় তাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। শাণিত অসি সবলে ভৈরবহুঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা যে কথাটীকে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ করান যাইতে পারে না, শুদ্ধ প্রীতির দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক্ হৃদয়ে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া যায়। এ রহস্যের কারণ কি? বীর্য্যবল শ্রেষ্ঠ নয় কেন? কারণ তদ্দ্বারা গুরুতর ভার আসিয়া পড়ে। বল পূর্ব্বক কাহাকেও কোন কথা বলিলে তদ্দ্বারা বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হয়, সুতরাং যাহাকে বলা হয় সে আপনাকে নীচ বোধ করে এই হেতুই একজন নীচ এবং অপর ব্যক্তি উচ্চ হইয়া পড়ে। মনুষ্যের যে স্থলে হীনতা বোধ হয় সেখানে ভয়, সঙ্কোচ, অবাধ্যতা উপস্থিত হয়। নিজ হীনতা উপলব্ধি করিয়া মানুষ অপরের কোন উপদেশ বা আদেশ পালন করিতে বিশেষ উৎসুক্য প্রকাশ করে না। যদিও শাসন বা লোকপ্রিয়তার ভয়ে তাহা পালন করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলেও তাহা তাহার জীবনে বিদ্ধ হয় না। ক্ষণকাল বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত যেন সশঙ্কিত বা সঙ্কুচিত অন্তরে প্রতিপালন করিয়া থাকে। নীচতার সহিত অপরের নিকট কোন উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইলে স্বতঃই অন্তঃকরণে নিজ অপদার্থতা উপস্থিত হয়। এরূপ সঙ্কুচিত অবস্থায় একজন অপরের নিকট কোন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে বা কোন অনুমতি পালন করিতে সমুৎসুক হইলেও তাহা কোন বিষয় ফলপ্রদ হইতে পারে না, বীর্য্য বা প্রভুত্ব বিস্তারে মানব চিত্ত যেরূপ সঙ্কোচ দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আর কোন বিষয়েই হয় না, তাহা প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যকে কোন মত বা আদেশের অনুবর্ত্তী করা যাইতে

পারে না। অনেকেই স্বাবিষ্কৃত কোন অভিনব তত্ত্বক্ষেত্রে অপরের হৃদগত কলুষিত ক্ষীণ বিশ্বাসকে আনয়ন করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। মহাম্মদের হৃদয় যে পারমার্থিক সত্যাগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সে পরিমাণে তাহা বিস্তার করিতে পারেন নাই, আবার বিস্তারিত হইয়াও সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই। ইহার কারণ কেবল প্রীতির অভাব। তিনি পৃথিবীতে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে আসিলেন, তাহাতে মানবগণের অন্ধতা বিদূরিত হওয়া দূরে থাক্, তাহা বিকৃত হইয়া মানব জাতিকে দগ্ধ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ বীর্য্য দ্বারা একটিমাত্র কথাকেও মনুষ্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি! উন্মুক্ত তরবারি হস্তে করিয়া একজনকে নিরর্থক বলদ্বারা যে কথাটিতে বিশ্বাস করান যাইতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা তদপেক্ষা বৃহত্তর শত অসংখ্য হৃদয়ে নিবদ্ধ হইতে পারে। বীর্য্যবল অপেক্ষা প্রেমের বল এত অধিক কার্য্যকারী কেন?

প্রেমের দ্বারা দূরস্থিত দেশ অদূরবর্ত্তী হয়, প্রেমে উচ্চ নীচতা সংশয় সঙ্কোচ সমস্তই অপসারিত হইয়া যায়। সেই জন্যই প্রেমের শক্তি অদ্ভুত ও দুর্জ্জয়। প্রেমের আবির্ভাবে একজন উচ্চ একজন নীচ, একজন সম্ভ্রান্ত অপর জন মধ্যবিত্ত এরূপ ভাব আসিতে পারে না। সুতরাং এক হৃদয়ের ভাব সহজেই অন্য হৃদয়ে গিয়া বিদ্ধ হয়। যদিও একজন ধনগর্ব্বে বিস্ফারিত এবং অন্য ব্যক্তি নিদারুণ ক্লেশে মুহ্যমান তথাপি যদি তাহাদের মধ্যে প্রেমের ভাব সঞ্চারিত থাকে, তাহা হইলে কখনই সে বৈষম্য স্থান পাইতে পারে না। ধনী অক্লেশে ধন মত্ততা বিস্মরণ পূর্ব্বক দরিদ্রের রুগ্ন কণ্ঠালিঙ্গন করিতে বাধিত হন এবং দরিদ্রও মলিন করপল্লব বিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হন না। প্রেমের দ্বারা যেমন তারতম্য তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ উভয়ের

মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়া যায়। একতা হইতেই বন্ধুতা জন্মায়, এবং একতাও প্রেমের সম্মিলনে আবির্ভূত হয়। প্রেমস্রোত যে ক্ষেত্রের উপর দিয়া বাহিত হয়, সেখানে বৈষম্য, বিদ্বেষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বিবিধ বৈষম্য সমন্বিত এই বিস্তীর্ণ জগতে প্রেমিক ব্যক্তির কেহ প্রতিপক্ষ বা বিদ্বেষ্টা নাই। তিনি ধনীবৃন্দের পরিতোষের নিমিত্ত বিবিধ ভাবার্থক শব্দজাল বিস্তার করেন না, কিম্বা স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্যও কোন সুযোগান্বেষণ করিতে বাধ্য হয়েন না। তাঁহার রসনা একজনের স্তুতিবাদ এবং কাহার নিন্দাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। প্রেমিকের হস্ত একজনের চরণ সেবা ও অপরকে পীড়ন করিতে নিয়োজিত হয় না। তিনি উদার অনন্ত প্রেমচক্ষে জগতকে দৃষ্টি করেন। প্রেমিকের কেহ আত্মপর থাকে না, বিশ্বাসী মাত্রেই তাঁহার পরমাত্মীয়, এই বিশ্বসংসার তাঁহার গৃহস্বরূপ। মহাত্মা চৈতন্যদেব যখন নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘিকা পথের বিবিধ সুরম্য নগরী, তৃণ গুল্ম সমাকীর্ণ অসংখ্য শ্যামল ক্ষেত্র ইত্যাদি অতিক্রমণ এবং তৎসহকারে বিবিধ শাস্ত্র ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতদিগকে বিচার যুদ্ধে পরাস্ত করত ভক্তি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদা কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হন। তথায় গিয়া দেখিলেন একটী লোক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, তাহার গলিত মাংস খণ্ড, ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ, বীভৎস মূর্তি, এই সকল দেখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজন এমন কি পিতা মাতাও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তিনি সেই স্বজন পরিত্যক্ত গলিত কুষ্ঠীকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! প্রেমিক লোকের প্রকৃতি কি উন্নত। তাঁহারা এ পৃথিবীর স্বতন্ত্র লোক। মহর্ষি ঈশার জীবন কি জ্বলন্ত প্রেমের নিদর্শন; তিনি যাঁহাদিগের তিমিরাবরণ উন্মোচন করিয়া হৃদয়কে আলোকিত করিলেন, সেই শিষ্যবর্গের প্রতি কি প্রেমিকতা দেখাইলেন—" * * * And that he

was come from God, and went to God He riseth from supper and laid aside his garments and took a towel, and girded himself. After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples, feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded" ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাত্মা খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত ও তথাকার যাত্রী জানিয়াও নিজ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন এবং কটিতটে গামছা বন্ধন পূর্ব্বক পাত্র হইতে জল লইয়া শিষ্যগণের চরণ ক্ষালন করিতে লাগিলেন।—আমরা ইহার ভিতরে কি দেখি? প্রেমিকতার অত্যদ্ভুত নিদর্শন। প্রতিভাসমুৎপন্ন অসীম শক্তির বিকাশ নিবন্ধন তাঁহার জীবনে, যে গরিষ্ঠতার উদয় হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি সাধারণের পূজার্হ হইয়াছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি উচ্চপদবীস্থ হইয়াছিলেন, শিষ্যকুল তাঁহাকে আরও উন্নত বলিয়া স্বীকার করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থলে উচ্চনীচতা বিদ্যমান, সেখানে প্রেমের স্রোত বহে না। একজন রত্ন সিংহাসনের উপযুক্ত এবং অপর সমুদায় তদীয় চরণের সেবক, এই অযোগ্য কথা সকল হৃদয়ে সমান আদর বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। খ্রীষ্ট প্রেমসঞ্চারের বিরোধী বুঝিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে খ্রীষ্টের—সেই অসামান্য প্রেমিকের শিষ্যগণ মোহিত হইলেন, উভয় ক্ষেত্রই প্রেমবন্যায় ভাসিতে লাগিল। এইরূপেই প্রেমের বাষ্প সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ব্যবধান যেখানে, বাধা যেখানে, তথায় প্রেম সুচারুরূপে আবির্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং যে স্থলে প্রেমের স্রোত সঞ্চারিত হয় তথায় দ্বিধা সঙ্কোচ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রেম দ্বারা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়, অতি রমণীয় বন্ধুতাসূত্রে উভয়ের প্রাণ মন আবদ্ধ হয় এবং উভয়ের বৃত্তি সমূহ অসঙ্কুচিতভাবে বিস্তারিত হইতে থাকে। এক্ষণে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, প্রেমের কার্য্যকারিতা শক্তিই প্রবল। বীর্য্যবান-কখন কোন মত বা কোন নীতি লোক সমাজে সহজে বিস্তার করিতে পারে না। অধিক কি রাজ্য বা প্রভুত্বে প্রজাশাসন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

পাঠকগণ। আয়র্লণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ তথায় যে পরিমাণে কঠোর নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই পরিমাণে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইতেছে। রুশিয়ারও এই অবস্থা। সম্রাট নিহিলিষ্টদিগকে যেরূপ নৃশংস নীতির আয়ত্ত করিতেছেন, তাহারাও সেই পরিমাণে দৃপ্ত শার্দ্দুলের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। আমাদিগের দেশেও এক্ষণে ঐরূপ প্রথা সঞ্চারিত হইতেছে। ইলবার্ট বিলের তুমুল বাদানুবাদের ভিতর হইতে এক দল নীচমনা ইংরাজ বলিতেছেন, যে "তরবারির বলে এদেশ অধিকৃত হইয়াছে, তরবারির দ্বারাই ইহা রক্ষিত হইবে।" কিন্তু গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট, নর্থব্রুক প্রভৃতি উদার চেতা ইংরাজগণ এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে প্রীতির দ্বারা, সদ্ভাবের দ্বারা এদেশ শাসন করিতে হইবে। তরবারির বলে কখন কোটি কোটি লোকের হৃদয়কে বশীভূত রাখা যায় না, একথা তাঁহারা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহারা ওকথা বলিবেন কেন? বীর্য্যবল অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু প্রেমের শক্তি যে অপরিসীম, প্রেমের বল যে শ্রেষ্ঠ তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝা যাইতেছে। কূট বুদ্ধি লোকেরা বলেন যে, সকল অপেক্ষা অর্থবলই শ্রেষ্ঠ। অর্থের কুহকিনী শক্তিতে পতিপ্রাণা রমণী সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয় বটে, ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি বিষয়ারণ্যের নিবাসী হয় বটে—কিন্তু কে বলিতে পারেন যে প্রেমের শক্তি তদপেক্ষা দুর্ব্বল? প্রেমের আধিপত্যে মনুষ্য আত্ম বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ঐ দুই শক্তির আনুকূল্য লইয়া সমাজ মধ্যে দুই শ্রেণীর লোকে জয়শ্রী লাভে উদ্যত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর লোক রণবীর, ইহাঁরা কেবল বীর্য্যবলেই দেশাধিকার করিতে প্রস্তুত, অপর শ্রেণীর লোক ধর্ম্মবীর ইহাঁরা প্রেম দ্বারাই জয়সাধন করিতে ব্যস্ত। ইহাঁরা সাধ্য হীন, কিন্তু ইহাঁদিগের লক্ষ্য অতি উন্নত এবং মহান্। একদল শাক্ত এবং শেষোক্ত দল বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের জয় অবশ্যম্ভাবী, কেন না ইহাঁরা প্রেমের সাধনা করেন। প্রেম ভিন্ন যে ধর্ম্মমত স্থায়ী হয় না এবং সেই জন্যই যে পৃথিবীর ধর্ম্মবীরগণ

প্রেমার্দ্র, তাহা নহে। প্রেম ভিন্ন কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হয় না। প্রীতির দ্বারাই ধরিত্রী স্বর্গোপম হইবে, প্রীতির বলেই মনুষ্য জাতি দেবত্বপদে অধিষ্ঠিত হইবে। অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় যাহা সিদ্ধ না হয়, যে কার্য্য রক্তপাতে সফল হয় না, তাহা প্রেমে সিদ্ধ হয়, সুতরাং প্রেমই বীর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ধর্ম্মবলই বীর্য্যবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম্মবীরই রণবীর অপেক্ষা প্রসংশনীয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দেহরক্ষা (প্রথম ভাগ) শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস প্রণীত, পি এম দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বেদান্ত প্রেস কলিকাতা।

আমরা এ পুস্তক খানি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম, ইহাতে কতক গুলি পীড়ার হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি এবং বৈদ্যক-শাস্ত্র মতে চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। পাঠ করিলেই প্রতীতি জন্মে যে গ্রন্থকার অনেক যত্ন, অধ্যবসায়, ও আয়াস সহকারে সে গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তক খানি সাধারণে সমাদৃত হইলে আমরা আহ্লাদিত হইব। যে সকল পল্লীগ্রামে সচরাচর ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না, তথাকার অধিবাসীর পক্ষে পুস্তক খানি বিশেষ আবশ্যকীয়।

স্বভাবসতী শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ব্যাসযন্ত্র, চন্দননগর। পুস্তক খানির আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় ইহার জন্ম স্থান বটতলা, কিন্তু ভিতর দেখিলে মনটা অনেক ঠাণ্ডা হয়। আজি কালি পুস্তক সমালোচনা এক মহদায় হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচনা করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপযুক্ত পুস্তক যে কয়েক

খানি বাহির হইয়া গিয়াছে তাহার পর ত সে রূপ পুস্তক বড় একটা নজরে পড়ে না। আজি কালিকার মুদ্রা যন্ত্রে প্রচারিত অধিকাংশ পুস্তকই অপাঠ্য। তবে মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পাঠ করিলে সময়ের অপব্যয় বিবেচনা হয় না। বাঙ্গালায় কালিদাস নাই, সেক্‌সপিয়ার নাই। সকল বিষয়েরই ক্রমোন্নতি আছে, ক্রমে যে বঙ্গে সেকসপিয়ার ও কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় নাটক রচয়িতার আবির্ভাব হইবে না একথাই বা কেমন করিয়া বলিব।

স্বভাব সতী চিরপ্রসিদ্ধ পুরাতন সাবিত্রী সত্যবানের কথা। পুরাতন হইলেও ইহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনায় আপন চিন্তা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। করুণ রসাত্মক নাটকে যে রূপ করুণ রসের প্রয়োজন, ইহাতে তাহার অপ্রাচুর্য্য নাই। দুই এক স্থানে হাস্য রসেরও বেশ অবতারণা আছে। গীত গুলি সমস্তই সুশ্রাব্য এবং চিত্তাকর্ষক। প্রাণবল্লভবাবু গীত রচনায় যে বিশেষ পটু তাহা আমরা পূর্ব্বাবধি জানি। দুই এক স্থলে ভাবার অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ না থাকিলে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

শূন্য পিঞ্জর।

"O mighty Cæsar! dost thou lie so low?
Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils,
Shrunk to this little measure? Fare thee well."

Shakspere

আমার মতের সহিত সাধারণের মত বড় মিলিবে না। একটা কথা আছে "দশজনের সহিত যাহার মতের ঐক্য না থাকে, সেই পাগল" সে হিসাবে আমিও পাগল, তাহা না হইলে কখন মনের চিন্তা প্রকাশ করিতে পারি?—বৈকালে যখন সূর্য্যাস্তের সময় হয়, মৃদু মন্দ সমীরণ গাছের পাতা দুলাইয়া ললিত লতিকা চুম্বনে বিলাসী বাবুর মত হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে থাকে, জ্যোৎস্নাবতী যামিনীতে যখন রজত কিরণে বৃক্ষবল্লী, গ্রাম, প্রান্তর, নদী, তড়াগ, গিরি, গহ্বর উজ্জ্বল করিয়া সুধাংশু আকাশে বাহার মারিতে থাকে, আবার সেই সিত-রশ্মি যখন তাম্র বর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশের উৎসঙ্গে অঙ্গ লুকায়, মলয়জ মৃদুগমনে আবার যখন কুসুমরত্ন চুরী করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে সেখানে ছুটা ছুটী করিয়া লুকাইয়া বেড়ায়, পাখী গুলি গাছের ডালে বসিয়া সুর মিলাইয়া মনের যত্নে, মধুর স্বরে প্রভাতী গাইয়া পৃথিবীকে জাগ্রত করে, সেই সেই সময়ে আমার বেড়াইতে বড় সাধ যায়। আমার হাজার কাজ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখানে সেখানে, মাঠের ধারে, নদীর তীরে, বেড়াইয়া বেড়াই। এমন সময় আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না,— কি করিব আমার মন সেই দিকেই যায়।

এক দিন বৈশাখ মাসের বৈকালে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে মৃদু-মধুর মলয় মারুত বহিতে ছিল, সমস্ত দিনের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাসে পাখী সকল অশ্বত্থের নবপল্লবিত শাখায় বসিয়া গান গাইতেছিল, মৃদু বাতাসে দামোদর খেলা করিতেছিল। এমন সময় আমি নদীর ধারে

বেড়াইতে গেলাম—দেখিলাম নদীসৈকতে বালুকা শয্যায় একটী মনুষ্য দেহ পতিত, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, নেত্র মুদিত, মুখশ্রী বিবর্ণ, প্রতিভা-শূন্য;—শরীর শীর্ণ অধর ওষ্ঠে মক্ষিকাপংক্তি একটী উড়িতেছে, একটী বসিতেছে, মনুষ্য তাহাতে বিরক্ত নহে—দেখিয়াই জানিলাম এটী শূন্য পিঞ্জর—এপিঞ্জরে পাখী নাই—পলায়ন করিয়াছে। পাখী না থাকিলে কে পিঞ্জরের যত্ন করে? তাই আজি একপ ভাবে এস্থানে পতিত। যখন এই পিঞ্জরে পাখী ছিল, যখন সে মিষ্ট সুরে আপন গলাবাজি দেখাইয়া মধুর গীত গাইত, হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তখন ইহাকে ভাল বাসিবার অনেক লোক ছিল, তখন অনেকে পাখীর প্রিয় হইয়া মধুর গান শুনিবার জন্য নর্ত্তন কুর্দ্দন দেখিবার জন্য, তাহাব পিঞ্জরের যত্ন করিত, নিকটে আসিত, রসনা সুখদ বিবিধ সুভোজ্য দ্রব্য আনিয়া পাখীকে খাইতে দিত, ধীরে ধীরে তাহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিত, পাখীর গীত শুনিবার জন্য শীশ চুমকুড়ি দিত, সেই শীশ চুমকুড়িতে মুগ্ধ হইয়া পাখী গাইত—শ্রোতা সন্তুষ্ট হইত, যখন আবশ্যক হইত মিষ্ট খাবার লইয়া আবার পাখীর কাছে আসিত, গান শুনিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়া আবার চলিয়া যাইত, কখন কখন পাখী মনের গুমরে গাইত না—চুপ করিয়া থাকিত, তখন লোকে তাহাকে গর্ব্বিত বলিয়া চলিয়া যাইত—মনেব মতন লোক পাইলেই পাখী গাইত। তখন তখন পাখীর কত যত্ন ছিল! এখন পাখী নাই, পিঞ্জরের কাছে সে প্রত্যাশাও নাই, কেন তাহাব যত্ন থাকিবে? জগৎ স্বার্থ-পর, ঘোর কৃতঘ্ন—স্বার্থ ভিন্ন জগতের কেহই চলে না।

বনের পাখী পিঞ্জরে থাকিতে ভালবাসে না, সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে শূন্য পথে স্বাধীন ভাবে উড়িয়া বেড়ায়, বনে বসিয়া বনের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে, নির্ম্মল নির্ঝর বারি পান করে, মনের সুখে কাল কাটায়। আমরা বন হইতে যে পাখী ধরিয়া আনি, তাহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখি, যত্ন করিয়া পুষি, তাহাব সহিত এ পাখীর অনেক প্রভেদ। বনের পাখী পিঞ্জরে অনেক দিন থাকিলে, প্রতিপালকের মুখমিষ্টতা পাইলে তবে পোষ মানে—এ পাখীর তা নয়, ধরা পড়িলেই পিঞ্জরে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিলেই পোষ মানে, আর স্বেচ্ছায় বাহির হয় না। পিঞ্জরের মায়ায় ভুলিয়া গিয়া থাকিয়া

যায়। পিঞ্জরে প্রবেশ করিলে পিঞ্জরের প্রতি ইহার এত মমতা, এত যত্ন জন্মে যে, ছাড়িয়া বাহির হইতে কষ্ট বোধ করে। এ তাহার অতি সাধের অতি যত্নের, অতি সৌখিন খাঁচা। এ খাঁচা একটু খারাপ হইলেই পাখী মর্ম্মান্তিক যাতনা বোধ করে, যতক্ষণ খাঁচা সারিয়া না লয় ততক্ষণ সুখী হইতে পারে না। পিঞ্জরের সুখে ভুলিয়া পিঞ্জরের গুণে মুগ্ধ হইয়াই পাখী পিঞ্জর ছাড়িতে চায় না, তথাপি জাতীয় শিকলীকাটাদোষে একবার পিঞ্জর হইতে বাহির হইলে আর কখন ফিরে না। বনের পাখী শিকল কাটিয়া একবার উড়িলে, প্রতিপালক যত্ন করিয়া ডাকিলে, মিষ্ট খাবার দেখাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়ে বসিতে পারে। কিন্তু এ পাখী একবার পলাইলে আর সে আশা থাকে না, পাখীর যে পিঞ্জরের প্রতি এত মমতা, সে পাখীর গুণে নয়, পিঞ্জরের গুণে। পিঞ্জরের মোহিনীশক্তিতে পাখী পিঞ্জর ছাড়িতে পারে না। তবে যখন পিঞ্জর একবারে ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সারিবার উপায় থাকে না, তখন পাখী অগত্যা পলায়ন করে। পাখী চেষ্টা করিয়া কখন উড়িয়া পলায় না, তাহা হইলে পিঞ্জরের নয়টা দ্বার খোলা, মনে করিলে যখন ইচ্ছা অনায়াসেই পলাইতে পারে। অতি কষ্ট, অতি মনোদুঃখ না পাইলে পাখী এরূপ আত্মবঞ্চনা করে না!

এই যে পিঞ্জর, এটী ভগ্ন পিঞ্জর! ইহাতে পাখী নাই—যখন পাখী ছিল, তখন ইহার কত বাহার! আজি সে বাহার কোথায়? এই পিঞ্জরে থাকিয়া মধুর বসন্তে, মলয় মারুতে, কুসুমসৌরভে বিভোর হইয়া পাখী মনের সুখে আশা মিটাইয়া কত সাধের গীত গাইয়াছে—নির্ম্মল শশি-কিরণে নাচিয়া খেলিয়া কত স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইয়াছে। নিদারুণ নৈদাঘ রৌদ্রে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে! প্রবল ঝটিকা তাড়নে কতবার পিঞ্জর লইয়া সামাল সামাল পড়িয়াছে—অবিরল প্রবৃট্‌ ধারায় গভীর বজ্রনির্ঘোষে, দৃষ্টিদাহী চপলা চমকে, পাখী কতবার কম্পিতদেহ পিঞ্জর ভঙ্গের চিন্তায় অনশনে কতদিন কটাইয়াছে—অস্থিভেদী দারুণ শৈত্যভয়ে নড়িতে চড়িতে না পারিয়া অতিকষ্টে কতদিন অতিবাহিত করিয়াছে—এত দুঃখ! এত যন্ত্রণা! তথাপি পাখীর পিঞ্জরের মায়া কমে না। এখন পাখী দায়ে পড়িয়া সরিয়া গিয়াছে, পালাইয়া হয়ত আপনার কামবনে আশ্রয়

পাইয়াছে। সেখানে উচ্চ মহীরুহে বসিয়া জগদ্দুর্লভ স্বাদু অমৃতময় ফল ভক্ষণ করিয়া চিরবিরাজী অক্ষয় সুধাংশুর পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতে পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে। এপিঞ্জরের কথা সকলই ভুলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে কেন? বনের পাখী কর্ম্মফলে লোকালয়ে আসিয়া যত দিন পোষা রহিল তাহাই ঢের। লোকালয়ের প্রতি স্নেহ, পিঞ্জরের প্রতি মায়া, ছেদ করিয়া যদি একবার উড়িতে পারিল, যে বনের পাখী সে বন যদি পাইল, তবে আর কি সে ফিরিতে চায়?

এই পিঞ্জরে থাকিয়া পাখী যত সুখ, যত দুঃখ ভোগ করিয়াছে আমার পাখীও সেই দুঃখ সেই সুখ ভোগ করিতেছে, এই ভগ্ন পিঞ্জরের পাখী যাহা করিয়াছে আমার পাখী তাহাই করিতেছে, এখন এই পিঞ্জরের যে দশা হইয়াছে আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক,আমারও পিঞ্জরের সেই দশা হইবে। আমি জানি না কোন দিন আমার সাধের খাঁচা ভাঙ্গিবে, কোন দিন আমার পাখী উড়িয়া পলাইবে, খাঁচার পানে ফিরিয়া চাহিবে না। এ দেহ পিঞ্জর ভঙ্গুর, জগতে কোন জিনিষই চিরস্থায়ী নহে। পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, সাগর শুকাইয়া যায়, তবে এ ভঙ্গপ্রবণ ক্ষীণ শলাকা-সূত্রগ্রথিত পিঞ্জরের আশা কি? যখনই কোন গুরুতর ধাক্কা লাগিবে, তখনই ভাঙ্গিবে; কোন মতে রাখিতে পারিব না। যাহারা এখন আমার পাখীকে লইয়া নাচাইতেছে, খেলাইতেছে, অতি আদর, অতি যত্ন করিতেছে, আমার পিঞ্জর ভাঙ্গিলে, আমার পাখী পলায়ন করিলে, তাহারা আমার ভগ্ন পিঞ্জর স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করিবে। আমার পাখী একা আসিয়াছে একা যাইবে—কোন্ বনে যাইবে জানি না—তাহার স্থির নাই। সেখানে গিয়া বসন্তের সহচর কোকিলের দলে মিশিবে, বা শ্যামা, পাপিয়া, দয়েল, "বৌকথাকও" ইহাদিগেরই সঙ্গী হইবে? কি কাদা খোঁচা বায়স ছাতারুর দলে প্রবিষ্ট হইবে, কিছুই বলিতে পারি না। এ পিঞ্জরের পাখী উচ্চ দরের—ইহাকে যে বোল বলাইবে, সেই রূপ বোল শিখিবে—অবিকল সেইরূপ বলিবে। পাখী হিন্দু স্থানীর কাছে থাকিয়া "রাধাকৃষ্ণ জি কি জয়!" জাহাজের কাপ্তেনের কাছে থাকিয়া কেবল মাত্র "Back her easier" বৈষ্ণবের কাছে থাকিয়া "হরেকৃষ্ণ" শাক্তের কাছে থাকিয়া

"কালী কল্পতরু" এবং বেশ্যালয়ে থাকিয়া অশ্লীল গীত শিক্ষা করে। এখানে যে বুলি অভ্যাস করে, বনে গিয়াও সে বুলি ভুলিতে পারে না। এখানকার ফলাফল পাখীকে সেখানে ভোগ করিতে হয়। তবে আর টপ্পা গাইতে শিখাইয়া পাখীর পরকাল নষ্ট করি কেন? এখান হইতে কুবোল ছাড়াইয়া সুবোল শিক্ষা করাই। মন খুলিয়া ষড়জ হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত তুলিয়া রিভুগান পড়াইতে থাকি! পক্ষীজাতি যা শুনে তাই শিখে। ভ্রমেও আর কুবোল মুখে আনিতে দিব না, সুবোল শিখাইব, তাহা হইলেই পক্ষী জন্ম সার্থক হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সরস্বতীর প্রতি।

১

শ্বেত পদ্মে বিনা করে,
কেমা তুমি বসে বল,
পুঁথি গুলি লয়ে হাতে,
হাসি মুখে অবিরল?

২

আলুলিত কেশদাম,
বদনেতে পড়্ছে ঢোলে,
ভ্রমর গুল কমল ভ্রমে,
কমল মুখে বাসা নিলে!

৩

চিনেছি মা আমি তোরে,
তুমি গো মা বীণাপানি,
বলি তবে পদে ধরে,
শোন্‌গো দুটো দুখের বাণি।

৪

বাপ মায়েতে ছেলে বেলা,
বল্‌তো তোরে খুঁজে নিতে,
খুঁজেছি মা কত ক'রে,
বলি শোন্‌মা এই বেলাতে।

৫

পাঠশালাতে বেতের চোটে,
পিট হয়েছে ফড়া ছেঁড়া,
তবু কি ছাই মনের মত,
হ'ল মা গো লেখা পড়া।

৬

পাড়ে পাড়ে এণ্ট্রান্স্, এল'এ,
এম এ, বি এল, ছিল যত,
সব্‌ই হ'ল পাশ্ ওপাশ্ মা,
বুদ্ধি কিন্তু বল্‌ব কত।

৭

একটা কিছু লিখ্‌তে হ'লে,
হাত্‌ড়ে মরি হেথা হোথা,
কইতে হ'লে একটা কথা,
সর্ব্বদেশে মাথা ব্যথা।

৮

কেঁপে মরি থর্ থরিয়ে,
পাশের মাথায় পড়ুক বাজ,
বিদ্বান বলে লোকে বটে মা,
কিন্তু সবই ফক্কি কাজ।

৯

বাপের ভিটেয় চর্‌ল ঘুঘু,
লেখা পড়ার খরচা দিতে,

এখন গুণনিধি গোবরগনেশ,
ছন্দ নাকাল এক ডিগ্রিতে।

১০

চাকরির বাজার বিষম আগুন,
চায়না কেউ গো চক্ষু তুলে,
বিশ পঁচিশ চাকরি চাইলে,
আমায় দেয়মা ছুড়ে ফেলে।

১১

বিদ্যার গুমর একদিন গেছে,
আস্‌বে না আর ফিরে সেটা,
রোজ হ'লে ত ফেটে যেত,
সফল হ'ত পাশ্ করাটা।

১২

বাবার গুমর দেখে কেমা,
বিয়ের বেলা, আমার যত,
সোণার গাড়ু সোণার থালা,
চেয়ে বস্‌লেন গণ্ডা কত।

১৩

(এখন) গিন্নির জ্বালায় কণ্ঠশ্বাস মা,
বুঝি আমার হয়ে এল,
দেহি দেহি কেবল টাকা,
টাকা কোথা পাই মা বল!

১৪

নামের শেষে এম এ, বিএল,
টাইটেল বটে জবর হ'ল,
টাইটেলেতে চলেনা মা,
ভেবেই প্রাণটা সারা হ'ল।

১৫

লক্ষ্মীর সঙ্গে আপষ্‌টা মা,
এই বেলাতে করে ফেল,
ভিক্টোরির দোহাই দিয়ে তার মা;
ধরি দুটো পদতল।

১৬

কথা কিন্তু কবনা মা,
বিদ্যা যদি বেরিয়ে পড়ে,
চক্ষের জলে আগা গোড়া
সারব—কথায় কিবা করে?

১৭

দুঃখের কথা বল্‌ব কত,
হাইকোর্টেতে উকিলগিরি,
ধোবার খরচ জোটেনা মা,
তবু করি জারি জুরি।

১৮

হাকিম গুলো খিচিয়ে উঠে,
চোকুট বুঝে পড়ে থাকি,
এম এ, বিএল সবই হনু—
(হাঁ মা) তবু দিলি এত ফাঁকি?

বিজয় সিংহ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

অমিলার শেষদশা।

সায়ংকাল, সান্ধ্য সমীরণ সঞ্চালিত প্রসূনরাজি মাথা নাড়িয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, সরসীতে হাসিমুখে কুমুদিনী বিকশিতা হইতেছে আবার কমলিনী বিষন্ন বদনে চক্ষু নিমিলিত করিতেছে! এ সংসারের নিয়মই এই,—আজি তুমি হাসলে, কিন্তু নিয়তির কালচক্রে পতিত হইয়া কল্য তোমায় হয় ত কাঁদিতে হইবে। হাসি কান্নাবিমিশ্রিত সংসারের বিকটবদন দেখিয়া ভীত বা আনন্দিত হইও না, ইহা কখন যে কাহার উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সংসার, তোমার মায়া ধন্য! তুমি মনুষ্যকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান কর, কিন্তু মানব তোমার মোহিনীবলে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই ধন্য যে তোমার কুহকমন্ত্রকে তৃণ জ্ঞান করে, কিন্তু সংসারে সে রূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা বড় কম।

সরমা এই মানব-মনমুগ্ধকারী সন্ধ্যাকালে একটী ঘনতৃণাবলীপরিশোভিত ভূমিখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিশোভাবিমোহিত প্রাণে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল। দেখিল—আকাশ নীলাভ, কোথাও নীরদখণ্ড আকাশের গায় মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও ঘন শ্যামবর্ণেও আকাশের স্থান বিশেষের নীলিমা অপহরণ করিয়া চাঁদের দিকে ছুটিতেছে, না, না, চাঁদ বুঝি সেই দিক ছুটিতেছে, আবার কাদম্বিনী শুধাংশুকে গ্রাস করিল, আবার চাঁদ তাহার পেট চিরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেঘ ছুটিল, চাঁদ হাসিয়া উঠিল, সে হাসি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আচ্ছাদিত করিল। প্রকৃতি হাসিল, দেখিল সেই অপূর্ব্ব চন্দ্রালোকে বড় বড় মহীরুহগণ মাথা নাড়িয়া বাহু প্রসারিয়া ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে, ছোট ছোট তরুগণের অঙ্গ শিহরিতেছে।

বাস্তবিক সংসারেও এই নিয়ম বটে, যাহারা সংসারের বড় বৃক্ষ, তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, কিন্তু যাহারা ছোটগাছ, তাহারাই কেবল অঙ্গ শিহরিয়া মরে। লতিকারাজি প্রায়শঃ সরলা, তাহারা কাহার ধার ধারেনা, তাহার আনন্দে আপনি মত্ত, আপনার মনে আপনি নাচিতেছে, ছুটিতেছে, কৌমুদী ধরিয়া বুকে পুরিতেছে। সরমা প্রকৃতির এই সমস্ত মধুরিমা অবলোকন করিতেছে, এমন সময়ে তথায় একটি অসামান্যা রূপবতী রমণী আসিয়া কহিল " চিনিতে পার কি ?"

সরমা চমকিয়া উঠিয়া কহিল "বাদসাহ পুত্রি, তুমি এখানে ?

অমিলা। কেন সরমা, আমার কি এখানে আসিতে নাই ?

সরমা। এখানে কি প্রকারে আসিলে ?

অমিলা। তুমি আসিলে তোমার পশ্চাতেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম।

সরমা। এত দিন কোথায় ছিলে ?

অমিলা। অরণ্যমধ্যে।

সরমা। কই তোমাকে ত দেখি নাই।

অমিলা। তুমি আমায় দেখ নাই, কিন্তু আমি তোমায় দেখিয়াছি।

সরমা। প্রিয় সখি! তোমায় দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম, তোমার ন্যায় রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, কিন্তু বিধাতা তোমার কপালে সুখ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

অমিলা। সে কি সরমা, আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে ?. যে রমণী দেবতুল্য বিজয় সিংহে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তাহার তুল্য ভাগ্যবতী আবার কে আছে ? সরমা আমি বিজয়সিংহকে দেখিলে যত সুখী, তত সুখী আর কিছুতেই হইনা, বিজয় সিংহের মুখে হাসি দেখিলে আমার মনে সুখ ধরেনা, আমি যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করি। আমার প্রাণেশ্বর বিজয় কমলাদেবীর মিলনে বড় সুখী, আমার বিজয় কমলাকে বড় ভালবাসেন, সুতরাং তিনি কমলাকে ভাল বাসিলেই আমার সুখ, সখি! তিনি আমায় ভাল বাসিলেন না বলিয়া কি আমি আমাকে হতভাগিনী বলিয়া বিবেচনা করিব। আমি যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার হাসি দেখিয়া যদি আমি হাসিতে না পারি, তবে আবার তাহা ভালবাসা কি ? মনে করিয়াছিলাম বিজয়সিংহের বিবাহ

পর্য্যন্ত দেখিব, কিন্তু বড় ভয় হইয়াছে, পাছে বিজয় বিবাহে সম্পূর্ণ সুখী হইতে না পারেন, সুতরাং আর আমি তাঁহার বিচিত্র প্রণয়ের হন্ত্রী স্বরূপ সংসারে থাকিব না, ঈশ্বর বিজয়কে সর্ব্বতোভাবে সুখী করুন। ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে কমলা যেন আমার বিজয়ের মন দিন দিন অধিক বিমোহিত করিতে পারে। সরমা! তুমি আমার প্রাণ-সখী, তোমায় বড় ভালবাসি, তাই এতকথা বলিলাম, নতুবা তাহা কাহাকেও বলিতাম না। তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি যে, একথা যেন আর কেহ শুনে না,—এখন আসি, আমায় বিদায় দাও।"

অমিলা যখন এই সমস্ত কথা কহিতেছিল, তখন সরমা কাঁদিতেছিল, অমিলা সরমার নয়ন মুছাইয়া কহিল "সখি তুমি কাঁদিতেছ? আজি আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি কাহার চক্ষে জল দেখিতে পারিব না। আমি বিজয়ের মুখে হাসি দেখিয়াছি, সরমা তাহা অপেক্ষা সুখ অমিলা জানে না।

সরমা। সখি অমিলা, তুমি মরিবে?

অমিলা। মৃত্যু বই রমণী অধিক সুখী আর কিসে হইবে?

অমিলা এই কথা কহিতে কহিতে বাম হস্তের অঙ্গুলিতে একটী অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা চুম্বন করিতে লাগিল। নিমেষমধ্যে সেই গরলাধার অঙ্গুরীয়কের ক্ষমতা অমিলার সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইল। অমিলার মস্তক ঢলিয়া পড়িল। সরমা তাহার জানুপরে অমিলার মস্তক সংরক্ষিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "সখি কি করিলে?"

অমিলা। কি করিব সখি! আমার সুখকে অনন্ত বন্ধনে বদ্ধ করিলাম।

সরমা কাঁদিতে লাগিল, অমিলা তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল "প্রাণ সখি! তুমি কাঁদিও না, আমার এত সাধের এত সুখের মরণ দেখিয়া একবার হাসিতে পারিলে না? সখি সরমা, একবার হাস, সে হাসি দেখিয়া আমার যে সুখ তোমার অজস্র ক্রন্দনে তাহার বিন্দুমাত্রও সুখ নাই।"

সরমা তখনও কোন কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন অমিলা কহিল "সরমা! আমার সময় অতি নিকট, আর অধিকক্ষণ তোমার সহিত এভাবে কথা কহিতে পারিব না। মৃত্যুকালে আর কি

বলিব, একটী কথা বলি তাহা শুন।—সরমা! আমার এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, সর্ব্বদা ইহা তোমার অঙ্গুলতে ধারণ করিও।”

এই বলিয়া সরমার অঙ্গুলে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। সরমা কহিল “এ অঙ্গুরীয় লইয়া কি করিব?”

অমলা কহিল “কি করিবে? ইহা অপেক্ষা আর অবলা রমণীর সহায় কে আছে? দেখ সরমা, আর এক কথা বলি. আমি বিজয় সিংহকে পাইলাম না বলিয়া মরিলাম. তাহা নহে। বিজয়কে সুখী করিতে মরিলাম। কমলা আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা, সুতরাং বিজয় দেবতাদুর্ল্লভ পত্নী পাইয়াছে, তাহাতে আমার বড় সুখ। আর এক কথা, আমরা ক্ষীণবুদ্ধি, দুর্ব্বলহৃদয়, অবলা মাত্র, কি জানি যদি হৃদয়ের কখন পরিবর্ত্তন হয়, তখন হয়ত মরিব, কিন্তু এত সুখ ত পাইব না, তাই এত শীঘ্র মরিলাম। নতুবা আর কিছু দিন বাঁচিয়া বিজয়ের আরও সুখ দেখিতাম। কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই, কারণ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যে কমলাসহবাসে বিজয় দিন দিন সুখী হইবে।

সরমা কোন কথাই কহিল না। দেখিতে দেখিতে অমিলার চক্ষু স্পন্দহীন হইয়া আসিল, তখনও নিবিড় জলদমালায় ক্ষণিক দামিনী বিকাশের ন্যায় অমিলার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি প্রতিভাত হইতেছে। ক্রমে শরীর শীতল হইয়া আসিল, হৃদয় বিকল হইল, চক্ষু স্থির হইল, অমিলা প্রাণত্যাগ করিল, মৃত্যুকালে সরমার দিকে স্থিরদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, বোধ হইল যেন কি বলিবে, কিন্তু তখন কণ্ঠরোধপ্রায়, জড়িত স্বরে একবার মাত্র বলিল “বিজয় সিংহ।”

অমিলা প্রাণত্যাগ করিলে সরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “অমিলা! তুমিই প্রকৃত ভাগ্যবতী, তুমি যথার্থই রমণীকুলের রত্নভূষণ, ঈশ্বর করুন আমিও যেন তোমার ন্যায় হাসি মুখে মরিতে পারি। যে রমণী তোমার ন্যায় মরিতে পারে সেই সুখী।” অমিলার মৃতদেহ ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিল “প্রিয়সখী অমিলা, আজি তোমার সংকার আমি স্বয়ং করিয়া জীবন সার্থক করিব। এই সুন্দর স্থানে আমি স্বহস্তে তোমার কবর দিব।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সবমাব দশা।

সরমা অমিলার মৃত দেহ একটী পরিষ্কার স্থানে রাখিয়া মৃত্তিকা খননোপযোগী অস্ত্র আনিবার জন্য অন্যত্র গমন করিল। সরমা কতকদূর যাইবামাত্র উদয় সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয় সিংহ অমিলাকে দেখিয়া একবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, প্রথমে বোধ হইল যে, অমিলা বুঝি নিদ্রা যাইতেছে, পরে দেখিলেন, তাহা নয়, অমিলা দেহ ত্যাগ করিয়াছে। উদয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া উদয় সিংহ অমিলার মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন "অমিলা, আমি এত দিন যে তরুমূলে আশাবারি সিঞ্চন করিতেছিলাম তাহা বুঝি আজি ফুরাইল। অমিলা, প্রাণেশ্বরি, তুমি কেন আমায় এ অবস্থায় দেখা দিলে, তোমায় ত পাইবার কোন আশা ছিল না, তথাপি তোমায় পাইবার আশার আশায় কত সুখে ছিলাম, কিন্তু আজি আমার সে সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল, আজি তোমা বিহনে আমি জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছি।"—উদয় সিংহ কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরেই সরমা একটী খননোপযোগী অস্ত্রহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। উদয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সরমা তুমি এখানে?"

সরমা। অমিলার সমাধি করিতে আসিয়াছি।

উদয়। এ কার্য্য কে করিল?

সরমা। অমিলা আপনি করিয়াছে।

এই বলিয়া অমিলা সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করিল। উদয় সিংহ স্থির চিত্তে সে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, কহিলেন "বিজয় তুমি ভাগ্যধর, এ দেবীতুল্য রমণী যাহার প্রনয়কাঙ্ক্ষিণী সে মনুষ্য নয়, দেবতা। কিন্তু আমি পিশাচ, আমি নরকের উপযুক্ত, আমার কপালে সে সুখ ঘটিবে কেন? আমি যে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ

করিব, সরমা! তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কেন? নরকযন্ত্রণা আবার কি? সরমা এই দেখ, এই বক্ষমধ্যে দেখ নরকাগ্নি প্রধূসিত হইয়াছে। নিরন্তর তাহাতে অগ্নি উদ্গম হইতেছে।"

সরমা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, চক্ষে জল আসিল, মনে মনে বলিল "বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, আমি যে শৈশবাবধি উদয় সিংহকে কায়মনোবাক্যে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আজি আমার সে আশালতা উন্মূলিত হইল! আমি যে উদয় সিংহের জন্য কত ক্লেশ, কত যাতনা সহ্য করিয়াছি, সে উদয় সিংহ আমার হইবে না? আমার সকল আশা সকল যত্ন ব্যর্থ হইল?" আবার কি ভাবিয়া বলিল 'অমিলাত নাই, এখন ত উদয়ের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।" উদয় সিংহকে বলিল "আপনি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়া কি রূপে যবনকন্যার পাণিগ্রহণ-লালসা করিয়াছিলেন?"

উদয়। সরমে! যখন অমিলা বিজয় সিংহের গৃহে ছিল, তখন ত ইহাকে যবনী বলিয়া কেহ জানিত না। অশুভক্ষণে—না না শুভক্ষণে আমি একদিন মাত্র তাহাকে দেখি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার হৃদয়ে অমিলার রূপ গাঢ়তর অঙ্কিত হয়। পরে কারাগারে জানিলাম যে অমিলা যবনী, মনকে তখন তাহার আশা ত্যাগ করিতে বলিলাম, কিন্তু মন ত তাহা শুনিল না। অমিলা যে আমার হইবে না তাহা জানিতাম, কিন্তু আশা ত ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজি আমার এতদিনের সযত্নপালিত আশালতা দলিত হইল?

সরমা। যাহা হইয়াছে তাহার উপায় কি, এখন হইতে তাহাকে বিস্মৃত হউন।

উদয়। সরমা! অমিলার সে মূর্ত্তি কি হৃদয় হইতে কখন অপসৃত হইবে? যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তাহাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

সরমা। ইহাকি সম্ভব?

উদয়। সরমে, আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এতদিন যেমন অমিলার মূর্ত্তি হৃদয়ে আরাধনা করিতাম, যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল সেই মূর্ত্তি হৃদয়পটে সযত্নে চিত্রিত করিয়া অর্চ্চনা করিব।

সরমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, মনে মনে বলিল "চেষ্টা করিলে উদয় সিংহের শপথ ভঙ্গ করা যায় না?" আবার কি ভাবিয়া বলিল "ছি ছি, আমি যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহার শপথভঙ্গের চেষ্টা করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিব? এ কি সরমার কার্য্য! কিছু না পারি, মরিতেও কি পারিব না! ছি! ছি! একথা কি প্রকাশ করিতে আছে, এ পর্য্যন্ত সরমার হৃদয় হইতে প্রকাশ পায় নাই, এই নিরাশ্বাসের সময় কি তাহা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইব? উদয় সিংহ মনে করিবেন কি?" সরমা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল "মহারাজ আসুন অমিলার সৎকার করি?"

উদয় সিংহ মৃত্তিকা খনন করিলেন, তৎপরে উভয়ে সেই মৃত দেহ লইয়া তাহাতে রক্ষিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা বেষ্টিত করিলেন। উদয়ের অসংখ্য অশ্রুরাশি তাহাতে নিপতিত হইতে লাগিল।

সমাধি সমাপ্ত হইলে সরমা কহিল "তবে চলুন আমরা যাই?"

উদয় সিংহ বলিলেন "সরমা, কোথায় যাইব?—অমিলার সমাধি স্থলে থাকিলে যে সুখ, সে সুখ এ ভূমণ্ডলে আর কোথায় পাইব?"

সরমা। তবে কি আপনি অপেক্ষা করিবেন?

উদয়। তুমি যাও, আমি এখন যাইতেছি না।

সরমা তথা হইতে প্রস্থান করিল, হৃদয়ে দারুণ ভার বহন করিয়া সরমা বনের কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। সরমা যাইতেছে, এমত সময় এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎদিক হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল। সরমা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল "যবন!"—কথা কহিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রায় আর পঞ্চদশ ব্যক্তি যবন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

সরমা কহিল "তোমরা কে?"

একজন কহিল "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দাস।"

সরমা। রে দুরাত্মন্!

আর একজন যবন তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল "সুন্দরী চীৎকার করিও না, চীৎকার করিলে তোমার কোমল অঙ্গে ক্লেশ দিতে যবনেরা ভীত হইবে না।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে একজন যবন সরমার বসনাঞ্চল দ্বারা

তাহার মুখ বাঁধিয়া দিল। সরমা আর চীৎকার বা কোন কথা কহিতে পারিল না। সরমার চক্ষুদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, মনে মনে বলিল "হে ভগবান্ ভবানীপতি—এ দুর্ব্বিপাকে অধিনীকে রক্ষা করুন।"

দুইজন যবন সরমাকে স্কন্ধে তুলিল। সরমা যবনস্কন্ধে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

সংসার ও ধর্ম্ম।

এই ভ্রান্তিময় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের কার্য্যকলাপ দর্শনে কে না মুগ্ধ হয়?—দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গের স্বর্গীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি, উত্তাল-তরঙ্গাকুলা কল্লোলিনীর কুল্ কুল্ নাদ, সৌরভ-সমাকুল বিকচ কুসুমপূর্ণ উদ্যানের কমনীয় ভাব, রবিকর-প্রদীপ্তা বিভীষিকাময়ী মরুভূমির প্রচণ্ডতা, চঞ্চলোর্ম্মি-মালা-সমাকুল গভীর নীলাম্বুরাশির সুন্দর তরঙ্গক্রীড়া, শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীর ভীষণতা, সুন্দর হর্ম্ম্য মালা পরিশোভিত বিবিধ বর্ণের, বিবিধ চরিত্রের, বিবিধ প্রকৃতির নাগরিক দলে পরিবেষ্টিত মহানগরীর মনোমোহন রূপ—যেখানে, যে কোন অবস্থাতে, যেরূপ দেখ, সকল বস্তুতেই যেন কি অলৌকিক মধুরিমা, কি অনৈসর্গিক কার্য্য-নিপুণতা জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়। কোথাও ধনীর মদগর্ব্বিত পাদবিক্ষেপ, গভীর অহঙ্কার-পূর্ণ হুহুঙ্কার, আশ্রিত জনের প্রতি অত্যাচার—কোথাও বা দরিদ্রের তৃণাধিক লঘুভাব, দীননেত্রে সঙ্কুচিত হৃদয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, জীবনের প্রতি ঔদাস্য; কোথাও পঙ্গপাল সম সন্তানগণের উদরান্নের জন্য বৃদ্ধ লালায়িত—কোথাও বা ধন-জন-পরিবেষ্টিত প্রৌঢ় তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী করিবার নিমিত্ত অসময়েও একটীমাত্র পুত্রের জন্য কাতর, কোথাও রূপবান্ যুবক নিজ মকর-কেতনবিনিন্দিত রূপচ্ছটার পূর্ণবিকাশে গর্ব্বিত, বক্র-গ্রীব হইয়া কোন সম্মোহিনী কুলকামিনীর প্রতি কটাক্ষ-পাতনিরত—কোথাও বা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধ চরম দশাতেও দারুণ কুষ্ঠ ব্যাধির যন্ত্রণায় অধীর, সাধারণ

জনগণের স্বভাই; কোথাও তপঃনিরত ঋষি সকল ঋতুতে সমভাবে অসূয়া শূন্য হইয়া একান্তঃকরণে যোগ সমাধানে মগ্ন—কোথাও বা যৌবন-মদান্ধ যুবক বঙ্কিমাভা সুরাদেবীর তরঙ্গলীলায় মুগ্ধ, কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পর স্ত্রী হরণে উদ্যুক্ত, পরিশেষে অর্থাভাবে চৌর্য্যবৃত্তিতেও অকুণ্ঠিত, বাক্‌স্ফূর্ত্তি-বিহীন শিশুর অলঙ্কারাপহরণের নিমিত্ত তাহার প্রাণনাশেও মুক্তহস্ত—এই পঞ্চভৌতিক সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বস্তুতে এইরূপ বৈচিত্র। এই পরিদৃশ্যমান জগতের এই প্রকৃতিগত বৈষম্যদর্শনে কে না বিশ্বাস করিবে যে, ইহার রচয়িতা অলৌকিক ক্ষমতাশালী, অদ্ভুত কৌশল নিপুণ, মনুষ্য বুদ্ধির দুরধিগম্য অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ।—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বক্ষম। তিনিই ইহ জগতের সুখ দুঃখের বিধাতা, পারত্রিক গতি বিধানের নিয়ন্তা, এবং অদ্বিতীয়া প্রকৃতি দেবীর এবম্বিধ রচয়িতা।

চরাচর বিশ্বসংসারের প্রকৃতিগত নিয়ম পালনকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ যথাবিধানে যথাসময়ে উদিত হইয়া আপন আপন ধর্ম্মপালন করিতেছে, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুগণ যথাকালে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতিগত কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে; অত্তুঙ্গ গিরি প্রসূতা নিঝরিণী অবিরামগতিতে নির্ঝরিত হইয়া জগতে কমনীয় কোমলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, কুসুমের সৌরভ, বারির স্নিগ্ধতা, জীবনের জীবন রক্ষিণী ক্ষমতা, চন্দ্রের মধুরিমা, সূর্য্যের প্রচণ্ডতা, অগ্নির উত্তাপ—স্বভাবের প্রত্যেক বস্তুতেই আপন আপন ধর্ম্ম পালন প্রতিনিয়ত লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, স্বয়ং সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও স্বয়ম্ভূত সৃষ্টি স্থিতি নাশাদি কার্য্যত্রয়ের যথানুষ্ঠান দ্বারা নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জগতের জড় অজড় প্রত্যেক পদার্থকে নিজ নিজ ধর্ম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। এই সমস্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে কাহার না বিশ্বাস হয়, যে এই পার্থিব জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেকেরই আপন ধর্ম্মপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন এই সংসারেই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সংসারই ধর্ম্মক্ষেত্র, সংসারের জন্যই ধর্ম্মের উৎপত্তি, সংসারেই ধর্ম্মের পরিপুষ্টি।

যখন যাবতীয় পদার্থই এইরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে,

তখন সৃষ্টির মুখ্য জীব মনুষ্যের যে সেইরূপ ধর্ম্মপালন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সদাসৎ কার্য্যকলাপের বিচার ক্ষমতা মনুষ্যে-রই আছে; সাহিত্য বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, যেখানে দেখিবে, সেই খানেই মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসা, মনুষ্য বুদ্ধির প্রখরতা দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে। নিজ নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। জড় পদার্থের বা জ্ঞান-বিরহিত জীব সমুদয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের ক্ষমতা নাই; সুতরাং ঈশ্বরের অলৌকিক নিয়মগুণে তাহাদিগের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যের সঙ্গেই পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মনুষ্যকে তিনি এই অসাধারণ ক্ষমতা দান করিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখে ধর্ম্ম ক্ষেত্র সংসার বিস্তৃত রাখিয়াছেন, এবং প্রত্যেকে আপন আপন ধর্ম্মপালন করিতেছে কি না, প্রতিনিয়ত তীব্রনেত্রে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। মনুষ্য অজ্ঞানান্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া ইহা বুঝিয়াও বুঝে না, দেখিয়াও দেখে না, ধর্ম্মপালনের সময় পাইয়া, ক্ষেত্র পাইয়া, তাহা রক্ষা করে না। আহার বিহারের দ্বারা নিজের এবং নিজ পরিবারস্থ পরিজনবর্গের আনন্দবিধানকেই কি মনুষ্যের ধর্ম্ম বলিব?—সেরূপ পাশবপ্রবৃত্তি ত ইতর পশুরাও চরিতার্থ করিয়া থাকে। তবে আর জ্ঞান বিভূষিত মনুষ্য এবং পুচ্ছ-বিষাণ-যুক্ত পশুতে কি প্রভেদ রহিল?

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু ত্রি-সন্ধ্যা-সমাপন, মুসলমান অহোরাত্রে পঞ্চবার কল্মা পাঠ, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মপ্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতা-ভিমানী ধার্ম্মিকেরা সাপ্তাহিক স্তোত্রপাঠ এবং আরাধনা এইরূপ জাতিভেদ, আচারভেদ, সম্প্রদায় ভেদে নাগরিকগণ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আড়ম্বর-পূর্ণ বাহ্যিক স্তুতিগানে আপন আপন ধর্ম্মপালন সিদ্ধ হওয়া বিষয়ে কৃত বিশ্বাস হন। আবার কেহ বা সামাজিক সংসার পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র-কলত্রের স্নেহ-পাশ কাটিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া, নিবীড় অরণ্যে অথবা পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় বাস করিয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। আমরা এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই যুক্তি বিরুদ্ধ বিবেচনা করি। প্রথম বর্ণিত মনুষ্যবর্গ কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে ধর্ম্মানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে সাধুজন বিগর্হিত পথে পাদচারণ করেন; (সকলের কথা বলিতেছি

না) তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় কলুষপূর্ণ কৌটিল্যে জড়িত। দ্বিতীয় গুলি জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া, ধর্ম্মপথে বিচরণ করা দূরে থাকুক, প্রকারান্তরে অধর্ম্মকেই আশ্রয় করেন। ঈশ্বরের প্রতি-দিনের, প্রতিক্ষণের, প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপ দর্শনে কে না বিশ্বাস করিবে, যে সৃষ্টি-বৃদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; গবর্ণমেণ্টের বহুব্যয়সিদ্ধ সম্যক নিরূ-পিত সাময়িক লোক সংখ্যার হিসাব দর্শনে অবশ্যই উপলব্ধি হইবে যে ক্রমশঃ মনুষ্যের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না। যদি সকলে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যেই বাস করিবে, তবে কাহাকে লইয়া সংসার চলিবে, কিসেই বা সৃষ্টির বৃদ্ধি হইবে?—তাহা হইলে এই সংসার শীঘ্রই বিজন কানন কিম্বা ভীষণ প্রেত ভূমিরূপে পরিণত হইবে। আমাদিগের বিবেচনায়, এবং বোধ হয় প্রত্যেক সংসার-রহস্য-ভেদী ব্যক্তির বিবেচনায়, এরূপ সংসার বিকার ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং নারায়ণ অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিয়াছেন পাঠ কর, যোগবাশিষ্ঠে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব নারায়ণরূপী রামচন্দ্রকে যোগ সমাধানের কি সূক্ষ্মতত্ত্ব কহিয়াছেন অনুসন্ধান কর, রাজর্ষি জনক পরিজনবেষ্টিত সংসারে থাকিয়া কিরূপ ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে এই সংসারে থাকা চাই, সাংসারিক নিয়মে বদ্ধ থাকা চাই, পুত্রকলত্রের ভরণ পোষণে লব্ধ-যত্ন হওয়া চাই, সমাজ সংস্কারের উপায় নিরূপণ করা চাই, সেই সঙ্গে অচিন্ত্য অমেয় বিশ্ব-নিয়ন্তার বিষয় একান্তঃকরণে চিন্তা করা চাই। এই স্থলে আমাদের একটী হিন্দি গাথার কিয়দংশ স্মরণ হইল, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না——

"য্যায়সে নট্‌নী চড়ত বাঁশ' পর,
তোলিয়া ঢোল বাজাওয়ে,
আপনা ভার সাধ্‌কে নট্‌নী
সুরত বাঁশ' পর লাওয়ে।
য্যায়সে নারী চলে পাণিকো,
পগ আওয়ে পগ যাওয়ে,

সাথ সঙ্গিনী করত কল্লোল,
সুরত গাগর' পর নাওয়ে।"

যেমন বাজিকর ঢোলীর ঢোলবাদ্যের সহিত কার্য্য নিপুণতার দ্বারা দর্শকবৃন্দের মনোবৃত্তি মাতানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভার রক্ষক বংশদণ্ডের প্রতি মনঃসংযোগ করে, যেমন নাগরীগণ নদীগর্ভ হইতে জল আনয়ন কালে পরস্পর সঙ্গিনীগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে তাহাদিগের মস্তকস্থিত (১) কলসী স্থান বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ সংসারাশ্রমী ব্যক্তির সংসার নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক গতি বিধানের উপায়-স্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ম ভাবা চাই।

আমরা তাই বলি, বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ কর, অরণ্যবাসের সংকল্প মন হইতে নির্ম্মূলিত কর; এই সংসারে থাকিয়া হিংসা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ, আশ্রিত জনে দয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, নিপীড়িতের শান্তিবিধান, সংসার সমাজের উন্নতি, সর্ব্বজীবে সমভাব প্রভৃতি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে পরম পিতা পরমেশ্বর প্রদর্শিত পথে গমন কর, আর অবসর পাইলেই একমনে সরল প্রাণে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া তাঁহার বিমলানন্দদায়ী দেবভাবে চিত্ত সমর্পণ কর, তখন বুঝিতে পারিবে যে এই সংসারই নন্দনকানন, অতুল প্রেমনিকেতন, আনন্দোৎসব সম্পন্ন। এই ধর্ম্ম প্রতি[illegible] জন্মনগরে নাই—এ প্রেম বিলাসীর বিলাসভবনে নাই, মদ্যপের অঙ্গনপার্শ্বেও নাই, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে নাই, অজ্ঞাত পর্ব্বতশিখরের নিভৃত প্রদেশে নাই—এই নির্ম্মল স্বর্গীয় প্রেম কেবল ধার্ম্মিকের ধর্ম্মময় হৃদয়-কন্দরেই

(১) আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা হস্তে কলস লইয়া থাকে, মস্তকে লইবার পদ্ধতি নাই। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখা গিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা দোদুল্যমান হস্তে বিনাবলম্বনে দুই তিন বা সময়ে সময়ে ততোধিক কলস মস্তকে লইয়া অবলীলাক্রমে গতায়াত করে। আমাদের দেশে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালে মজুরদিগের চুন সুরকির হাঁড়ি ঐরূপ মস্তকে করিয়া দুরারোহ বংশ সোপান আরোহণ করিতে দেখা যায়।

আছে। কি হিন্দু, কি যবন, কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্ম, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ইহুদী সকলে সমভাবে এই বিমল ধর্ম্মপালন রূপ প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

শ্রীপাঁ।

সমাজ রহস্য।

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ।)

আমরা আদর্শিনীতে "সমাজ-রহস্য" শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, গত ২য় খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা আদর্শিনীতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী চরণ গুপ্ত মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা সাদরে সেই প্রতিবাদ পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যদি প্রতিবাদ করিবার সময় আমাদের মূল উদ্দেশ্য স্মরণ করিতেন, তবে বোধ হয় এজন্য তাঁহাকে আর লেখনী ধারণ করিতে হইত না।

যাহাহউক যখন সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ হইতেছে, তখন তাহার মীমাংসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন, "বিহারী বাবু এ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, একটী ব্যতীত আমরা তাহার সকল গুলিরই অনুমোদন করি।" অতি উত্তম কথা। দেখা যাউক, কোন্‌টিকে তিনি অনুমোদন করেন না। পরাশরের বর্ণিত প্রব্রজিত, যাহার সহিত আমরা বর্ত্তমান সময়ের দীর্ঘ প্রবাসীগণের তুলনা করিয়াছিলাম, সেই মতটি। এটীকে তিনি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে (প্রথম) পরাশরের বর্ণিত প্রব্রজিতের সহিত বর্ত্তমান সময়ের দীর্ঘপ্রবাসীগণের তুলনা হইতে পারে না। (দ্বিতীয়) দরিদ্রের বিবাহ যুক্তি সঙ্গত।

দীর্ঘপ্রবাসী সম্বন্ধে প্রতিবাদকারী বলেন, "বিহারী বাবুর মতে অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছে বলিয়া যেমন অপরাধী, দীর্ঘ প্রবাসী ব্যক্তি উদরান্নের জন্য স্ত্রীকে স্বদেশে রাখিয়া বিদেশে বাস করিতেছেন বলিয়া তিনিও তেমনি অপরাধী।, একরূপ সাদৃশ্য কেমন করিয়া টানিলেন বুঝিতে পারিলাম না।" আমরা যে উদ্দেশ্যে "সমাজ-রহস্য—সধবার বিবাহ।" শীর্ষক প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, লেখক যদি এই স্থলে সেই মূল উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সেরূপ করেন নাই।

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, দীর্ঘপ্রবাসী উদরান্নের জন্য বিদেশে আছে, আর অনুদ্দিষ্ট না হয়, ধর্ম্মের জন্য বা অন্য কোন কারণবশতঃ বিদেশে বাস করিতেছে। কিন্তু এই উভয়ের স্ত্রীর অবস্থা তুলনা হইতে পারে কি না? যদি বলেন, দীর্ঘপ্রবাসী মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্ত্রীকে পত্র লিখেন ও সংসার খরচের জন্য অর্থ পাঠাইয়া দিয়া থাকেন; এবং মধ্যে মধ্যে আশ্বাসজনক বাক্য প্রয়োগেও কৃপণতা করেন না। অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি একরূপ করিয়া থাকে? এতদুত্তরে আমরা বলি, যদি পত্র লিখিলে বা অর্থ পাঠাইলে ধর্ম্ম ও নীতিহীনা অনেক স্ত্রীলোক দুর্ব্বার নিসর্গবিকার দমন করিতে সক্ষমা হইত এবং সমাজকে পবিত্রভাবে রাখিয়া দিত, তবে সমাজে ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হয় কেন? মধ্যে মধ্যে রাজদ্বারে এ বিষয়ের অভিযোগ হয়ই বা কেন? প্রতিবাদকারী কি একথা অস্বীকার করেন? যদি অস্বীকার না করেন তবে এইবার সহাস্যবদনে বলুন্ দেখি, সাদৃশ্য টানা সঙ্গত না অসঙ্গত হইয়াছে? আর আমাদের মতে এই সকল সধবার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে কি না?

এক্ষণে দরিদ্রের বিবাহ সম্বন্ধে লেখক কি বলেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, "দরিদ্রের বিবাহ না করা পরামর্শ অতি সৎ। কিন্তু আবার অপর অংশে দেখিতে গেলে ইহার সারত্ব থাকে না। এ সংসার ত সুখের নয়। ইহাতে দুঃখের অনল দিবানিশি জ্বলিতেছে। সেই অনলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যেন দরিদ্র লোক বিবাহ করিল না। মনে করিল, যখন সময় হইবে তখন বিবাহ করিয়া

সুখী হইব। কিন্তু সময় আর আসিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কাটিয়া গেল; তথাপি সুসময় আসিল না। বিবাহও হইল না। হৃদয়ের বিমলভাব ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। রিপুর প্রবল তাড়নে সে অন্ধ হইল। এবং সেই অন্ধতাপ্রযুক্ত সে সুখময় ঘূর্ণাবর্ত্ত এড়াইতে পারিল না; তাহাতেই আসিয়া পড়িল। পাঠক! দুঃখ কি বুঝিয়াছেন, সে মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত হইল। জগতের এক অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ অবস্থায় দরিদ্রের বিবাহ কি যুক্তি সঙ্গত নহে?"

লেখক উপরি বর্ণিত যুক্তি দ্বারা যেরূপে দরিদ্রের বিবাহ যুক্তি সঙ্গত স্থির করিয়াছেন, তাহাতে কি ইহাই বোধ হইতেছে না, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই তাহার বিবাহের মুখ্য কারণ? যদি তাহার বিবাহ না হয়, তবে সে মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া এক অদ্ভুত জীব হইয়া পড়িবে। আমরা বলি, যদি দরিদ্রের বিবাহের এই মুখ্য কারণ হয়, সে যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া পাপময় ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পতিত হয়, তবে তাহার বিবাহ সহস্রবার যুক্তি সঙ্গত।

কিন্তু বিবাহ শব্দের যদি এই একই অর্থ না হয়, যদি তাহার বহু অর্থ থাকে, বিবাহ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরিণামে যদি সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিব; সৎকার্য্য দ্বারা দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সকলের নিকট মাননীয় হইব, যদি বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জগৎকে ভাতৃবন্ধনে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব ইত্যাদিরূপ অভিপ্রায় থাকে; তবে আমরা এখনও অম্লানবদনে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, যাহার পরিবার ও সন্তানাদি প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই, এরূপ দরিদ্রের বিবাহ কোন্ মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেন না ভারত মাতার আর সে অবস্থা নাই। ভারত বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগের আবসস্থল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর দরিদ্র, তাহার পরিবার ও সন্তানাদি বাস করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য নাই, রোগে চিকিৎসার অভাব, অর্থ বিনা বিদ্যার অভাব, সকল অভাবই তাহার হইয়া থাকে। তাহার মনোমত কোন কার্য্যই হইবার উপায় নাই। সে সংসারে জীবন্মৃতবৎ; তাহার সন্তানাদি আবার সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ—

দরিদ্রতার বৃদ্ধিকারক। এমন সঙ্কট অবস্থায়ও কি কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নিজের সুখাভিপ্রায়ে দরিদ্রের বিবাহ যুক্তি সঙ্গত? যিনি সঙ্গত বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন, কিন্তু আমরা এ মতে মত দিতে অভিলাষী নহি। আমরা বলি, দরিদ্র যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব করিবার বাসনা রাখেন, তবে অগ্রে স্বীয় অবস্থার উন্নতি চেষ্টা করুন, পরে বিবাহের জন্য হস্তে সুতা বন্ধন করিবেন। নতুবা আপাত সুখের জন্য বিবাহ করিলে সংসারে আসিয়া চিরকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চয়ই দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। মনুষ্য জীবনে ইহাই কি প্রার্থনীয়?

শ্রীবিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়
কুকমবেলিয়া।

রসিকতা।

এ সংসারে রসিক নয় কে? শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানি, মূর্খ সকলেই রসিক, তেমন লোক পাইলে এমন কে আছে যে রসিকতা করে না? বস্তুত আমরা রসিকতার নিন্দা করিতে লেখনী ধারণ করি নাই। রসিকতার আমরা নিন্দা করি না, বরং আমরা রসিকতা ভালবাসি। ঠিক সময়ে ঠিক তালে, রসিকতা বড় মধুর, রসিকতা ভালবাসে না এ জগতে এমন লোক দেখি না। কিন্তু শেষরতা রসিকথা সুরুচিকর হওয়া বিধেয়। আজ কাল বঙ্গে নানান লোক নানান ধরণের রসিকতা করিয়া থাকেন। অনেক কুরুচিপূর্ণ বিদ্রূপ বা ইয়ারকি রসিকতা উরঙ্গে ভাসিতেছে, আমরা তাহারই জ্বালায় জ্বালাতন। সেই সকল কুরুচিকর রসিকতা যাহাতে সংসার হইতে তিরোহিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

সুরুচি ও কুরুচি মনুষ্যের অভ্যাসগত প্রকৃতি। শিক্ষায় সুরুচি স্থাপিত হয় সত্য, কিন্তু বঙ্গসমাজে কতকগুলি কুৎসিত রসিকতা এরূপ প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, যে সহসা শিক্ষাও তাহার বিষময় মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দাও, অধুনা বঙ্গ-সমাজ যে সামাজিক রীতি

নীতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে, এই শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির গৌরবের দিনে, এই সভ্যতাগর্ব্বী বাঙ্গালির উৎসাহের দিনেও যে বাঙ্গালি পূর্ব্বাপেক্ষা রসিকতায় কি মার্জ্জিতরুচি হইয়াছে তাহা বুঝি না। অনেক সময় অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে লোককে হাসাইতে পারিলেই বড় রসিকতা করা হইল। অনেক সময় কেহ কেহ কোন ব্যক্তি বিশেষের মর্ম্মে ব্যথা দিয়াও অপরকে হাসা-ইতে কুণ্ঠিত হন না, অনেকে গলাবজি করিয়া রসিকতা জাহির করিতে উদ্যত। এইরূপ নানান ধরণের নানান লোক আছেন, এরূপ রসিক সম্প্রদায় পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও আছেন, তবে আর বঙ্গসমাজ কিসে পূর্ব্বা-পেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে? সেই পূর্ব্বের এযাবকি সেই পূর্ব্বের রসিকতা এখনও বর্ত্তমান, তবে শিক্ষায় লোকের কি ফল ফলিল, সভ্যতায় কি লভ্য হইল? তাই বলি বাঙ্গালির সে গুলিতে লক্ষ্য নাই, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে সাধারণ লোকমধ্যে পূর্ব্বের কুরুচিকর রসিকতা প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে নাই। আমরা বলি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সামাজিক রীতিনীতির যেরূপ উৎকর্ষ হওয়া বিধেয় দুর্ভাগ্যবশতঃ ততটুকু এখনও হয় নাই। অধিক কি অনেক বঙ্গসমাজের সুপরিচিত এবং বিশেষ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত এমন লোক মধ্যেও সে গুলি বেশ প্রচলিত। ৬ দিনবন্ধু বাবু বঙ্গসমাজে বিশেষ পরিচিত এবং তিনি যে শিক্ষিত এবং সুসভ্য ছিলেন তাহাতে কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু তাঁহার পুস্তক পাঠ করুন, রসিকতায় তাঁহার রুচি কিরূপ মার্জ্জিত ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম, তাঁহার "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন (ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্টপ্রহর আমার সহিত ঐ রূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণ সেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?) মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ

করিতেছেন? ভগবতী বলিলেন 'তবে নখরে নখরে নিপাত কর যমের বাড়ী চলে যাই।' বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া কহিলেন 'ভগবতী! তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে যাও।' পাঠক! ভাবিয়া দেখুন যে এ বিদ্রূপটী কুরুচিকর কি না? দিনবন্ধু বাবুর পুস্তক সমূহ রসিকতা পূর্ণ, পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার সমস্ত রুচি গুলি মার্জ্জিত নহে, ইহা একটী সামান্য দৃষ্টান্তমাত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠালব্ধ অনেক গ্রন্থকারের গ্রন্থেও এরূপ কুৎসিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ কাল রসিকতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা সহুরে ও পাড়া-গেঁয়ে। সহুরে রসিকতা পাড়াগেঁয়ে রসিকতা হইতে সমধিক সুরুচিকর। পল্লিগ্রামে অনেক শিক্ষিত লোকেও "বউও" "শ্বাশুড়ে" "বেয়ানে" প্রভৃতি বলিয়া রসিকতা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এগুলি কত অসঙ্গত। যাহাদিগের সহিত যাহার মাতৃ সম্বন্ধ তাহা-দিগকে উল্লেখ করিয়া যাহারা অম্লানবদনে এই সকল জঘন্য এয়ারকি করিতে পারেন, তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক! শুদ্ধ ইহাই নহে, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক কুৎসিত ও ঘৃণিত রসিকতা আছে, সে সমস্ত উল্লেখ করিয়া আমরা আদরিণীর পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিতে প্রস্তুত নহি, যাহাই হউক অনেকেই স্বীকার করিবেন যে সেরূপ অনেক রসিকতা বঙ্গে বিশেষতঃ পল্লিগ্রাম সমূহে এখনও বিশেষ প্রবল। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যাহাতে এই সমস্ত ঘৃণার্হ রসিকতাসমূহ শিক্ষিত বাঙ্গালির পবিত্র সমাজে প্রশ্রয় না পায় তৎপ্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

রমণীগণের মধ্যেও এ রসিকতা প্রবল। অনেক রমণী নববিবাহিতা পুত্রবধূকে "আমি তোমার কাকা হই" বলিতে আপন ছোট সন্তানকে শিখাইয়া দিয়া আমোদকরেন। এ গুলি প্রকৃতই নিন্দার্হ। অনেক যুবক এমন কি যাঁহারা সমাজে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও শ্যালক প্রভৃতির সহিত এরূপ জঘন্য রসিকতা করেন, যে তাহা শুনিতে লজ্জা করে। সকল বিষয়ের সাম্য আছে; রসিকতা সকলেরই সহিত করা যায়,

কিন্তু সে রসিকতা অন্য রূপ। দুঃখের বিষয় যে অনেকের কেমন এক অভ্যাস হইয়াছে যে তাঁহারা এই উষ্ণ প্রধান দেশে উষ্ণ রসিকতা না করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না। আশা করি, শিক্ষার অনুরোধে, সভ্যতার অনুরোধে, সমাজের অনুরোধে, লজ্জার অনুরোধে, রুচির অনুরোধে বা যাহারই অনুরোধে হউক বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সমস্ত ঘৃণা উদ্দীপক রসিকতা ত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নতি কল্পে যত্নপর হইবেন। ইহাই আমাদিগের আশা, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, ইহাই আমাদিগের যত্ন। আশা করি শিক্ষিত সম্প্রদায়-আমাদের সরল কথা বুঝিবেন, এবং সরল প্রাণে আমাদের সরল কথার সহানুভূতি দিয়া সমাজের উপকার করিতে অগ্রসর হইবেন।

লক্ষ্মীর সংবাদ।

বসন্ত কাল, দক্ষিণ দিক হইতে মলয়ানিল ধীরে ধীরে বাহিত হইতেছিল, সন্ধ্যা সমাগমের আর বিলম্ব নাই, এমত সময়ে গোলোকধামের গাড়ি বারান্দার খোলাছাতে লক্ষ্মী একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনিতে ছিলেন, এমত সময়ে চঞ্চলার প্রিয় বাহন পেচক আসিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করত সাহ্লাদে কহিল "মা চোত মাস ত এলো মর্ত্তে যাবার আয়োজন হচ্চে না?

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোর এত মর্ত্তে যাবার সখ কেন?"

পেচক। কলাটা সসাটা পেট পুরে খেতে পাই এই আর কি?

লক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন "এবার তোরে বৈকুণ্ঠেই পেট পুরে কলা সসা খেতে দিব মর্ত্তে আর যাচ্ছি না"

এমত সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত। লক্ষ্মীর দক্ষিণ দিকে একটী খালি চেয়ার ছিল নারায়ণ তাহাতে উপবেশন করিয়া কহিলেন "কি তোমার বাহনের খবর কি?"

লক্ষ্মী। মর্ত্তে যাবার আব্দার।

নারায়ণ। কেন এবার তুমি মর্ত্তে যাবে না?

লক্ষ্মী—আবার। যে নাকাল হয়েছি।

নারায়ণ। কেন?

লক্ষ্মী। দেথ বাঙ্গালির উপর আমার চিরকাল কেমন একরূপ স্নেহ ছিল, শতকাজ ফেলে তাদের উপকার করিতে প্রবৃত্তি হতো, কিন্তু তারা আমায় স্বইচ্ছায় ত্যাগ করতে চায়। দেথ নাথ। ইহা কাহার অবিদিত যে ভারত আমার প্রধান বিলাশ ক্ষেত্র, আমার চঞ্চলা নামের স্বার্থকতা ভারত হতেই বিদূরিত করেছিলাম। কিন্তু বল্‌তে লজ্জা করে তারা আমার কিরূপ সদ্ব্যবহার করে,—আমার যথেচ্ছ অপব্যয় দ্বারা তারা আপনাদের কলুশিত চিত্তের তুষ্টি সাধনা করে, কোথায় আমাকে নিয়ে স্বাধীন প্রবৃত্তির উত্তেজনা কর্‌বে, না আমায় জমিন স্বরূপে আবদ্ধ রেখে দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করে, যাদের এত অর্থ যে লোকে বলে আমি তাদের ঘরে বাঁধা, তাদের সে প্রভূত ধনের সৎপাত্রে ব্যবহার নাই, ম্লেচ্ছ ভোজন ও ম্লেচ্ছদিগের বিলাসচারিতার জন্য আমার অনিচ্ছাসত্তেও তাহাদের বাটী হইতে ম্লেচ্ছবাটীতে যাইতে বাধ্য হইতে হয়।

নারায়ণ কহিলেন "তা বলেকি বাঙ্গালিদিগকে তুমি একেবারে ভুলে যাবে, তুমি ব্যতীত তাদের আর উপায় কি? তুমি না বল্‌তে বাঙ্গালিরা আমায় বড় ভক্ত সেই জন্য আমি তাদের ভুল্‌তে পারিনে তা এই সামান্য দোষের জন্য তোমার চির ভক্ত বাঙ্গালিদের প্রতি একেবারে বিমুখ হবে?"

নারায়ণী বলিলেন "সে ভক্তি থাকিলে কি আমি বাঙ্গালিদের ত্যাগ করি, সে ভক্তি সে যত্ন সে শ্রদ্ধা আর বাঙ্গালিদের নাই, এখন আমার পুজা করা তাদের উপহাস মাত্র, প্রথমত যে বাঁকা পায়ের আলপনা দেয় তাতে ত বাড়ি ঢুকতেই আচাড় খেতে হয়, তার পর গোবর নেপা জল স্যাঁপসেপে মেটে ঘরে পিড়ের উপর চুপ্‌টী করে মসার কামড়ে রজনী অতিবাহিত করা যে কত কষ্ট তা আর কি বলব, কেন তুমিইত গেল বারে বলেছিলে যে,"একি গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে নাকি?"যাদের কোটা ঘর তাদের এত ভাল ঘর থাকতে আমার পূজা চোর কুটরিতে, সেই বাতাস শূন্য অন্ধকার ঘরে রাত্রি বাস করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়,তার উপর গণেশভায়ার বাহনদের উপদ্রবে

অস্থির। সুন্দর সুন্দর ভবনে সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে শত শত ব্যভিচারিনী স্বৈরিণী সাদরে স্থান পায়, বিলাসচারিতার জন্য কতশত গৃহ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু আমার আব সেই অন্ধকূপ ঘুচে না, সুধু কি তাই ছিছি বলিতে লজ্জা করে, কতকগুলো ব্রহ্মণ নাম,ধারি বুনো বয়াব,যাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের সহিতও হয়ত সংস্কৃতেব সাক্ষাৎ হয় নাই, যাহাদিগকে কিল মারিলে কোঁক করে না পাছে ক অক্ষর উচ্চারিত হয় এমন সকল রত্ন বিশেষ ভট্টাচার্য্যেব দ্বারা আমার অপঘাত মৃত্যু কবা হয়, বলিতে কি পূজার নাম গন্ধ নাই কেবল কতকগুলা আবল তাবল বকিয়া সারে, সে দিন এক বাটীতে ঐ রূপ একজন দিগ্‌গজ আমাব ধ্যান এইরূপে আরম্ভ কবিল যথা "পালক্ষ মারিতে ভোজ ছি, নাভি জম্মে তাঁর" বলিতে কি আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বাঁচি। ভাই! এ দেখে কি বোধ হয় না বাঙ্গালিদের লক্ষ্মীপূজা উপহাস কবা মাত্র। যাহারা জন্মাবচ্ছিন্নেও পাঠশালায় একমাসও উপস্থিত হয় নাই, তাহারা যে কোন পূজারই উপযুক্ত নয় তাহা কি গৃহস্থরা জানে না? আবার অনেক এমন পণ্ডিতও আছেন যাহারা দিবসে সঙ্কল্প করিতে বিস্মৃত হইয়া রাত্রে গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তাই বলি বাঙ্গলায় আর যাব না, তবে যদি তাবা কখন আমার আদর বুঝে, কখন আমার সদ্ব্যবহার করে, তবে তাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাত করব, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

নাবায়ণ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত কমলা বড় দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গালিরা তোমায় অযত্ন কবে। এখন চল অন্ধকার হয়েচে ঘরের ভিতর যাই।"

নারায়ণ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া মৃদু পাদচারণে কক্ষ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পেচকও বিমর্ষভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ভারত দর্পণ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মূল্য এক পয়সা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ভারত দর্পণ বিজ্ঞাপনানুযায়ী বঙ্গবাসী আকারে প্রকাশিত, হইয়াছে। সংক্ষেপে ভারত দর্পণ বঙ্গবাসীর অনুকরণে প্রকাশিত, অনুকরণে ভারত দর্পণ বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে। "ভারত দর্পণ" ও "বঙ্গবাসী" যে এক দরের কাগজ তাহা আমরা বলি না। বঙ্গবাসী ও ভারত দর্পণে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে কিন্তু দামেও অনেক প্রভেদ। কালে চেষ্টা ও অধ্যাবসায় দ্বারা ভারত দর্পণ যে প্রকৃতই কেন ভারত দর্পণ হইতে পারে না তাহা আমরা বুঝি না।

বহুল সংবাদপত্র প্রচার অপেক্ষা একখানি সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ভাল বলি। কারণ সাধারণ মত তদ্বারা যত সাধারণের গোচর করা যায় এমন আর কিছুতে যায় না। বঙ্গবাসীতে আমাদের সে অভাব কতটা পূরিয়াছে। আশা করি ভারত দর্পণে আরও পূরিবে।

এক কথা "ভারত দর্পণ" স্থায়ী হইবে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। ভারত দর্পণের সপ্তাহে সপ্তাহে অনেক ব্যয়, সেই ব্যয় কিছুকালের জন্য কুলান করা চাই। বাঙ্গালি এক বৎসর কাগজ না লইয়া বড় একটা টাকাকড়ি দেয় না। অনেকে কোন একটী কাগজ প্রথম প্রচার হইলে বলেন "কাগজ খানি ভাল কিন্তু এক বৎসর স্থায়ী না হইলে গ্রাহক হইব না।" সুতরাং এইরূপে সকলেই যদ্যপি বলেন তাহা হইলে সে কাগজ খানি যে কিরূপ স্থায়ী হয় তাহা বলা বাহুল্য। আশা করি বাঙ্গালি ভারত দর্পণ সম্বন্ধে সেরূপ কেহ করিবেন না। বৎসরে ৸৹ আনা, এই সামান্য মূল্য দিয়া সংবাদপত্র প্রিয় লোক যেন তাহার গ্রাহক হইতে কৃপণতা না করেন।

সংবাদপত্র প্রচার পূর্ব্বে অনেকের সখের জিনিস ছিল, এখন সংবাদপত্র যে এক রূপ ব্যবসা মাত্র এ ধারণা অনেকের জন্মিয়াছে। আশা করি ভারত

দর্পণের ও সেই উদ্দেশ্য হইবে। যদ্যপি ভারত দর্পণের প্রচার উদ্দেশ্য ব্যবসায় না হইয়া সাধারণের কেবল উপকার করা হয় তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস ভারত দর্পণ স্থায়ী না হইয়া দিন কতক বালকের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে।

ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে, ভারত দর্পণ বা বঙ্গবাসীর ন্যায় কাগজ চালান একজন লোকের দ্বারা হয় না। অনেক লোকের আবশ্যক, অনেক নিয়মিত লেখক চাই, তাঁহাদিগের প্রতি ব্যয়ও আছে, সুতরাং সংবাদপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যবসায় না হইলে এ সমস্ত চলেনা, এবং উৎসাহও হয় না। তবে উৎসাহ-শূন্য বাঙ্গালি গ্রাহক লইয়া বাঙ্গলা সংবাদপত্র চালাইয়া ব্যবসা করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। আজকাল বাঙ্গালিরা পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত উন্নত, বাঙ্গলাভাষা আপনার মাতৃভাষা বলিতে ঘৃণা করেন না এবং তাহার উন্নতির চেষ্টাও আছে। তাহাই ভারত দর্পণের উৎসাহ দাতা ও উদ্যমকর্ত্তাগণের আশা।

আশা করি ভারত দর্পণের প্রচার কর্ত্তাগণের উদ্যম উৎসাহ অটুট রহিবে। যদি এই উৎসাহে এই উদ্যমে এক বৎসর অতীত করাইতে পারেন তাহা হইলেই সম্ভবত, ভারত দর্পণ স্থায়ী হইবে। এবং কালে এমন দিন আসিবে যে দিন ভারত দর্পণ তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহের প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবে।

মহাপূজা—শ্রীহট্ট মেলা উপলক্ষে লিখিত, শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। শ্রীহট্ট ইউনাইটেড্ কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমরা এ পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ইহাতে শরৎ বাবু তাঁহার হৃদয় যে মাতৃভূমির দুর্দ্দশায় কাঁদে এবং সুখে উচ্ছলিত হয় তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি যথার্থই সরলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" এবং নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি প্রকৃতই তাহার হৃদয়ে প্রতিঘাত হইয়াছে—

"Breathes there a man, with soul so dead,
Who ne'er with in himself hath said,—
This is my own, my native land?"

আমরা পাঠকগণের বিশেষ অবগতির জন্ত মহাপূজা হইতে নিম্নে একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম——

মল্লার—আড়া ঠেকা।

উঠ হে ভারত বাসী, বিষাদে মলিন কেন,
ফিরিল ভারত ভাগ্য, অদূরে সুখের দিন।
ভারত উত্থান হেতু, উড়িল জাতীয় কেতু
ভারতের ঘরে ঘরে, বহিল সুখ পবন।
গভীর যামিনী পরে, দিনেশ গগণে ফিরে
উজ্বল কিরণ মাখি, হাসে প্রকৃতি বদন।
তবে কেন বল ভাই, ভারতের আশা নাই
কি পাপে ভারত রবে চিরদুখে নিমগন।
বাজিল মর্ত্ত্যের ভেরী, স্বাধীন চিন্তার তুরী
জ্ঞানের দুন্দুভি নাদে, কাঁপিতেছে ত্রিভুবন;
সমস্ত মানব জাতি, চলিছে আনন্দে মাতি,
কেন হে ভারত সুত, নত শিরে ম্রিয়মান?
হইয়া গৌরব হীন, রহিয়াছ বহু দিন
হেরিছ ভারত মাতা শোক দুঃখে অচেতন,
উঠ দেখি একবার, ঘুচাতে দুর্দ্দশা মার,
সাহসে হৃদয় বাঁধি, করহে দুর্জ্জয় পণ।

ভারত কাঁদে কেন ?

ইংরেজ, ফরাশিশ, জর্ম্মাণ, দিনেমার প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় জাতি, যাহারা কখন পরাধীনতার ভারভূত শৃঙ্খল পরিধান ক্লেশ অনুভব করে নাই, অথবা যাহারা বহুদিন হইল সে ক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছে তাহারা সকলেই ভারতের গগন ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণে বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করে "ভারত কাঁদে কেন ?" যাহারা কখন পরের ইচ্ছা সেবা করে নাই, যাহারা চিরকাল উর্দ্ধ শীর্ষ, উদ্ধত স্বভাবে অন্য জাতীয়ের বিনত মস্তকে পাদুকা প্রহার করিয়া আসিতেছে, যাহারা পর দেশীয় রত্ন অবহেলে আপন দেশে লইয়া যাইতেছে, অপর জাতিকে কস্মিন্‌কালে ভয় বা বল প্রদর্শিত হইয়া এক কপর্দ্দকও দেয় নাই, তাহারা ইতি সর্ব্বস্ব সহায়হীন জাতির দুঃখ কি বুঝিবে। যিনি দিবাভাগে সূর্য্যালোক এবং নিশাকালে চন্দ্রমার বিমলালোকে জন্মাবধি পরিবর্দ্ধিত তিনি কখন কি অমানিশার অন্ধকার ক্লেশ অনুভব করিতে সমর্থ হন ? তিনি অন্ধকারের স্বত্বা এবং নাম শুনিলে উপহাস করিবেন। অতএব স্বাধীন জাতির কাছে ভারতের দুঃখের কান্না উপহসনীয়। এই হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা প্রসারিত ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যিনি ভারতের অন্নরসে আপন দেহ পরিপোষিত করিয়া ভারতের সুখদ অঙ্কে শিরস্থাপন করিয়া জননীর অঙ্ক সুখানুভব করেন, যিনি ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অন্তর্ব্বেদনায় অস্থির, যিনি ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা অনুশোচনা করিয়া ভারতের "সুখ স্যানন্তরম্ দুঃখ" ভাবিতে ভাবিতে বিহ্বল, যিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অতীত অস্তিত্ব চিন্তা করিয়া এই খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ঘোর তিমিরে বিদ্যুৎ স্ফুরণ সুখ অনুভব করেন, যিনি ইক্ষাকু, দীলিপ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠীরাদির প্রজাপালন প্রণালী, মন্বাদি ব্যবস্থা সচীবদিগের সুপ্রথা প্রবর্ত্তিতা, এবং ভীষ্ম কর্ণাদি বীরগণের রণ নিপুণতা স্মরণে শিহরিতাঙ্গ হয়েন তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে না "ভারত কাঁদে কেন ?" কেবল যাহারা ভার-

তের বিপদ বিষাদিত ও অশ্রু পরিপ্লাবিত অধরওষ্ঠে দুঃখের কান্না শুনিয়াও ভারত কাঁদে কেন বুঝে না তাহাদিগকেই বলিতে চাই "ভারত কাঁদে কেন" কিন্তু তাহারা বুঝিবে না, বুঝিলে ভারতের এ জ্বালা যন্ত্রনার অনেক লাঘব হইত, ভারত আপন ললাটলিপির নির্ব্বন্ধতা চিন্তা করিয়া আপন মনেই আপনি বুঝিয়া মনের দুঃখ মনেই রাখিত। ভারতের ললাটগর্ভে দগ্ধ বিধাতা তাহা লিপি বদ্ধ করেন নাই, অতএব কেমন করিয়া ঘোর বিপদে ভারত সান্ত্বনার প্রত্যাশা করিবে? কাজ নাই যদি নিতান্তই না ঘটিল তবে আর সে শান্তি প্রাপ্তির কামনা কেন? পূর্ণিমার পর অমানিশায় অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী, সেই বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? ভারত এখন সেই ঘোর অমানিশীথের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই ইংরাজ ঊণবিংশ শতাব্দীতে ভারতগগন নিবিড় অন্ধকারময়; ঘোর তিমির সমাচ্ছন্ন আকাশে তারকাকুল দুর্নিরীক্ষ, সুতরাং তাহারা জ্যোতিঃ বিহিন, ছায়ামাত্রাবশেষ। ভারতবাসীর সন্তাপোদ্দীরিত নিশ্বাসের ধূমপুঞ্জে আজি নিশীথ গগন দুর্লক্ষ্য, সেই সুখসমীরণ প্রবাহ আর নাই, মধ্যে মধ্যে ভারতীয় জীবকুলের স্তম্ভিত নির্ব্বাকরোদন প্রসূত নয়নাসার সহযোগী সুদীর্ঘ নিশ্বাস সতেই কেবল প্রবল বাত্যাকারে আজি বিন্ধ্যাদি অচলচুড়াচঞ্চল করিতেছে, সেই ঘোর শ্মশান ভূমিতে কোটী কোটী ভারতবাসীর চিতা জ্বলিতেছে এই দুর্নিবার অপ্রতিবিহত বিপত্তিতে জীবিতগণ মৃততত্তুল্য, বাকস্পন্দন রহিত, সুতরাং রোদনের শব্দ নাই, শব্দ কেবল নবশোণিত লোলুপ শ্বাপদকুলের, তাহাতেই বিভীষিকার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি রুধির চর্ব্বিত করালবদন ব্যাদানে চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক বিস্তার করিতেছে, সেই ভীমাশ্মশান ভূমিতে আর এক বিকট হইতেও বিকট, অতি বিকট, গগনস্পর্শী মানবের হৃদয় বিদারী, পাষাণ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসাকর্ষী, করুণ অপেক্ষাও সকরুণ শব্দ জগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমে দুঃখের সুদীর্ঘ কাহিনী ঘোষণা করিতেছে, সেই আকাশবিদারী হৃদয়বান জীবের হৃদয়ভেদী শব্দে জানাইতেছে যে সে যাহার মুখবিনির্গত, যাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত, যাহার সংকীর্ণ কণ্ঠ হইতে সতেজে উচ্চারিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া যাহার বক্ষ ফাটাইয়া প্রবলতরবেগে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহার প্রভুত অশ্রুজলে গঙ্গাযমুনা দুইটী স্রোতস্বতী

প্রবাহিত, এককালে যে দুইটী তরঙ্গিনী তাহার মুখাশ্রু প্লাবিত হইয়া সমস্ত দেশ পবিত্র করিয়াছিল আজি তাহারা দুঃখাশ্রু ধারায় পুষ্টকায়া হইয়া আপনাদের নামে কলঙ্কারোপ করিতেছে। পাঠক, সেই আকাশবিকম্পী রোদনধ্বনি, সেই অশ্রুজল প্রবাহিনী তরঙ্গিনী ভারতের। যাহারা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বাস করে, যাহারা ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং আধুনিক ভারতের অভ্যন্তরীণ রহস্য অবগত নহে, তাহারা অম্লানবদনেই বলিবে ভারত আপন সুখৈশ্বর্য্য, অতীত গৌরব হারাইয়া শোকবিহ্বল উন্মাদগ্রস্ত। কেন ভারতের দুঃখ কিসের—এই উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজ শাসিত ভারতের অভাব কোথায় ? তবে ভারত কাঁদে কেন ? তবে নিতান্তই কি শুনিবে ? তবে একান্তই কি ভারতের মনের দুঃখ, অন্তরের অন্তস্তলের সুতীক্ষ্ণ বেদনার কথা খুলিয়া বলিব ?

ভারতের প্রাচীনত্বের কথা যে স্বীকার করে করুক আমরা এ প্রবন্ধে তাহার কিছুই বলিব না কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি--যেটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যে বলিবে মান্ধাতাদি স্বাধীন ভারতের কারিটভূষা রাজন্যবর্গ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব উপাধিতে আসমুদ্র করগ্রাহী ছিলেন,—আজি কালিকার সভ্য জাতীয়গণের প্রাচীন বাইবেল বা কোরাণোক্ত ধর্ম্মপুস্তকের জলপ্লাবনের দুই এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি না,—যখন পৃথিবী সপ্তদ্বীপা ছিল, যখন আজি কালিকার প্রাচ্য ও পাশ্চত্য সভ্যজাতীয়দিগের নিবাসভূতা দেশসমূহ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, তখনকার কথা বলিতেছি। যখন ভারতে স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম আলোক ভারতের সুকুমার বদনপঙ্কজের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিত, যখন ভারতে স্বয়ম্ভব মনুর একাধিপত্য ছিল, যখন ভারতে ঋক সাম যজুরাদি বেদচতুষ্টয়ের পরম পবিত্র সুমধুর স্তোত্র সমুদায় আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠে গীত হইত, যখন ভারতীয় ঋষিগণ সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর কূলে বসিয়া অভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্মের সুচিন্তায় আপনাদিগকে অমর করিয়াছিলেন, যখন ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতুনির্ম্মিত পান ও ভোজন পাত্র ব্যবহারে অতুল সুখৈশ্বর্য্যশালী ছিল, যখন সুদূরদর্শী মন্বাদি ব্যবহারশাস্ত্র কর্ত্তাদিগের সুনিয়মে ভারত শাসিত হইত, যখন ভারতে কাশীরাজ শুশ্রুতাদি ঋষিগণ রোগ প্রতিকারক ছিলেন, যখন ভারতের

প্রকৃতিবর্গ আপনাদিগেব আগাব ধনধান্যেব পবিপূর্ণতায অসনবসন ক্লেশ স্বপ্নেও কল্পনা কবিত না, যখন ভাবতে অকাল মবণাদি অমঙ্গলেব অস্তিত্ব প্রলাপপবিকল্পিত ছিল, যখন ভাবত সুখশান্তিব বিশ্রামস্থল ছিল, আমবা সেই কালের কথা বলিতেছি। এখন সেই সত্য ত্রেতাদি পবিত্র কালত্রয ভারতেব দুরদৃষ্ট ক্রমে ভাবত ছাড়িযা আবাব কোন পবিত্র লোকে চলিযা গিযাছে; এখন সেই বলী, বেণ, মান্ধাতা, অংশুমানাদি বাজন্যবর্গ নাই? এখন ভাবতেব স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইযাছে, ভাবত পবাধীনতাব গাঢ়-তম অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন, এখন ভাবতেব আব সেই বত্ন ভাণ্ডার নাই, আর ভারতে বাজচক্রবর্ত্তী নাই, বাজা নাই, সকলেই পবাধীনতাব লৌহময নিগড নিবদ্ধ দাসানুদাস, যে সূর্য্য চন্দ্রবংশে শতসহস্র আসমুদ্র কবগ্রাহী বাজচক্রবর্ত্তি সমস্ত ভাবতেব শাসনদণ্ড স্বহস্তে সঞ্চালন কবিযা প্রকৃতিপুঞ্জের হিতেব জন্য ত্যাগ স্বীকাবেব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শনং কবিযা ছিলেন, আজি তাঁহাদিগেব বংশধবেবা নীচ অন্ত্যজেব দাসবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা উপার্জ্জন কবিতেছে। এখন আর নীল সূর্য্য অযসকান্তাদি বহুমূল্য মণিমাণিক্যে ভাব তীয রাজকুলেব নযনগৃহ আলোকিত কবে না। ভাবতীয প্রকৃতিপুঞ্জেব এখন আব স্বর্ণ বৌপ্যাদি পানভোজন পাত্র নাই, মৃৎ পাত্র সাব হইযাছে! ভাবত নির্ধনেব চূড়ান্ত হইযাছে, ভাবত আজি দিনহীন পথেব ভিখাবী— ভাবত কাঁদিবে না? ভাবতেব সেই অক্ষয বত্নভাণ্ডাব লুণ্ঠিত হইযাছে। বল দেখি ভাবতেব সেই মহামূল্য সামন্তকাদি মহা মহাবত্ন কোথায় গেল? কে সেই সমুদায শত সহস্র কোটী রাজাব ধনে ভারতকে বঞ্চিত কবিল? বল দেখি ভাবতে কেন আজি বিদেশানীত কৃত্রিম হীবকেব আদব হইল? কেন ভাবতে বিদেশীয শিল্পজাত দ্রব্যেব ব্যবহাব বাহুল্য হইল? ভারতে কি কোন শিল্প ছিল না? ঢাকা, বালুচব, কাশ্মীবেব শিল্পীগণ কেন অনশনে মবিতেছে?—বলিব কি? বলিবাব মুখ নাই। ভারতেই নয ইলোরা গুহা? মযদানব বচিত ইন্দ্রপ্রস্থেব অতুল বমণীয সভা ভাবতীয স্থপতিগবিমা নয? যে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব মন্ত্রে পৃথিবীব অর্দ্ধেক লোক ভুলিয়াছে সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ নয এই হীন পরাধীন ভাবতের অঙ্ক শোভা? কোন দিকে তাকাইব, কোন বিষয লইযা বলিব বলনা, যে প্রাচীন ভারত এই

অংশে হীন তাহারই প্রতিবাদ করিব। এই সকল সুখের অতি সাধের ভারত আজি বিষাদ জলে ডুবিয়াছে। আজি ভারত কাঁদিবে না? ভারতীয় রাজন্যবর্গের রত্নভাণ্ডার শূন্য হইল; ভারতের মণিমাণিক্য, স্বর্ণ রৌপ্যাদির খনি শূন্য হইল, ভারতীয় প্রকৃতিবর্গ নিঃস্ব হইল। তাহাদিগের তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ছাদ তৃণ শূন্য হইল? গৃহ অন্নশূন্য হাহাকার রবে পরিপূরিত হইল। আহারাভাবে প্রকৃতিকুল শ্রমক্ষম রহিল না, প্রকৃতিদেবী বিমুখী হইলেন, প্রজার সর্ব্বনাশ হইল, ভারতগগনে শোণিত বৃষ্টি হইতে লাগিল! ভারতের ঘোর দুর্দ্দৈবের দিন আসিল? দুর্ভিক্ষ মহামারী নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে হইয়া উঠিল। কোটী কোটী প্রজানাশ, চারিদিকে হৃদ্‌বিদারক আর্ত্তনাদ। ইহাতেও সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ভারতের চক্ষে অশ্রুধারা বহিবে না? এই সকল জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করিয়া, এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রপীড়িত হইয়া ভারতের অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে? দুঃখের পর সুখ কটু তিক্তাদির পর মধুর স্বাদ গ্রহণের ন্যায় উপাদেয়; কিন্তু মধুর আস্বাদ গ্রহণের পর কটু তিক্তাদি রস কিরূপ অপ্রীতিকর, কতদূর কষ্টদায়ক? ভারতের অদৃষ্টে শেষোক্ত দশা ঘটিয়াছে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অমিয়াস্বাদের পর বর্ত্তমান যুগের কটুতিক্তাস্বাদ। ভারতীয় কৃষক অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট দেহে যা কিছু করিল তাহাই তাহার বর্ষাতিপাতের একমাত্র অবলম্বন, ক্লিষ্ট স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়, কৃষক সেই মুখের গ্রাসে বঞ্চিত হইল, অর্দ্ধাশনে বৎসর কাটাইল। ভারতের ধন এইরূপে প্রতি বর্ষেই ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। ভারতীয় প্রজার শোণিত দিনে দিনে শুষ্ক হইতেছে; ভারতের সামর্থ বল সকল হীন হইয়া ভারতকে নির্জ্জীব নিস্পন্দ অসাড় করিয়াছে ভারতের সে আর্য্যশোণিত নাই, সে আর্য্য প্রতিভা নাই, ভারত অন্ধকার। আহা ভারতের সেই শত সহস্র কোটী রাজার ধন ভারতকে পথের ভিখারী করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ভারত ইহাতেও কাঁদিবে না? ইহাতেও ভারতের কমলনয়নে রুধিরাশ্রুপাত হইবে না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও বিদেশীয়গণ বলিবে—ভারত কেন কাঁদে? যে হৃদ্‌বিদারক হৃদয় যাতনায় অন্যের সহানুভূতি উত্তেজনা করিতে পারিল না, সে বেদনা সে অন্তর্ভেদী বেদনার কথায় আর কাজ

কি? ভারতের আর অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই, এখনই সাগরগর্ভ গামী হওয়া উচিত।

আক্ষেপ।

১

বিশাল প্রণয়ক্ষেত্র হৃদয় আকাশে,
জগজন মনলোভা একটী সুন্দর শোভা
একটী উজ্জ্বল তারা ধিকি ধিকি জ্বলে,
দেখেছিনু শৈশবের সুখময় কালে।

২

দূরগত সে শৈশব এ জীবন হতে,
আর কি আসিবে ফিরে আর কি দেখিব তারে
সে সুখ হয়েছে গত জনমের মত,
সেই সুখ সেই দিন ভাবি অবিরত।

৩

জীবনের সুখ তারা সেই সাথে হায়
চির জনমের মত কবি মর্ম্মে মর্ম্মাহত
গিয়াছে—জীবনাকাশ অন্ধকার করি,
কে নিল রে কাঙ্গালের নিধি অপহরি?

৪

জান নাকি
ঘোর অমানিশা তায় প্রাবৃট অম্বর
গরজে গভীর ঘন যেন প্রকৃতির রণ
হেন কালে পথভ্রান্ত পথিকের দশা,
নিভিলে তাহার দীপ একই ভরসা।

৫

তুচ্ছ, সে যাতনা যদি দেখ মোর দশা,
অমানিশা গত হলে সে পথিক কুতুহলে
আপন অভীষ্ট পথ পায় নিরন্তর,
ভুলে যায় রজনীর যাতনা সত্বর।

৬

কিন্তু আমি—
জানিনাকি মর্ম্মদাহী মহাযোগ বলে
নিশি দিনে কি স্বপনে থাকি মগ্নভাব ধ্যানে
ভাবি সেই মুখপদ্ম পরাণ অমিয়া,
পাগল্ যাহার তরে এ পাগল হিয়া।

৭

মনে করি
নিবেছে প্রণয় দীপ জানি বহুদিন,
তবু কেন যত্ন করে আশার শিখার জোরে
জ্বালিনা প্রণয় দীপ যতনে আমার,
জ্বলে কিরে দীপকভু নাহি তৈল যার?

৮

ছি ছি তবু কেন নাহি ভুলি তার আশা,
কেন বা পাগল মত ভাবি তারে অবিরত
অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী যার ব্যবধান
কোথা সেই কোথা আমি রে পাগল প্রাণ।

৯

আকাশ কুসুম সম কেন তার আশা,
এখনও হৃদয় মন করিতেছে উচাটন
এখনও পরাণ মোর করিছে বিবশ,
ধিক্ আশা,—ধিক সেই যেই পরবশ।

১০

ধন্য আশা কুহকিনী—ধন্য তুই মন
ধন্য প্রতারিত প্রাণে ধন্য মিছা সুখ ধ্যানে
ভাবিস্ প্রকৃত সুখ দেখিয়া স্বপন,
তুই হেথা, কিন্তু কোথা তোর সে রতন?

১১

তাই বলি ভুলে যাও নিবাও অনল,
ভুলে যাও তার আশা ভুলে যাও ভালবাসা
ভুলে যাও যে বদন করেছে পাগল,
আকাশ কুসুমে আর নাহি কোন ফল!

১২

ভুলি মনে করি, কিন্তু ভুলিতে না পারি,
সেই মধুমাখা হাসি মনে হেরি সুখে ভাসি
কেন রে ত্যজিব সেই সুখ সাধ করি,
ভাঙ্গিব সুখের স্রোতে সুখের লহরী?

১৩

অনন্ত পর্ব্বত কিম্বা অনন্ত সাগর
থাক তার ব্যবধান তবু এই মনপ্রাণ
করিবে তাহার ধ্যান অক্ষুন্ন অন্তরে,
আমি তার নিরবধি জগত ভিতরে।

১৪

সেই যে সুন্দর ছবি হৃদয় ভিতরে,
বিধি-দত্ত লেখনীতে আঁকিয়াছে এই চিতে
ভুলিব কি?—না না তাহা কখন হবেনা,
সে ছবি হৃদয় হতে দূরেত যাবে না।

১৫

তবে যদি পার ভাই,
অনন্ত চিতার শ্রেণী ধুধু করে জ্বেলে,

দাও—তাহে সেই ধ্যানে সেই ছবি ভাবি মনে
সহমরণের প্রথা করি সুখময়
নতুবা তাহারে ভোলা হবেনা নিশ্চয়।

বিজয় সিংহ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সকলি ফুরায়।

এ সংসারে সকলি ফুরায়, মান, সম্পদ, যশ, যৌবন, গৌরব, ভালবাসা, আশা প্রভৃতি সকলি ফুরায়। মানব মন যে সুখাস্বাদনে এক দিবস আনন্দে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, সেই মানবই আবার কালের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনে সেই পূর্ব্বসুখ দুঃখময় ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে, অজস্র অশ্রুবরিষণ করে। সরমা আশৈশব উদয় সিংহকে ধ্যান করিত, যদ্যপি উদয় সিংহকে না পায় তাহা হইলে অন্য কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ করিবে না বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কিন্তু আজি সরমার সে সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। সরমা উদয় সিংহের আশা ত ত্যাগই করিয়াছে, চিরকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া উদয়ের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তাহা নিরন্তর ধ্যান করিতে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সরমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখটুকুও লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সরমা যবন স্কন্ধে যাইতেছে, কেন যাইতেছে কোথায় যাইতেছে তাহা জানে না। আজি সরমার পূর্ব্ববৎ বুদ্ধি নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে সরমা যে নিশ্চেষ্টবৎ রহিত এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। সরমা ভয়ে জড়সড় হইল, ক্রমে তাহার বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হইল, সেই যবন স্কন্ধেই সরমা জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। যবনেরা কোথায় যাই-তেছে কতদূর যাইতেছে, সে সমস্ত কিছুই বুঝিল না; লইয়া যাইয়া কি করিবে সে হুতাশও তিরোহিত হইল।

কতক্ষণ পরে যে সরমার জ্ঞান সমাগত হইল তাহা আমরা জানি না তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে যখন সরমার মোহভঙ্গ হইল তখন আর সরমা কাহার স্কন্ধে নহে। সরমা বিচিত্র সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুন্দর খট্টোপরি শায়িত রহিয়াছে, সুগন্ধি দ্রব্যজাত গন্ধে গৃহপূর্ণ। এটি দিল্লী-সন্নিহিত স্থান বিশেষ—বাদসাহের নৃত্যশালা। সরমা সেই নৃত্যশালার একটি প্রকোষ্ঠে শায়িত রহিয়াছে।

সরমা চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিল যে তিনি আর সে অরণ্যে নাই, ইহা একটি সুসজ্জিত গৃহ। সরমাকে জাগরিত হইতে দেখিয়া একটী দাসী কহিল "বেগম সাহেব কি আজ্ঞা করেন।"

সরমা। তোমরা কে?

দাসী। আপনার দাসী।

সরমা। বেগম সাহেব কে?

দাসী। কেন আপনি।

সরমা রাগান্বিত হইয়া কহিল "সয়তানী আমি বেগম?"

দাসী। বাদসাহ আপনাকে বেগম করিয়াছেন।

সরমা আরও রাগান্বিতা হইয়া কহিল "তোর বাদসাহকে যাইয়া বল্ যে তাহার মুখে পদাঘাত করিলেও আমার দেহ অপবিত্র হয়।"

দাসী। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন,—বাদসাহ যে আপনার সহিত সমস্ত রাত্রিই প্রায় যাপন করিয়াছেন।

সরমা কহিল "কি বাদসাহ আমার সতীত্ব অপহরণ করিয়াছে।"

দাসী। আপনাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন।

এইবার সরমা কাঁদিল। জানুপাতিয়া করপুটে উর্দ্ধমুখে বলিল "হা ভগবান্ তোমার মনে এই ছিল, সরমার শেষ দশা কি এই হইল। পিশাচ—নিরয়ের কীট আমার দেহ অপবিত্র করিল। যে সতীত্ব আমি প্রাণ অপেক্ষা সহস্র গুণে প্রিয় জ্ঞান করিতাম, আজি সে আমার সেই পবিত্র ধন হারাইলাম। আজি আমার দেহ অপবিত্র—অস্পৃশ্য হইল? হায়! আমার কি হইল, রমণীকুলের সর্ব্বস্বধন সতীত্বরত্ন হারাইলাম? বিধাতঃ তুমি কি নিষ্ঠুর এখনও আমায় জীবিত রাখিয়াছ?—হৃদয় তুমি বিদীর্ণ হও, এ অপবিত্র

দেহ ত তোমার বাসের যোগ্য নয়। যে নরাধম বাদসাহ যদি ঈশ্বর থাকেন তবে যেন ইহার সমুচিত প্রতিফল পাও। যবনের বাদসাহ গৌরব যেন অগৌনে ভারত ভূমি হইতে তিরোহিত হয়, বিজাতিয়ের পদদলন ব্যতীত যেন তোমাদের একটি দিনও অতিবাহিত না হয়।"

এমত সময়ে রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া বাদসাহ আরঙ্গজেব তথায় উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ সরমাকে জাগ্রিত দেখিয়া কহিলেন "বিবি তোমায় বেগম পদমর্য্যাদা প্রদান করিতেছি।"

সরমা কহিল "কুক্কুর, সাবধান হইয়া কথা কও নতুবা পদাঘাতে তোমার বক্ষঃস্থল ভাঙ্গিয়া দিব।

আরঙ্গজেব হাসিয়া কহিলেন "অমন কুসুমের বোঝা বুকে ধরিতে কে বিমুখ।"

সরমা রাগান্ধ হইয়া কহিল "আমি তোর মাতৃস্থানীয়, আজি যদি আমাকে বুকে ধরিয়া সুখানুভব করিস্ তাহা হইলে কালি যে তোর মাতাকে বক্ষে ধরিয়া সুখী হইবি তাহাতে বিচিত্র কি?"

তখন আরঙ্গজেবের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল কহিলেন "সয়তানি ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবি।"

সরমা। তুই আমায় কি প্রতিফল দিবি, তুই যে কার্য্য করিয়াছিস ঈশ্বর তাহার প্রতিফল তোকে দিবেন।"

বাদসাহের চক্ষু ক্রমে আরও আরক্তিম হইয়া উঠিল, একজন রক্ষীকে কহিলেন "এখনি এ পাপিয়সীর প্রাণবধ কর।"

আজ্ঞা পাইবামাত্র রক্ষী কোষ হইতে শাণিত তরবারী বাহির করিল। দীপালোকে তরবারী জ্বলিয়া উঠিল।

সরমা হাসিয়া কহিল "পিশাচ মৃত্যু ত আমার স্পৃহনীয়, এ প্রাণ কে রাখিতে চাহে?"

বাদসাহ কহিলেন "না না ইহাকে এখন বধ করিও না, অগ্রে মল মুত্র পরিস্কারক দিগের দ্বারা ইহার সতীত্ব বিনষ্ট করা হউক, তাহার পর অসংখ্য সুচীকাবিদ্ধ করিয়া, অথবা অনিদ্রা যাতনা দিয়া ইহার প্রাণ গ্রহণ করা যাইবে।"

সরমা। আমার সতীত্ব ত কুকুরে নষ্ট করিয়াছে। তাহা অপেক্ষা আর কি হইবে।

বাদসাহ সরমার কেশাকর্ষণ করিয়া সজোরে পদাঘাত করিলেন, সেই আঘাতে সরমা আবার মুচ্ছির্তা হইল। ক্ষণেক পরে জ্ঞানের পুনরভ্যুদয় হইলে সরমা কহিল "জগদীশ্বর আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। যাহা না হইবার তাহাও হইয়াছে, দেব! আর কেন, সকল যাতনার শেষ করুন। দয়াময়! বলিতে কি, এ অধিনী তোমার নিকট ব্যথীত হৃদয়ে কত প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিনীর কাতরোক্তি তোমার পদস্পর্শ করিতে পারে নাই। এ জীবনে আমার অন্য কিছু ভিক্ষা নাই। কেবল এক ভিক্ষা প্রাণান্তে যেন তোমার চরণতলে স্থান পাই।" সরমা চক্ষু মুছিয়া কহিল "আর এক প্রার্থনা অধিনীর সর্ব্বস্বধন উদয় সিংহ যেন সুখে থাকে, নিদ্রাবস্থাতেও যেন তাহার মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত না হয়। উদয় আজি যদি একবার তোমার মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার মরণে যে সুখ হইত সে সুখ বুঝি ত্রিদিবেও নাই। অমিলা তুমি কি ভাগ্যবতী, উদয় তোমার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন, স্বহস্তে তোমার সমাধী করিয়াছেন। কিন্তু আমি হতভাগিনী।" সরমার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিল কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল সরমা নিজ্জির্ববৎ শায়িত রহিল। সরমা অমিলা দত্ত অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়াছে। সরমা আর অধিকক্ষণ ইহজগতে থাকিবে না। অমিলা যে কি অমূল্যধন সরমার হস্তে দিয়াছিল তাহা সে এখন বুঝিল, মনে মনে বলিল "অমিলা তোমার যেন অক্ষয় স্বর্গবাস হয়।"

বাদসাহ কহিলেন "সয়তানী অমিলা কোথায়?"

সরমা। পাপ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছে।

বাদসাহ। শুনিয়া সুখী হইলাম।

রক্ষীদিগকে কহিলেন "অদ্য আমি চলিলাম, কল্য প্রাতে এই পাপিয়সীকে দরবারে উপস্থিত করিবে।" এই কথা কহিয়া আরঙ্গজেব প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সরমার অঙ্গ কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। রক্ষীগণ কহিল "একি!"

সরমা জড়িত স্বরে কহিল "আর এ কি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

সরমা আবার অঙ্গুরীয় চুম্বন করিল, রক্ষীগণ বাদসাহকে এই সংবাদ দিতে ছুটিল।

আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সরমার হৃদয় দ্বিগুনিত হইয়া উঠিল। সমস্ত চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া মনে মনে উদয় সিংহের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। সরমার মৃতদেহ ধরাতলে পড়িয়া রহিল। সরমা সকল চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল।

এমত সময়ে রক্ষীদিগের সমভিব্যাহারে বাদসাহ পুনর্ব্বার সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সরমার জীবন শেষ হইয়াছে, জিজ্ঞাসিলেন "পাখি পলাইয়াছে ?"

রক্ষী। হাঁ জাহাপনা বিবি আর জীবিত নাই।

বাদসাহ। তোমরা কেন অঙ্গুরীয় কাড়িয়া লও নাই।

রক্ষী। আমরা পূর্ব্বে উহা গরলাধার বলিয়া জানিতাম না।

বাদসাহ। যাহা হইয়াছে তাহার উপায় কি কিন্তু এ মৃত দেহ যেন কল্য কুক্কুরে ভক্ষণ করে।

একজন রক্ষী কহিল "জাহাপনা এখন উহাকে কুক্কুরে ভক্ষণ করিলে সে ত আর দেখিতে আসিতেছে না।

বাদসাহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "বাঁদিকাবাচ্ছা তোর কার্য্য তুই কর্।"

রক্ষী কহিল "প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

বাদসাহ প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——:÷:——

আশা মিটিল।

বর্ষাকাল—দিগন্ত পরিব্যাপ্তি অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিযাছে, আকাশ নবজলধর সমূহে পরিবেষ্টিত হইযা অন্ধকার আরও ঘোরতর করিতেছে। আকাশ পটে চন্দ্রও নাই একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও নাই। চপলা জলধরের সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে, চঞ্চলা লুকাইতেছে আর প্রণয় বিপুল জলধর তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। চপলা সরল স্বভাবা বালিকামাত্র, জলধরকে দেখিযা হাসিযা উঠিল, সে হাসির তরঙ্গে জগৎ ভাসিযা গেল, আবার দৌড়িল, জলধরও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। কখন কখন বা ব্যঙ্গ করিযা হুঙ্কার দিল কিন্তু চপলা তাহাতে হাসিল বই ভীত হইল না।

আকাশের শোভা অপূর্ব্ব, নানা বর্ণের মেঘরাশি আকাশে ক্রিড়া করিতেছে। মেঘে মেঘে আলিঙ্গন করিতেছে। রসিক নক্ষত্র একবার সেই অবসরে পৃথিবীর দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রযোগ করিল, কি দেখিল সেই জানে আবার লাফাইযা মেঘের কোলে উঠিযা লুকাইল। বিজয় সিংহ সেই বন মধ্যস্থ কুটিরে বসিযা আকাশের ক্রিড়া দেখিতেছিলেন। কিন্তু সে ক্রিড়া সতত তাঁহার মানস আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না, কমলার মধুর বদন চন্দ্রিমা তাঁহার মানস পটে উদিত হইতেছিল, আর বিজয় সিংহের এক একটি সুদীর্ঘ বিশ্বাস নিপতিত হইতেছিল।

এমত সমযে সেই গৃহমধ্যে একব্যক্তি প্রবেশ করিলেন বিজয সিংহ গাঢ় চিন্তায মগ্ন থাকায় প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

আগন্তুক কহিলেন—বৎস। বিজয় সিংহ।

বিজযসিংহ চমকিযা উঠিলেন দেখিলেন ব্রহ্মচারী—প্রণত হইয়া কহিলেন গুরুদেব।"

ব্রহ্মচারী। আমি কোন বিশেষ কার্য্যে আসিযাছি।

বিজয়। আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মচারী। শ্রুত হইলাম যে যবন সেনারা তোমার রাজধানী আক্রমন করিবে।

বিজয। কি করিতে হইবে?

ব্রহ্মচারী। স্বদেশ যাত্রা কর, যাহাতে প্রজাবর্গের ক্লেশ না হয তাহার প্রতিবিধান কর। বিশেষতঃ তুমি অনেক দিন দেশত্যাগী হওযায দেশ অরাজক প্রায হইয়াছে। প্রজাবর্গ তৃষিত চাতকের ন্যায তোমার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিজয। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য কিন্তু—

ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"বৎস কমলার কথা কহিতেছ, আমি এখনি কমলাকে তোমার সহিত মিলিত করিতেছি। কমলা সম্পূর্ণ সতী, কমলার হৃদয স্বর্গীযভাবে পূর্ণ, কমলা তোমার উপযুক্ত পাত্রী। আমি যোগ বলে তাঁহার হৃদয পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইযাছি।"

বিজয। পরীক্ষায কি দেখিলেন?

ব্রহ্মচারী। সে কথা পরে বলিব, এখন তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন অনতিবিলম্বেই কমলা সহ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। বিজয সিংহকে কহিলেন—"বৎস বিজযসিংহ অদ্য হইতে কমলা তোমার পত্নী হইলেন, তোমরা স্বদেশ যাত্রা কর আমি পশ্চাতে যাইয়া যথাবিধি তোমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করাইব।"

বিজয ও কমলা ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন, ব্রহ্মচারী "তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া উভয়ের প্রণযে উভযে চিরমুগ্ধ ও সুখী হও।" এই বলিয়া বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কহিলেন—"বৎস তবে আমি অদ্য চলিলাম, কল্য প্রাতেই তোমার সৈন্যবর্গ লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিও।"

বিজয। যে আজ্ঞা

ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন।

বিজয়সিংহ কমলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন—"কমলা আজি আমার কি আনন্দের দিন এ জীবনে যে বিধাতা আমার কপালে এত সুখ লিখিয়াছিলেন তাহা আমি একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

কমলা আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিল। বিজয়সিংহ তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কমলা বিজয় সিংহের স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তকের ভার ন্যস্ত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। বিজয়সিংহ তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

বিজয়সিংহ ও কমলা এইরূপ ভাবে অবস্থিত, এমত সময়ে কে গাহিল,—

হায় কোথা সে রতন্।
কোথা সে প্রাণের প্রাণ সে অমূল্য ধন!
কেন রে অবোধ মন, না বুঝে করিলি হেন,
কাঁদিবারে পরে দিলি সপিয়ে জীবন।
না না তারে নাহি পাব, হারায়েছি যে বিভব,
বেঁচে থাকা কি যাতনা বিনে সেই ধন।
উহু কি যাতনা প্রাণে, সহি সেই ধন বিনে,
আর নাহি সহে, গেল পুড়িয়া জীবন—
ওরে প্রাণ তবে কেন, সহিবি যাতনা হেন,
দেহ ত্যজে যানা চলে সে ধনের মতন।

কমলা ও বিজয়সিংহ গীতটী শ্রবণ মানসে উৎকর্ণ হইলেন, বোধহইল যেন গায়কের কণ্ঠটী তাঁহাদের পরিচিত।

গীত সমাপ্ত হইলে বিজয়সিংহ চমকিত হইয়া কহিলেন—"কে গাহিল, উদয় নাকি?"

এমত সময়ে উদয়সিংহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদয়ের মূর্ত্তি দেখিলে ভীত হইতে হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ সদা উর্দ্ধদৃষ্টি, ছিন্নবসনে অঙ্গ আচ্ছাদিত, দেহে ধুলি ও কর্দ্দম। উদয়ের অবস্থা দেখিয়া বিজয় সিংহের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া কহিলেন—"উদয় তোমার এ দশা কেন?"

উদয় হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল কহিল—"কেন?"

বিজয়। কেন কি উদয়, আজি কয়দিবস কোথায় ছিলে?

উদয়। অমিলার সন্ধানে।

বিজয়। অমিলা কোথায়?

উদয় গম্ভীর স্বরে কহিলেন "স্বর্গে"

বিজয়। স্বর্গে।

উদয়। হাঁ স্বর্গে, সে কেবল তোমার জন্য, তুমি তাকে ভালবাসতেনা বলে সে মল, কিন্তু বিজয় আমার দেখ।—

এই বলিয়া বক্ষে সজোরে আঘাত করিলেন।

বিজয় সিংহ উদয় সিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "ও কিও"

উদয়। আর কি প্রাণ যায় অমিলা—

বিজয়। অমিলা ত নাই, তবে তাহার জন্য এত কেন?

উদয়। আমি ত আছি।

বিজয়সিংহ কাঁদিতে লাগিলেন, উদয়সিংহ কহিলেন—"বিজয় কাঁদিতেছ কেন?—আমার অমিলার জন্য।" উদয় সিংহও কাঁদিলেন আবার কহিলেন "কমলা আমি চলিলাম, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি যে তুমি চিরসুখিনী হও। তুমি আজি যে অমূল্য হার কণ্ঠে পরিয়াছ তাহা অনেক তপস্যা-ব্যতীত মিলে না।

কমলা। আপনি কোথায় যাইবেন?

উদয় গম্ভীরভাবে কহিলেন "অমিলার সন্ধানে।"

কমলা কহিল—"সেকি আমি আপনাকে কোথাও যাইতে দিব না। দেশে চলুন, আপনি না থাকিলে আপনার রাজ্য কে দেখিবে?"

উদয়সিংহ হাসিয়া কহিলেন "কমলা তুমি বালিকা।"

কমলা। আপনাকে না দেখিলে আমরা বাঁচিব?

উদয়। অমিলা বিহনে আমি বাঁচিব?

কমলা। অমিলা ত পৃথিবীতে নাই।

উদয়। পাপ পৃথিবী কি অমিলার বাসের উপযুক্ত স্থান, অমিলা আমার হৃদয়ে। আমার হৃদয় সিংহাসনে অমিলা অক্ষয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। কমলা তুমি পিতৃ রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করগে।

উদয় সিংহ আবার হা! হা। হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বিজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"বিজয়—বিজয়

আমার অমিলা কই, ঐ আমার অমিলা ঐ আকাশে আমার প্রাণাধিকা অমিলা,—অমিলা দাড়াও দাড়াও আমি যাইতেছি, অমিলে অমিলে প্রাণেশ্বরী—

উদয়সিংহ তীব্রবেগে ছুটিল। বিজয় সিংহও তাহার পশ্চাতে—"উদয় কোথায় যাও কোথায় যাও," বলিয়া ধাবিত হইলেন কিন্তু ঘোর অন্ধকারে উদয় যে কোথায় গেলেন তাহার স্থির হইল না। বিজয় সিংহ আবার কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন ক্ষণেক পরে দূরে আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত স্বরে কে গাহিল—

ত্যজিয়ে প্রাণ ভুলিব যাতনা,
নতুবা সে বদন মনত ভুলে না,
ভীষণ বাডব মত,
জ্বলে প্রাণ অবিরত,
দহে মন সে যাতনা, প্রাণে আর সহেনা।
যারে চাহি হায় যদি,
পাই সেই প্রেমনিধি,
সাধিতে এ শুভ কাজ প্রাণ কি পারিবি না।

বিজয়সিংহ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"উদয় সিংহ,"

ঘোর বনে আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল—"উদয় সিংহ" কিন্তু কেহ উত্তর দিল না।

বিজয়সিংহ ও কমলা অনেকক্ষণ উদয়ের জন্য অশ্রু বর্ষণ করিলেন। পরদিন হইতে উদয় সিংহের অনেক অনুসন্ধান করা হইল কিন্তু কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই অবধি কেহ কোন দিন উদয় সিংহকে কোথাও দেখে নাই। উদয় সিংহের কেহ কোন সংবাদও দিতে পারে নাই।

বিজয়সিংহ ও কমলা সৈন্যবর্গ লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তথায় কিছু দিবস পরে মহা সমারোহের সহিত তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল। প্রজাবর্গ এ বিবাহে অসীম আনন্দ প্রকাশ করিল।

উদয় সিংহের রাজ্যও কিছু দিবস পরে বিজয় সিংহের রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তি হইল। বিজয়সিংহ ও কমলা উভয়রাজ্য অতিযশের সহিত শাসিত করিতে লাগিলেন এবং দম্পতিযুগল পরস্পরের প্রেমে পরস্পরে মুগ্ধ হইয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

অভ্যর্থনা।

অভ্যর্থনা প্রথা সকল দেশেই প্রচলিত। আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্বোধন বাক্য বা কোন প্রকার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া সমাদরে সম্মান বা কুশলাদি জিজ্ঞাসা রূপ অভ্যর্থনা সকল লোকই বা সকল জাতীই করিয়া থাকেন। তবে দেশ কাল ও সময় ভেদে অভ্যর্থনার তারতম্য বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজদিগের মধ্যে সেক-হ্যাণ্ডস্, টুপি খোলা, ও কপোল চুম্বন প্রভৃতি অভ্যর্থনা, সম্মাননা, সমাদর বা নমস্কার প্রথা চির প্রচলিত। বঙ্গে গুরুজনে প্রণিপাত সমবয়স্কে নমস্কার বা আলিঙ্গন ও বালক বালিকাদিগের মুখচুম্বন প্রথা প্রচলিত, তন্মধ্যে আজ কাল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, সেকহ্যাণ্ডস্, ঈষৎ হাসিয়া মস্তক সঙ্কোচন প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ধরনের নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় দুই সহস্রবর্ষ প্রাচীন "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক নাটকে দেখা যায় যে পুরূরবা ও উর্ব্বশী পরস্পরের হস্তধারণ করিরা নব্য বাবুদিগের ন্যায় "সেকহ্যাণ্ডস্" করিয়াছিলেন। এইটীতে "সেকহ্যাণ্ডস্" বুঝিবা পুরাণত্ব প্রাপ্ত হয়! যাহা হউক আমরা অদ্য ভিন্ন দেশবাসীগণের ভিন্ন ভিন্ন কৌতুকাবহ অভ্যর্থনা প্রথা উল্লেখ করিব। দেশ কাল ও ব্যবহার ভেদে

নমস্কার বা অভ্যর্থনা প্রথা ভিন্ন প্রকার হয়, সে বিভিন্নতার ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে কোন বিচার করিব না।

আমাদের দেশে গৃহ স্বামীনীকে "মা ঠাকুরণ" "গিন্নি" "গিন্নিমা" বা "কর্ত্রী" বলিলেই যথেষ্ট সম্মাননা করা হয়, ও সভ্যতা রক্ষা হয় কিন্তু সায়ামে তৎপরিবর্ত্তে "তরুণ পুষ্প" "তরুণ স্বর্ণ" বা "তরুণ হীরক" প্রভৃতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তদ্দেশীয় রমণীগণের তরুণী হইবার স্পৃহা বড় বলবতী, সকলেই তরুণত্বের জন্য পাগলিনী। কোন অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিতে হইলেও পুনঃ পুনঃ তরুণী শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় নতুবা সায়ামের কুললক্ষ্মীগণের মান রক্ষা হয় না, তাহাদের কোমল মনের তুষ্টিসাধনা করা হয় না। মুখের কথা প্রকাশ করিলে অনেককেই পাগল সাজিতে হয়, নতুবা বঙ্গেও ঐরূপ তরুণী শব্দ প্রার্থিনী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত ন্যূন নহে।

কাফ্রীরা পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাতে সুপুরুৎঠে মৃদু হাসি প্রকাশ করিয়া মধ্যাঙ্গুলি দ্বারা তিনবার তুড়ি দিয়া সমাদর কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদের মধ্যে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রথা প্রচলিত নাই। গীনী প্রদেশীয়েরা রমণীগণকে সমাদর করিতে হইলে তাহাদের দক্ষিণ হস্ত আঘ্রাণ করে।

আমাদের দেশে যেমন সাক্ষ্যাতান্তর "সুপ্রভাত" প্রভৃতি বাক্য প্রচলিত আছে, সেইরূপ ওলন্দাজদিগের পক্ষে "অদ্য যেন উত্তম ক্ষুধা হয়।" আমরা বলি এ কথা মন্দ নয় যদি অপর পক্ষ হইতে সেই সঙ্গে আহারের উত্তম বন্দোবস্তের কথা প্রকাশ পায়

কেরোধাসীদিগের ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া এক প্রকার মারাত্মক পীড়া উপস্থিত হয়, সেই নিমিত্ত তাহারা "সুঘর্ম্ম হউক" বলিয়া সম্ভাষণ করে।

ফিলিপাইন দ্বীপাধিবাসীগণ অভ্যর্থনা কালে পরস্পরে নত হইয়া হস্তদ্বারা আপনাপন চীবুক স্পর্শ করে, এবং বামপদ পশ্চাদ্দিকে লম্বমান করিয়া দেয়। কিন্তু ইথিওপীয়েরা এ ব্যবহার অতি ঘৃণার্হ বিবেচনা করে, তাহারা অভ্যর্থনা কালে পরস্পরের বসন পরস্পরে কোটিদেশে

বিজড়িত করে, আমরা জিজ্ঞাসা করি যে স্ত্রী পুরুষে অভ্যর্থনা কালেও কি এই রূপ সুরুচিকর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে?

জাপানীরা সামান্য সমাদর কালে কেবল আপনাপন পাদুকা খুলিয়া ফেলে, কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তির মানরক্ষা করিতে হইলে সম্মুখে প্রণত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হয়। সমাদৃত ব্যক্তিকে পশ্চাৎ দেশ সন্দর্শন করাইয়া মান রক্ষা করা মন্দ প্রথা নয়।

চীনেদিগের আবার সতন্ত্র প্রকার, তাহাদের রাজার অধীনে একটী সভা আছে, তাহার সভ্যগণ কাহাকে কিরূপ সম্মান করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে। অর্থাৎ কাহাকে দেখিয়া কে কতবার গাত্রোত্থান করিবে, স্বামী স্ত্রীকে কিরূপে সমাদর করিবে, স্ত্রী স্বামীকে কিরূপে সম্মাননা করিবে, পিতা পুত্রকে কয়বার অভিবাদন করিবে, পুত্র পিতাকে কিরূপে হাস্যরসোদ্দীপক অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে প্রণাম করিবে সেই সমস্ত উক্তসভা নির্দ্দেশ করিয়াদেন। একটী নূতন প্রথা প্রচলিত হইলে সকলকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয় অন্যথায় বিধিমতে দণ্ডাহ হইয়া থাকে। চীনদেশীয়দিগের পরিচ্ছদ ও বসনের সহিত সমাদরের তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ যদ্যপি সময়োচিত বাস—অর্থাৎ প্রত্যূষের বসন সায়াহ্নে পরিহিত না হয়—সূক্ষ্ম ভ্রূ (ভ্রূ সলাকাদ্বারা উত্তোলিত করিয়া একটী রেখামাত্র রাখা হয়) ছাতা পড়া দাত—(চীনেরা বেশ পরিস্কার শ্বেত দন্ত ভাল বাসে না) রমণীগণের ক্ষুদ্র পদ—(শৈশবাবস্থা হইতে কাষ্ঠ পাদুকা পরাইয়া পা ছোট করা হয়)—এবং পুরুষদিগের সুন্দর বেণী—বেণীগুলি নিতান্ত ছোট নয়, জন্তুদিগের সাধারণতঃ যে স্থান হইতে লাঙ্গুল বহির্গত হয় ততদূর পর্য্যন্ত বিলম্বী—এ সমস্তের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে তবে সে সমস্ত সভ্য লোকদিগের সহিত বিশেষ সমাদর রক্ষা করাই সভ্য চীনের রীতি।

চুম্বন প্রথা চিরপ্রচলিত। বোধহয় যে দিন ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে সেই দিন হইতে চুম্বন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চুম্বন প্রায়সঃ স্নেহ, প্রেম, সৌহার্দ্দ বা সমাদর জ্ঞাপক। এই চুম্বন প্রথা এখনও ভূমণ্ডলের অনেক প্রদেশে রহিয়াছে। পূর্ব্বে রোমানদিগের রাজ্যকালে, মধ্যবিত্ত কর্ত্তৃক রাজা বা বিচারককে চুম্বন প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে তৎপরিবর্ত্তে আপন

হস্ত চুম্বন প্রবর্ত্তিত হয়। হস্ত চুম্বন, চরণ চুম্বন, ও বস্ত্র চুম্বন অদ্যাপি অনেক স্থলে আছে। আমাদের দেশে এখনও গুরুর পদচুম্বন প্রথা আছে, বালক বালিকাগণের মুখচুম্বন করা হয়। পুত্র বয়স্ক হইলে মাতা তাহার চিবুক স্পর্শকরতঃ চুম্বন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডেও চুম্বন প্রথা বেশ প্রচলিত। বয়স্কা কন্যা ভগিনী প্রভৃতি পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক চুম্বিত হয়েন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মহাসভায় কোন সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত বা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিদায় গ্রহণ কালিন মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের স্বদেশীয় ব্রাহ্মধর্ম্মযাজক কেশব বাবু নাকি মহারাণীর হস্তচুম্বন রূপ মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলেন।

বাইবেলে লিখিত আছে যে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদিকে প্রণাম করিতে হইলে হস্ত চুম্বন করিত। রোমানদিগের সময়ে কেহ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হস্তচুম্বন না করিলে সে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইত।

গ্রীকদিগের মধ্যে চুম্বন প্রথা প্রার্থনা জ্ঞাপক ছিল (কর্ম্মার্থী বাঙ্গালি যেন তাই বলিয়া কর্ম্ম প্রার্থনায় বিবিদের হস্ত চুম্বন না করেন।) মহাকবি হোমর লিখিয়াছেন যে হেক্টরের দেহপ্রাপ্তি আশায় তাঁহার পিতা অকেলিসের হস্তচুম্বন করিয়াছিলেন। রোমানদিগের মধ্যে কিছুকালের জন্য প্রার্থনার্থে চুম্বন করা রীতি ছিল। আমাদের দেশেই কি নাই ?

কিন্তু চুম্বন প্রথায় রুষিয়া সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে, পিতা পুত্রে আত্মীয় স্বজনে চুম্বনের ছড়াছড়ি, ভ্রাতা স্নেহ নিদর্শন জ্ঞাপন করিতে ভগিনীর মুখচুম্বন করে, আবার ভগিনী তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে তাহার বিনিময় দিয়া জমা খরচ ঠিক রাখে, এরূপ কৈফিয়াৎ মিল বুঝি আর কোথাও নাই। রাজা প্রধান অমাত্যকে চুম্বন করেন, প্রধান অমাত্য আবার তাঁহার নিচের লোককে চুম্বন করেন। বৃদ্ধ শ্বেতশ্মশ্রু সেনানী তাহার নিম্নস্থ সেনানীকে চুম্বন করে, সেই শ্বেতশ্মশ্রু শ্মশ্রুতে জড়াজড়ি দেখিতে যত না হউক আবার যখন সেই শুভ্রশ্মশ্রুরাশি অপর নিম্নস্থ সৈনিকের সযৌবনা দুহিতাকে চুম্বন কালে তাহার শরদিন্দুবিনিন্দিত, মধুময় বদনপ্রান্তে শোভা পায় তখন কি বাহার। আজকাল রমণীগণকে চুম্বন করা প্রথা কিছু হ্রাস

হওয়াতেই নিহিলিষ্টগণের এই অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে নাকি? হই-তেই পারে এত স্থলভমূল্যে এরূপ উপাদেয় বস্তু আর কোথায় বিক্রয় হয়?

গৃহস্বামিনীর যতবার পুত্র কন্যা বা পৌত্র পৌত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় ততবার চুম্বন করিতে হয়। পাছে ভ্রম হয় এই আশঙ্কায় আবার দুই-বার করিয়া চুম্বন করা রীতি আছে। গৃহস্বামিনীর আর এ ব্যাপার হইতে অবকাশ নাই। যদি পরিবারের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে অন্ততঃ ৫।৬ শতবার চুম্বন না করিলে আর তাঁহার দিন যায় না। কোন পার্ব্বণ উপস্থিত হইলে গৃহ স্বামিনী দাস দাসীগণের মুখচুম্বন করিয়া থাকেন, কোন দাস যদ্যপি অত্যন্ত দীর্ঘকায় হয় তাহা হইলে গৃহস্বামিনী চৌকিতে উঠিয়া তাহার শ্রীমুখ চুম্বন করেন, এত আদর এত সোহাগেও যদি দাস গৃহস্বামিনী গত প্রাণ না হইবে তবে আর কিসে হইবে!।

এক প্রাণতা।

—•:○—

এক প্রাণতাই মানবগণের জীবনীশক্তি, যে জাতি একপ্রাণতা বুঝে যে জাতি এক প্রাণতায় প্রাণ মন উৎসর্গ, করিয়াছে সে জাতি জাতিমধ্যে গণ্য. সেই জাতিই একাগ্রতা বা অধ্যবসায় প্রভাবে জগতমধ্যে মান্য গণ্য হইয়া উঠে। সেই জাতিই ধন্য যাহাদের একপ্রাণতা আছে, সেই জাতিই ধন্য যাহাদের একপ্রাণতাই জীবন।

এই একপ্রাণতা ইংরাজ মধ্যে বিরাজমান বলিয়াই আজি ইংরাজ ভারত ঈশ্বর, আবার এই একপ্রাণতা অভাবেই ভারত যবন পদানত হইয়াছিল। একপ্রাণতা আমেরিকানদিগের বীজমন্ত্র বলিয়া এমেরিকা স্বাধীন, এমে-রিকা দেশপূজ্য। এই মানব হৃদয়ের জ্বলন্ত সহানুভূতি প্রভাবে নিহি লিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে রুষিয় সম্রাট বিকম্পিত, রুষের একেশ্বর প্রভুতা বিস্মৃত হইয়া প্রাণভয়ে আকুল! সাইবিরিয়ার প্রাণহরি শৈত্য ও জীবন সঙ্কুল

স্থানের বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া কোমলাঙ্গি রমণীগণ পর্য্যন্ত নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, রমনীগণ পর্য্যন্ত স্বীয প্রাকৃতিক কোমলতাকে উপেক্ষা করিয়া কাঠিন্য আশ্রয় করিয়াছে, স্বদেশের স্বজাতির উন্নতি কামনায়, অত্যাচারী রাজার প্রভূত্ব ন্যূন কামনায বদ্ধপরিকর হইয়া আপন অমূল্য জীবনের মমতা বিস্মৃত হইয়াছে, স্বদেশের স্বজাতির উন্নতি কল্পে বদ্ধ পরিকর হইযা স্বামী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয স্বজনের স্নেহ মমতা হৃদয হইতে দূরে স্থাপিত করিযাছে। ধন্য রমণী। ধন্য রুষ ধন্য তোমাদের একপ্রাণতা। আবার এদিকে আযারিশগণ আপন পণ বজায রাখিতে উন্মত্ত। মাভৈ মাভৈ রবে দেশ বিকম্পিত করিতেছে, তাহাদের দৃঢ়পন অধ্যবসায যত্ন ও একপ্রাণতার এক একটী কার্য্য স্মৃতিপথে আবির্ভাব হইলে শরীর কণ্টকিত হয। বাঙ্গালি, ইহা ব্যতীত তোমার আর কি হইবে?

বাঙ্গালি, তুমি জ্ঞান বুদ্ধি পরিচালনায জগতে বিজয়কেতু উড্ডীন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইযাছ, কিন্তু এক প্রাণতা শিক্ষা করিতে কেন উদ্যত হওনা ভাই? মানসিক সুখসাধনে যত্নপর হইযাছ, কিন্তু সামাজিক সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি সাধনে কেন উদাস? যে দিন তোমরা এই দিব্য এক প্রাণতা শিক্ষা করিবে, সেদিন তোমাদের সুখরবি উদিত হইবে, সেদিন তোমাদের মুখে স্বর্গীয রশ্মি প্রতিভাত হইবে, সেদিন রাজা তোমাদের পক্ষ হইবেন, সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ভযে সামান্য স্বার্থপর ইংরাজের ভ্রূকুঞ্চনে আর তোমাদের কম্পিত হইতে হইবে না। আপনা আপনি সংসারের সুখ বৃদ্ধি পাইবে আপনা আপনি জগতে গণ্য মান্য হইযা উঠিবে। বাঙ্গালির কাপুরুষত্ব ভারতললাট হইতে অপসৃত হইবে।

এখনও অধিকাংশ পল্লীনিবাসীগণ পাষণ্ড জমীদারের অসহ্য উৎপীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করে, তথাপি অনাথ সহায রাজদ্বারের সহাযতা গ্রহণে অক্ষম, অনেক অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীর পীড়ন সহ্য করে, তথাপি তাহার প্রতিবিধানে যত্নপর হয় না। তাহার স্থানান্তর গমন বাসনা করে, তথাপি সেই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে যত্নপর হয় না; একের স্কন্ধ হইতে অপরের স্কন্ধে যাইলেই তাহারা পরিতৃপ্ত, কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়ের গোচর করিয়া

যাহাতে সে অপর স্কন্ধে আর পূর্ব্বভাবে না যায় তাহার চেষ্টা করে না, তাই বলি বাঙ্গালির একপ্রাণতা নাই, বাঙ্গালির হিতাহিত জ্ঞান নাই, আত্মপর বিবেচনা নাই।

ভারতে যখন একপ্রাণতা ছিল তখন ভারত দেশপূজ্যও ছিল, কিন্তু সে একপ্রাণতাও গিয়াছে ভারতের পূর্ব্বনাম, যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই ঘোর অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভাই বাঙ্গালি তোমরা সেই আর্য্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দাও কিন্তু তোমাদের আর্য্যকীর্ত্তি কোথায়? সে একপ্রাণতা কোথায়? সে মনুষ্যত্ব সে জ্ঞান সে মনোভাব সে সমস্ত কোথায়?

একপ্রাণতা বাঙ্গালির নাই—আজ নয় অনেক দিন হইতে নাই, কিন্তু আর চলেনা, একপ্রাণতা অভাবে মনুষ্য পশু, বল থাকিতেও বলহীন, জ্ঞান সত্বেও জ্ঞান হীন। দেখ তৃণসমষ্ঠী রজ্জুতে পরিণত হয়, আবার সেই রজ্জু মত্ত হস্তিকে বদ্ধ করে, ক্ষুদ্র বারিকণা একটী শুষ্ক তৃণকেও স্থানান্তরিত করিতে পারে না, কিন্তু বারিকণা সমূহ একত্রিত হইয়া প্রবল বেগধারণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহাই একপ্রাণতার ফল, ইহাই এক প্রাণতার গুণ, বাঙ্গালি! এ অলোক সামান্য একপ্রাণতা কি তোমাদের তুচ্ছ পদার্থ? এই সমাজের কীর্ত্তি দণ্ড আশ্রয় করিতে কি তোমরা মন প্রাণ উৎসর্গ করিবে না?

—আজ হউক, কাল হউক, বাঙ্গালী যখন শিক্ষার গৌরব বুঝিয়াছে, যখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে, সভ্যতা সভ্যতা করিয়া চীৎকার করিতে উৎসুক, তখন যে সে বাঙ্গালি একপ্রাণতা শিক্ষা করিবেনা ইহা সম্ভবপর নহে। এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে বুঝি বাঙ্গালীর এক প্রাণতার বীজাঙ্কুরিত হইল। শুভক্ষণে ইডেন বঙ্গেশ্বর হইয়া ছিলেন, শুভক্ষণে ইলবার্ট বিলের পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল। আবার বলি শুভক্ষণে দাম্ভিক বারিষ্টার ব্রান্সন তাহার প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। বলিতেকি ইহাই বঙ্গের একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান সূত্র। যে দিন হইতে ব্রান্সন আর কোন বাঙ্গালির মর্য্যাদা পাইলনা সেই দিন বুঝিলাম যে বাঙ্গালিদের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, বাঙ্গালির মানুষ হইবার ইচ্ছা বলবতী

হইয়াছে। তাহার পরেই বিচারেশ নরিশ সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস আজ্ঞা-দিলেন যে তুষমধ্যে ইলবার্ট বিল উপলক্ষে কণা মাত্র অগ্নি প্রবেশ করিয়া ছিল, তাহা অল্লজ্বলিয়া উঠিল। এই রূপে ভবিষ্যৎ উত্তেজনায় যে তাহা আবার জ্বলিবে এ আশা করি, ইহাতে আর কিছু না হউক বাঙ্গালি আপনার সুখ আপনি ক্রয় করিতে পারিবে, এই মাত্র নম্র আশা আমাদের হৃদয় মধ্যে স্থান পায়, যাহাই হউক সুরেন্দ্র বাবুর গোলযোগে স্কুলের ছাত্রেরা যে রূপ জ্বলন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে তাহা নির্জ্জীব বাঙ্গালির পক্ষে গৌরবের বিষয় বটে, আমরা ভবিষ্যতে বাঙ্গালির সন্তানদের মধ্যে সমধিক মানব হৃদয়ের চিহ্ন দেখিব এ আশা আছে, ইহাই যথেষ্ট।

সমাজ—রহস্য।

বঙ্গীয় বিবাহে কন্যা-ভার।

আজি কালি পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুত্থানের সঙ্গে বঙ্গে নানাবিষয়ের উন্ননি লক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালির রুচি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, বাঙ্গালি বেশ বিন্যাসে আহার বিহারে পরিপাট্য চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাত যাইয়া সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা করিতেছেন; বাঙ্গালি দান্তে, কোমৎ, ডারউযিন, মিল প্রভৃতি বৈদেশিক সমাজতত্ত্বজ্ঞদিগের রহস্যভেদ করিতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালি স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বাধীন মনের পরিচয় দিতেছেন, বাঙ্গালি ফৌজদারি কার্য্যবিধি বিধিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত গগণভেদি তারস্বরে গলাবাজী করিয়া অদূরদর্শী স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গীদলের সহিত বাক্ যুদ্ধ করিতে পারিতেছেন, বাঙ্গালি ন্যায়ের কূট তর্ক আবিষ্কার করিতে শিখিয়াছেন, সংক্ষেপে বাঙ্গালি বাহ্যজগতের সকল বিষয় লইয়াই উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগের বিষয় বাঙ্গালি অদ্যাপি আপন গৃহের দোষ-গুণ বিচারে সক্ষম হয়েন

নাই, সামাজিক কুপ্রথা সকল এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালির গৃহ, বাঙ্গালির সমাজ, দুরপণেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালি বাহ্যিক আড়ম্বর লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, পরকীয় দোষ অনুসন্ধানে লঘুহস্ত, কিন্তু নিজের মহদ্দোষেও একেবারে দৃষ্টি শূন্য। সম্প্রতি, 'আদরিণী'র মধ্যে বাঙ্গালির এইরূপ সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। বিহারী বাবু ও ভগবতী বাবু স্বজাতির এইরূপ সামাজিক আচারগত দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের আলোচিত বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না, কেবল "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" এই অমোঘ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ পূর্ব্বক আমাদিগের সমাজ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথার অবতারণা করিতে চাহি।

বঙ্গে, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে, বিবাহ পদ্ধতি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কৌলিন্য প্রথার কথা বলিতেছি না, আমরা বহুবিবাহের কথা উত্থাপন করিতেছি না, আমরা বিধবা বিবাহের কথাও উল্লেখ করিতেছি না। ভাল হউক, মন্দ হউক, বল্লাল সেন দেবীবর ঘটক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সম্পন্ন প্রতিভাশালী মহোদয়গণ যে সকল বিষয়ের আন্দোলন করিয়া বঙ্গভূমে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ও রাখিতেছেন, সেই সমস্ত মহদ্বিষয়ের কূটতর্কে আমাদিগের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা বলি—বঙ্গীয় বিবাহে কন্যাভারের কথা। কত লোক কত কথার আলোচনা করেন, কত উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে লব্ধযত্ন হয়েন, কিন্তু এ পোড়া কথা কেহ ভ্রমেও ভাবেন না, কথা উত্থাপন করিলে কেহ তাহাতে একবার কর্ণপাতও করেন না; অথচ, এই কন্যা ভার গ্রস্ত হইয়া অনেকে একেবারে হতসর্ব্বস্ব হইতেছেন, সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে গিয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বৈবাহিকের উদর-পূর্ত্তি করিতেছেন, আপন অন্নের সংস্থান রাখিতেছেন না। এ পোড়া প্রথার কে সৃষ্টি করিল, এই সর্ব্বনাশক ব্যবস্থা বঙ্গের কোথা হইতে কে বিধিবদ্ধ করিল, তাহা খুঁজিয়া পাই না, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

প্রথমতঃ বঙ্গের প্রভূত অর্থসম্পন্ন সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যেই এই আদান প্রদানের কুপ্রথা সমধিক প্রবর্ত্তিত হয় ;—(তাঁহাদিগের অক্ষয় ভাণ্ডার অগাধ সমুদ্র, কন্যার জন্য দুই এক ঘটি জল ব্যয় করিলে বড় অধিক আসে যায় না !) কিন্তু ক্রমশঃ এই রোগ (রোগ ভিন্ন আর কি বলিব ?) সংক্রামক হইয়া দাড়াইয়াছে—ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যেই উহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে , রোগের একপ মোহিনী শক্তি যে, রোগ সুচিকিৎস্য জানিয়াও কেহ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন না, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কেহ যত্ন করেন না।

কন্যা ভার ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই আছে,—শুদ্ধ ভারত কেন ?—পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতিই ত এই দুরপনেয় কন্যা ভার-গ্রস্ত ; কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে, তাহাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সকল পিতা-মাতা, সকল গুরুজন, সকল অভিভাবকই ত ব্যতিব্যস্ত। তবে বঙ্গে কন্যা ভার এত ভয়াবহ কেন ?—কেবল কন্যার বিবাহে বৈবাহিকের উদর-পূর্ত্তির অর্থ সঙ্গনের জন্য। নিজ নিজ কন্যার বিবাহে সকলকেই এই দুর্নিবার কষ্টে পতিত হইতে হয়, সকলকেই এই প্রবল দুশ্চিন্তার অধীন হইতে হয় , কিন্তু, তথাপি পুত্রের বিবাহের সময় কেহই সেই ঘৃণাহ অর্থলিপ্সা পরিহার করিতে পারেন না ,—সেই "সোণার বৃসকাঠি।" সেই "অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রূপবতী রাজকন্যার দাওয়া করিতে কুণ্ঠিত হন না। একি সামান্য পরিতাপ, একি সামান্য কলঙ্ক, একি সামান্য ঘৃণার বিষয়।"

পুত্রের বিবাহ, আজি কালি, এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে—সভ্য সমাজে অর্থোপার্জ্জনের এক প্রকার পরিমার্জ্জিত উপায় হইয়া উঠিয়াছে। পুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণীর যেরূপ আনন্দ, যেরূপ উৎসাহ, এমন আর কিছুতেই হয় না। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার আশার সঞ্চার হয়,—তাহার বিদ্যানুশীলনের উন্নতি দর্শনে উৎসাহ-স্রোত প্রবল হয়,—আবার যদি "ছেলে পাশকরা" হয়, তবে আর পুত্র প্রসবিনীর আহ্লাদের ইয়ত্বা থাকে না। তিনি তখন মনুষ্যকে তৃণজ্ঞান করেন, ধরাকে "সরাখান" দেখেন, আর পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত করাল বদনা ভীমা মূর্ত্তিতে কন্যা-

কর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করেন!—দুঃখিনী কন্যা-প্রসবিনীর সুখের লেশমাত্র নাই; কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার উদরে অন্ন যায় না, স্বামী ও আত্মীয় গুরুজনের গঞ্জনাতে অহর্নিশ অস্থির হইতে হয়। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা যদি কিছু ঋণগ্রস্ত হন, পুত্রের বিবাহ দিয়া (পুত্র ডিগ্রী বেচিয়া, মাথায় সামলা চড়াইয়া ত সে ঋণ শোধ করিতে পারিবেন না।) সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, উপরন্তে "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যং" সংস্থান করিবেন, বলিয়া তিনি সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য কন্যাকর্ত্তা আযৌবন এদেশ ওদেশ করিয়া, শ্বেতাঙ্গ-মূর্ত্তির পদ লেহন করিয়া, কত কষ্ট কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, দুঃখে শাকান্নে উদর-পূর্ত্তি করিয়া, যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক কন্যা পার করিতে সে সমস্ত জলাঞ্জলি দিলেন। এই কারণেই এই অপরিহার্য্য কন্যা সম্প্রদানের দুর্ব্বহ ভারের জন্যই, বঙ্গদেশে পুত্র কন্যার আদরের এত তারতম্য, কন্যার প্রতি এত অশ্রদ্ধা, এত অযত্ন, কন্যার জ্ঞানোন্নতির দিকে পিতামাতার এত অমনোযোগ।

সামাজিক উন্নতির পথের এই কণ্টক অপসারিত করেন, এই কলঙ্কময় কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করেন, বঙ্গে এমন লোক কি কেহ নাই?—এই মহৎব্রত সাধনের কি কোন মঙ্গলকর উপায় নাই? সুশিক্ষিত সভ্য সমাজে এই ঘৃণোদ্দীপক প্রথা প্রবল থাকা, এই অদ্ভুত ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া বড়ই লজ্জাকর, বড়ই দুঃখের বিষয়। অর্থের লোভে জ্ঞান-বিরহিত অব্রাহ্মণ-দিগের কন্যা-বিক্রয় বরং শোভা পাইত, অপরিণামদর্শী নিরক্ষর কৌলীন্য মদ-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদিগের বহু-বিবাহ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন বরং ভাল দেখাইত, কিন্তু এখন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালির সামাজিক উন্নতির সময়, এই জঘন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন কোনমতে শোভা পায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, বাঙ্গালি কখন যে উন্নত জীবন লাভ করিবেন একপ আশা মনোমধ্যে স্থান পায় না। তাই বঙ্গবাসি! আমরা তাই বলি, অগ্রে আপন সমাজের প্রতি লক্ষ্য কর, আপন দোষ গুণ বিচারে সক্ষম হও, আপন উন্নতির পথ পরিষ্কার কর, পরে পরকীয় দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও, পরের আচার ব্যবহার লইয়া

বাগ্‌জাল বিস্তার করিও আর পার ত শূন্যকণ্ঠে স্বাধীনতার শৃঙ্গ দেশে দেশে বাজাইয়া বেড়াইও। সামান্য কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য যেরূপ বিরাট সভার অধিবেশন কর, সেরূপ বাহ্যাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই;—আপন আপন দুর্ব্বহ কন্যা-ভার গ্রস্ত জীবনের নিদারুণ সময়টুকু স্মরণ কর, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর, ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া প্রতিশ্রুত হও, এরূপ অহিতকর পুত্র বিবাহ রূপ ব্যবসায়ে আর কখন হস্তক্ষেপ করিবে না। একটী সরলতাময়ী সৎপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া পুত্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ কর, কন্যার পিতামাতা অকাতরে যাহা যৌতুকস্বরূপ দিতে পারেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হও, অনর্থকর বহুল অর্থের লোভ করিও না, তাহা হইলে, সংসারের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইবে, বঙ্গভূমির মঙ্গল হইবে, দুঃখিনী ভারত-মাতার তমোময় ভাগ্যাকাশের একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সুখ তারার উদয় হইবে।!!

পা—ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ফুলেরসাজি। শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট করপ্রেসে শ্রীঅধরনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

এ খানি গীতিকাব্য, গ্রন্থকার এ পুস্তক খানি প্রিয়তমাকে উপহার দিয়াছেন, সুতরাং বোধ হয় গীতিখানি গ্রন্থকারের আদরের ধন।

গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন "বর্ত্তমান লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অনেকস্থলে পদ্য অপেক্ষা গদ্য কবিতার উপযোগী, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস বলিয়া ঘড়ি নামে একটী গদ্য কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।"

আমরা স্বীকার করি যে বঙ্কিম বাবু তাঁহার কবিতা পুস্তকে "মেঘ" "জল" ইত্যাদি তিনটি উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতা লিখিয়াছেন, কুঞ্জবাবু ঘড়ি নামক গদ্য কবিতা লিখিয়া হাস্যাস্পদ ব্যতীত বিন্দুমাত্র অনুকরণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আমাদের মত "অবনতি" বা, পবিত্র সাগরে বহে পাপের তরঙ্গ নামক পদ্যটি না লিখিয়া বঙ্কিম বাবুর অধঃপতন সঙ্গীতটি তুলিয়া দিলেই ভাল হইত, ইহার আগা গোড়া অধঃপতন সঙ্গীতের অনুকরণে লিখিত।

"রাসলীলা" কবিতা পুস্তকের, আকবরসাহের খোস রোজের, অনুকরণে লিখিত আমরা দুইটি পুস্তক হইতে পাঠকগণের বিশেষ অবগতির জন্য দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কবিতা পুস্তক———

ফুলের তোরণ, ফুল আবরা,
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা,
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা।

ফুলের সাজি———

ফুল ছড়াইয়ে, ফুল বিছাইয়ে,
নাচিছে যতেক গোপিনী কুল।
ফুলের বাতাস, ফুলের সুবাস,
ফুলের খোপায় গোলাপফুল।
ফুলের যমুনা, ফুলের বিছানা,
ফুলের বালিশ ফুলের ডালা।
ফুলের বাসর, ফুলের চামর,
ফুলের বাগানে ফুলের মালা।
ফুলের কলিকা, ফুলের মালিকা,
ফুলের যুথিকা গোপের নারী।
ফুলের বাসেতে, ফুলের বাসেতে,
নাচিছে কেমন ফুলের ঝারি॥

এইরূপ সর্ব্বত্র।—যাহাই হউক আমরা "ফুলের সাজি" সম্বন্ধে আর

অধিক কিছু বলিতে চাহি না। কুঞ্জবাবুর এ রূপ অনুকরণের জঘন্য প্রবৃত্তিকে আমরা কোন ক্রমেই প্রশংসা করিতে পারিনা। আশাকরি কুঞ্জবাবু ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন। নতুবা এরূপ অনুকরণে তাঁহারও কোন ফল নাই, আমাদেরও সমালোচনা করিতে যাতনা ব্যতীত সুখ নাই।

কমলে কামিনী। বা ফুলেশ্বরী "নাট্যরাসক" বঙ্গ রঙ্গ ভূমির অভিনয়ার্থে শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা।

যে কমলে কামিনী কবিকঙ্কন চণ্ডি তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনি মুখ হইতে অমৃত ধারায় বাহির করিয়াছেন, আজি সেই কমলে কামিনী বঙ্গ রঙ্গ ভূমির অভিনয়ার্থে রাধানাথ বাবু নাট্যরাসক রূপে রচনা করিয়াছেন। রাসক খানিতে বিশেষ কোন গুণপনা লক্ষিত হইলনা, একটী মাত্র গীত ভাল লাগিল, তদ্ব্যতীত অপরগুলি তত ভাল লাগিল না।

হরবিলাপ। বা দক্ষযজ্ঞ শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। করপ্রেস কলিকাতা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভেই বঙ্গ ভূমির সঙ্গীতাধ্যাপককে নানা কথা বলিয়াছেন, কমলে কামিনীতে গ্রন্থকার বঙ্গ রঙ্গ ভূমির সঙ্গিতাধ্যাপক কমলেকামিনী সুরলয়ে গ্রথিত করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছেন, কিন্তু আবার এখানিতে এত কথা কেন বলিলেন ?, তাঁহার "কমলে কামিনী" বঙ্গ রঙ্গ ভূমিতে অভিনয় হয় নাই বলিয়া নাকি ?

স্বপনসঙ্গীত। গীতিকাব্য। শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা।

লেখার ভাবে বোধহয় নগেন্দ্র বাবু বিহারী বাবুর চেলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি বিহারী বাবুর কাব্যের সরস ভাগ অনুকরণ করিতে বিস্মৃত হইয়া নিরস ভাগটী বেশ আয়ত্ত্বাধীনে আনিয়াছেন।

দিন গেল।

—•:•—

ফাল্গুনী দিবা অবসান—আকাশ নির্মেঘ নির্ম্মল, এক খানি নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় পৃথিবীবাসীর মস্তকের উপর তক্ তক্ করিতেছে, তাহাতে যেন গলিত সুবর্ণ ঢালা বসন্তের সূর্য্য পশ্চিমাকাশের সর্ব্ব নিম্নে এক খানি আগুণের থালের ন্যায় দপ্ দপ্ করিতেছে। পৃথিবীতে রোদ্র নাই, গাছে নাই, পাতায় নাই, কেবল অট্টালিকা শিরে তরুণীর মধুর হাসির ন্যায়, রৌদ্র নয়, রৌদ্রের আদর্শ টুকু দিপ্ দিপ্ করিতেছে, যেদিকে চাই শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতি নয়নে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতেছে, বসন্তের নবীন কিশলয়ে বিটপী অঙ্গআটা—মুকুলে তরুশির সুবর্ণময়। মেদুর মলয় মারুতে গাছের পাতা, নদীর জল কাঁপাইয়া শরীর শিহরাইতেছে। এই সুখের বসন্তে, সুখের সন্ধ্যায় রূপনারায়ণের সবুজ কিনারায় বেড়া ইতে বেড়াইতে বসন্ত পবন ক্রীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের নাচুনীকুঁদুনী দেখিতে ছিলাম, দূরে পল্লীবৃক্ষে সজোরে পাপিয়া ঝঙ্কার দিল, কোকিল কুহরিল, মন একেবারে পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল; কি এক অনির্ব্বচনিয় অনন্ত ভাবে বিভোর হইয়া ভুলিয়া গেল—পৃথিবী ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার ছাড়িয়া, সংসারের মায়া মোহ ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া, কে জানে কোথায় চলিয়া গেল, বলিতে পারিনা। তাহার পর ক্ষণেই কি দীর্ঘ-কাল পরে, কেমন করিয়া বলিব, কাণে একটা শব্দ বাজিল "দিন গেল।" এই শব্দে আমার চট্‌কা ভাঙ্গিল যেন ঘুমের ঘোরে ছিলাম, সেই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল, মন কোথায় ছিল, কোথা হইতে যেন আমাতে ফিরিয়া আসিল, পুনরায় শুনি যে "দিনগেল"—চাহিয়া দেখিলামএকটী গোপবালা রাখালকে ঐ কথা ঐ মন উদাসী সৃষ্টিছাড়া কথা বলিতেছে, আর রাখাল "ঘরে যাই বেলানাই দিনগেল, মাঠে আসিয়া কাজ হলোনা, ঘরের কাজ পড়ে রহিলো, দিন গেল, চল আমরা গোরু নিয়ে ঘরে যাই" বলিতেছে। আমার মনে প্রতি ধ্বনি হইল "দিন গেল।" সেই শব্দ আমার মনের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে

কূলে লাগিয়া ঘাত প্রতিঘাতে বাজিয়া উঠিল "দিন গেল।" গোপাঙ্গনার কথা "দিনগেল," বেলা, "রাখাল" "কাজ," "ঘুর" ভাবিলাম একে একে সবই আসিল, সবই চলিয়া গেল, চারিদিক্ চাহিলা দেখিলাম বাস্তবিকই দিন গেল, রাত্রি আসিল, আকাশে সূর্য্য নাই, পৃথিবীতে আলোক নাই। অন্ধকার তাহার বিষাদময়ী মূর্ত্তি লইয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতেছে। শরীর কাঁপিয়া উঠিল—কি দায়—কি প্রমাদ। কেন বেড়াইতে আসিলাম—কেন গোপবালার কথা কাণে আসিল—জনস্থানে বেশ ছিলাম—দশজনের সঙ্গে কথা বার্ত্তায়, আমোদ প্রমোদে জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়াছিলাম, কেন নিভৃতে আসিলাম। না আসিলেই হইত, আসিয়া ভাল করি নাই। গোপবালা কি সর্ব্বনাশের কথা শুনাইল, বাস্তবিকই ত দিন গেল। কালরাত্রি নিকট, জীবন সন্ধ্যা উপস্থিত। গোয়ালিনীর কথা মিলিল—কাজ হইল না, ঘরের কাজ কি, সকালবেলা শয্যা হইতে উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে মুখে জল দিয়া ঘুম ছাড়াইতে বেলা হইল—তখন দিনের খবর কিছুই রাখি নাই—কেমনে কোথায় কখন কি হইতেছে কিছুই জানিতাম না। মুখ ধুইয়া এধার ওধার দেখিতে শুনিতে ঘুরিতে ফিরিতে স্নান কাল হইল—সূর্য্য আকাশের উচুতে উঠিল, রোদ একটু গরম হইল; স্নান করিলাম। মনে ছিল স্নানের পর আপন কাজ করিব কিন্তু তাহা হইল কই, তাহার পরই জঠর জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল—আহার সুখে অনেকটা সময় বঞ্চিত করিলাম, দেখিতে দেখিতে সূর্য্য বিষুবরেখা পার হইল। আহারের পর বিশ্রাম সুখসেবায় আপন কাজ মনেও আসিল না, বিশ্রামান্তে বন্ধু বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া খেলিতে বসিলাম—খেলার ঘোরে, খেলার হার জিতে আত্মবিস্মৃত হ—আকাশের দিকে চাহিয়াও দেখিলাম না, কোন দিক্ দিয়া দিন কাটিয়া গেল টেরও পাইলাম না। হায়, হায়, কি হইল "দিন গেল।" ধূলা খেলায় বাল্য কাল কাটাইলাম, কৌমার কৈশোর সংসার প্রবেশের আমোদে কাটাইলাম, যৌবনে যুবতী সহবাস সুখে সক লই ভুলিয়া রহিলাম, প্রৌঢে স্ত্রী পুত্র পরিজন বেষ্টিত হইয়া সুখের সংসার খেলায় কি না করিলাম—কখন হাসিলাম, কখন কাঁদিলাম, কখন হারি লাম কখন জিতিলাম, দুঃখের পাথারে ডুবিলাম, সুখের তরঙ্গে ভাসি-

লাম, কি হইতাম, কি হইলাম; কি করিতাম, কি করিলাম! ভোলা মন বিষয়মদে মাতিয়া, সংসার মায়ায় ভুলিয়া হাহা করিয়। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য কাটাইয়া দিল—যৌবনের কমনীয় কান্তি মলিন হইল, ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হইল, শরীরের পেশী সমুদায় শিথিল হইল, কর্ণ বধির হইল, স্বচ্ছ নয়ন দর্পণ যেন পারদ বিহীন—প্রতিবিম্ব গ্রহণে অসমর্থ হইল, পঞ্চেন্দ্রিয় তেজোহীন হইল—জীবন সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, মনাকাশে আশার আলোক নিবিয়া আসিল, অন্তিম আঁধারে সংসার ঘেরিয়া আসিল, বিবেকবিহঙ্গ ডাকিয়া উঠিল; আবার সংসার মায়ামুগ্ধ মনকে জাগ্রত করিল; চিন্তা গোপালিনী রাখালকে ডাকিয়া কহিল "দিন গেল" গোধন লইয়া ঘরে চল। হায়, হায়। তখন গোধন খুজিলাম—খুজিয়া পাইলাম না। ভাবিলাম মাঠে আসিয়া কাজ হইল না কি লইয়া ঘরে যাইব। কি করিতে আসিলাম, কি করিয়া চলিলাম। পৃথিবী আঁধারে আচ্ছন্ন হইল—কিছুই দেখা যাইতেছে না, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, কি হইল, একি প্রমাদ, এখন কোথায় যাই, রাস্তা খুজিয়া পাই নাই, কেমন করিয়া ঘরে যাই, ঘরে গিয়াই কি বলিব। হায়, দিন থাকিতে একবারও ভাবিতাম না যে "এদিন যাবে" হায়। দিন যখন যায় যায় ভ্রমেও একবার তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে দিন গেল, এখন আর ভাবিলে কি হইবে। পাঠক। এখন তবে আসি, কিন্তু ভাই এ সংসারে নিতান্ত মোহমদে মত্ত হইয়া থাকিওনা, সকল বাক্য ভুলিয়া সংসারের সর্ব্বনাশী মোহিনী মায়ায় ভুলিও না, আর কি,—দিন থাকিতে থাকিতে এক একবার চিন্তা করিও "এ দিন যাবে।"

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

উক্তি।

১

পূরিল না প্রাণ—

পূরিল না প্রেম আশা   পূরিল না ভালবাসা

মিটিল না আকাঙ্ক্ষার ক্ষুর হুতাশন,

মিটিল না পিপাসার অসহ্য দহন।

২

রহিল অপূর্ণ

দেখনা চিরিয়া বক্ষ   আকাঙ্ক্ষার প্রতিকক্ষ

অসম্পূর্ণ সবি ফাঁক—সবি মরুময়,

মরমে বিরহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।

৩

জানিতাম মনে,

সে আমার আমি তার   এ জীবনে নহে কার

কিন্তু হায় সবই দেখি নিশার স্বপন,

সবই দেখি ছায়াবাজি জগতে এখন।

৪

কত আশা ছিল,

প্রেমভরে চোখে চোখে   থাকিব উভয়ে সুখে

সে আশা হয়েছে গত জনমের মত,

হয়েছে আশার বাঁধ তরঙ্গে আহত।

৫

হায় রে বিধাতঃ

জান যদি দয়াময়   এ সংসার দুঃখময়

কেন বা আনিলে মোরে দুখের সংসারে
কেন বা পোড়ালে প্রাণ বিরহ আঙ্গারে ?

৬

হায় প্রেমময়ী
কি বলিব কত জ্বালা সহি প্রাণে দুই বেলা
কত কাঁদি নিরজনে তোমার কারণ
কত আশা প্রাণ ভেঙ্গে—দিছি বিসর্জ্জন।

৭

কি বলিব আশা—
ধিক্ শতবার তোরে ধিক্ শতবার মোরে
ভুলাবিনা—তবু তোরে আমি না ভুলিব
কাঁদাইবি জানি, তবু কাঁদিতে আসিব।

৮

এমনি সজল চক্ষু—
মলিন বদন ভার অজস্র নয়নাসার
বহিবে যাবত দেহে জীবন থাকিবে,
তোর তরে প্রাণ প্রিয়ে তাবত কাঁদিবে।

৯

কি করিব,
দেশাচার অত্যাচার সমাজের অবিচার
বহিবে যাবত,-- হায় কত শত জন,
সহিবে আমার মত অসহ্য দহন।

১০

জানি বটে সব
তবু কেন নাহি জানি প্রাণে হেন অনুমানি
অবশ্য মিলিবে সেই নিদ্রার স্বপন
অবশ্য জুড়াবে এই বিদগ্ধ জীবন।

১১

তাই বলি আশা—

আর কেন কাঁদাইবে আর কেন পোড়াইবে

ত্যজ মোরে দয়াময়ী করি প্রণিপাত—

আর না সহেগো দেবি হয়েছে নির্ঘাত।

কমলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিলাসপুর গ্রামে রামধন চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ধনীও ছিলেন না নির্ধনও ছিলেন না, কিছুর অভাও হইত না অথচ কিছুই অপর্য্যাপ্ত পরিমানে ছিল না, তাঁহার দশ বার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহারি আয়ে এক রকমে পল্লিগ্রামে ভদ্র লোক সাজিয়া কাটাইতেন। কোম্পানির কাগজ ছাড়া যে রামধনের আর কিছুই ছিল না তাহা নহে, পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহস্থদিগের যেরূপ সামান্য স্থাবর সম্পত্তি থাকে রামধনেরও তাহা ছিল। রামধনের বয়ক্রম অন্যূন পঞ্চাশৎবর্ষ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি—গৌরবর্ণ। তাহার স্ত্রীর নাম শ্যাম-মোহিনী, শ্যামমোহিনীর বয়ক্রমও চত্বারিংশ বর্ষের ন্যূন নহে। তাহাকে দেখিলে অন্ততঃ চল্লিশ অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসর ন্যূন বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। আমরা শ্যামমোহিনীর রূপ সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, বাঙ্গালিরমণীগণের যৌবন আজ কাল অতি অল্প বয়স হইতে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধে চত্বারিংশ বর্ষিয়া শ্যামমোহিনীর আর রূপের কথা কি বলিব। যাহাই হউক এ বয়সে যদিও যৌবনের সে মধুময়

লাবণ্য নাই, সে মনমুগ্ধকারী মোহিনী শক্তি নাই, তথাপি শ্যামমোহিনীর অঙ্গে এখনও সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিহ্নগুলি রহিয়াছে। বুঝি সে সৌন্দর্য্যগুলি যাইয়াও যায় না, ভুলিয়াও ভুলে না, যাহাই হউক যৌবনকালে শ্যামমোহিনী যে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ণিত দম্পতি প্রণয়পুষ্প একটীমাত্র ফলে পরিণত হইয়াছিল।

শ্যামমোহিনীকে সকলেই বন্ধ্যা বলিয়া জানিত, পরে অনেক বয়সে অনেক দেব দেবীর আরাধনার এবং সন্তান উদ্দেশে অনেক প্রকার দৈবানুষ্ঠানে, দৈবানুগ্রহে কি কি তাহা আমরা জানি না, শ্যামমোহিনী একটী কন্যা রত্ন লাভ করিলেন, কন্যাটীর নাম কমলা, কমলা বহুদিন সন্তান প্রার্থী পিতা মাতার কতদূর আদরের সামগ্রী ছিল, তাহা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা একদণ্ড কমলা বিহনে থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই কমলাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। তাঁহাদের ইহ জীবনের যত সুখ যত আশা যত সান্ত্বনা তাহা যেন কমলাতেই নিহিত ছিল। রামধন ও শ্যামমোহিনী একমাত্র অন্ধেরযষ্টিস্বরূপিনী কমলাকে উপলক্ষ করিয়া যে কত প্রকার আশা করিত, কত প্রকার সুখ কামনা করিত তাহা বলা যায় না, সে আশা সে কামনা আর ফুরাইল না, তাহা অনন্ত—অশান্ত। কমলার বয়ক্রম এখন সাত বৎসর মাত্র কমলা পিতামাতার অনন্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিতা হইতেছে। দিনে দিনে কমলার রূপালোক উজ্জ্বলতর হইতেছে। দিনে দিনে রামধন ও শ্যামমোহিনীর আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। শ্যামমোহিনীর কমলার বিবাহ দিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল, তাঁহার ধারণা হইল যে কমলার বিবাহ না দিলে যেন আর সুখ নাই—কমলার মধুর বদনাবলোকন করিয়া যে সুখটুকু হইত তাহা যেন পুরাতন হইয়া উঠিল, যেন তাহাতে আর মন উঠে না, কোন নূতন সুখানুভব হয় না। শ্যামমোহিনী কমলার বিবাহের জন্য প্রত্যহই রামধনকে অনুরোধ বিনয় করিতে লাগিলেন, শেষে বিরক্ত করিবারও ত্রুটী করা হইল না, ক্রমশঃ শ্যামমোহিনী হইতে গ্রামস্থ অনেক প্রতিবেশিনী পর্য্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ

করিল অবশেষে রামধন শ্যামমোহিনী ও প্রতিবেশিনীদের পরামর্শ বা জিদের বশবর্ত্তি হইয়া আনন্দের মাত্রা বাড়াইতে কমলার বাল্যবিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অতি অল্পদিন মধ্যেই শুভদিনে শুভক্ষণে, একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র সন্তানের সহিত অতি সমারোহ সহকারে কমলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল। জামাতাটীর বয়ক্রম আট বৎসর মাত্র, দেখিতে বেশ সুন্দর। সুবর্ণে সুবর্ণে মিলিত হইল ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? যাহাই হউক কমলার পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রতিবেশিনীদেরই বা আনন্দ কত, কতলোক কত আশীর্ব্বাদ করিল, কেহ শ্যামমোহিনীকে কহিল "মা যাই মেয়েটী হয়েছিল তাই মেয়েটী দিয়ে ছেলেটী পেলে" শ্যামমোহিনী সাশ্রুলোচনে আনন্দ মনে বলিলেন "তার কথা কি মা এখন আশীর্ব্বাদ কর বেঁচে থাক" কেহ "সাতছেলের মা হও" "হাতের নো ক্ষয় যাক" ইত্যাদি কতলোক কত প্রকার আশীর্ব্বাদই কমলাকে করিল। কেহ বা আমাদের নবীন দম্পতিকে একত্রে আসীন দেখিয়া "আহা যেন রামসীতা" কেহ বা "হরগৌরী" ইত্যাদি কত প্রকার মধুর উপমা পদ প্রদান করিল কিন্তু কমলা তখন সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, সুতরাং তাহার এ সমস্ত আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগিতে ছিল না, তাহার মনে হইতেছিল এ আবার কি, ইহা অপেক্ষা আমার সইএর সঙ্গে খেলা করিলে কাজ দেখিত। বিবাহের পরদিবস কমলা শ্বশুরালয়ে গেল, শ্যামমোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন, রামধনও কাঁদিলেন। কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে তাহার পিতামাতাকে ছাড়িবে না, কতলোক তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, সে বালিকা তাহা বুঝিবে কেন বলিল, "ওগো আমি বাজনা শুনিব না গো, আমার বিয়ে ফিরিয়ে নাও গো" একজন প্রতিবেশিনী বলিল "দূর পাগ্‌লী বিয়ে কি ফেরে" কমলা বলিল "কেন ফেরে না আমি কতবার আমার সইএর কাছ থেকে আমার পুতুলের বিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি।" অষ্টমবর্ষীয় জামতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহাকে একটী স্ত্রীলোক বলিল "হাত ধরে নিয়ে যাও না?" জামতা কমলার হাত ধরিয়া বলিল "আয় না?" সকলে হাসিল। কমলা আবার

কাঁদিয়া উঠিল, কএক জন স্ত্রীলোক রোরুদ্যমানা বালিকাকে অগত্যা জোর করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দিল, কমলা পাল্কী মধ্যে সদ্যধৃত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রামধনের একটী নিকট সম্পর্কীয় লোক কমলাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে গেল, এদিকে শ্যামমোহিনীও কাঁদিতে লাগিলেন, রামধনও বিষণ্ণ হইলেন, এত আহ্লাদ করিয়া আহ্লাদ বাড়াইতে কমলার বিবাহ দেওয়া হইল, কিন্তু এ আবার কি?—ক্রন্দন কেন? তবে একি আনন্দাশ্রু? না তা নয়, কমলা যে এত দিনে পর হইল ইহাতেই তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল। মনুষ্য এক ভাবিয়া এক করেন, কিন্তু অন্য প্রকার হয়, ইহাই সংসার লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলা বিধবা।

কমলার বিবাহ শেষ হইল,—যে কমলা বাল্যাবধি পিতা মাতার যত্ন ব্যতীত অপর কাহার যত্ন জানিত না আজি দৈবানুগ্রহে বা প্রজাপতি প্রসন্নতায় কমলা শ্বশুর শাশুড়ীর যত্ন, স্নেহও দেখিল। এখন কমলা বিবাহিতা, স্বামী পাইয়াছে, কিন্তু স্বামী কি তাহা জানে না, ঈশ্বর যদি দিন দেন তাহা হইলে কমলা স্বামী সুখে সুখিনী হইবে এ আশা কমলার পিতামাতার মনে জাগরূক রহিল বটে, কিন্তু কমলার এখনও তাহা ভাবিবার দিন উপস্থিত হয় নাই, কমলা বিবাহে পূর্ব্বাপেক্ষা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারিল না, কেবল এইটীমাত্র বুঝিল যে, কমলা পূর্ব্বে মাথা বাঁধিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরিত না, এখন পরে। সিন্দুর পরিতে কমলার বড় আনন্দ। পূর্ব্বে কমলার সই সিন্দুর পরিত, কিন্তু কমলা পরিত না ইহা কমলার বড় দুঃখ ছিল, আজি কমলার সে দুঃখ মিটিল।

দেখিতে দেখিতে একদিন দুদিন, মাস, মাসের পর মাস এই রূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এখন জামতাটীর বয়ঃক্রম দশবৎসর, শ্যামমোহিনী মধ্যে মধ্যে জামাতাটীকে বাটীতে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। কন্যা ও জামতাটীকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়া দেন। দুই জানুতে দুটিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতেই শ্যামমোহিনীর অতুল আনন্দ, ইহাতেই শ্যামমোহিনী কমলার বাল্য বিবাহের অতুল সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কমলা এখন নবমবর্ষীয়া, কমলা গ্রাম্য পাঠশালায় প্রত্যহ পাঠ করিতে যায়, অপরাপর বালকেরা যাহা সাত দিনে শিক্ষা করিতে পারে না, কমলা তাহা একদিনে শিক্ষা করে, কমলাকে যে দেখে সেই ভালবাসে, একে বালিকা—তায় লজ্জা, নম্রতা সৌজন্য, দয়া, মায়া প্রভৃতি কমলার বদনে মাখান। যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশিনীর পুত্র কন্যারা ভাল খাইতে পাইত না, কমলা আপন খাবার হইতে চুরি করিয়া তাহাদিগকে দিত। প্রত্যহ দিলে যদি মা বকেন, এই জন্য মাতার নিকট চাহিত না, আপনি না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। কমলার ইহা-তেই আনন্দ।

একদিন কমলা পাঠশালা হইতে গৃহে আসিতেছে, এমত সময়ে তাহা-দের বাটীতে সহসা ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, কমলা চমকিল, ছুটিয়া বাটীতে আসিল। দেখিল শ্যামমোহিনী ধরাশায়িনী হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে-ছেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট কাঁদিতেছে। কমলাকে দেখিয়া তাহারা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কমলাও কাঁদিল কমলা কেন কাঁদিল, তাহা সে স্বয়ং জানিত না, মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

কমলা অনেকক্ষণ রোরুদ্যমানা শ্যামমোহিনীর নিকট দণ্ডায়মানা রহিল, স্তম্ভিত নয়নে রোদনপর মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলার আর তাহা ভাল লাগিল না, কমলা এ রোদনের বিশেষ মর্ম্মও কিছু বুঝিল না, কমলার মাতা "আমার দুধের ছেলে বিধবা হলো গো" বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন, ইহাতে কমলা বুঝিল যে সে বিধবা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে

যে কি ক্ষতি তাহা সে বুঝিল না, সুতরাং বিরক্তি সহকারে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রামধন বহির্ব্বাটীতে কাঁদিতেছিলেন, কমলা তাঁহার নিকটে গেল, রামধন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলাও কাঁদিল। রামধন বলিলেন "মা তোর কপালে বিধাতা এত ক্লেশ লিখেছেন?" কমলা তাহা বুঝিল না, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "কাঁদ কেন বাবা?"

রামধনের চক্ষে আবার প্রবলবেগে জল আসিল। বলিলেন "কমলা আমি যে কেন কাঁদি তা তুমি জাননা, এই আমার আরও দুঃখ, সেই জন্য আমি আরও কাঁদি, যদি বুঝ্‌তে মা, তা হলে তুমিই বেশি কাঁদ্‌তে, আমি হয়ত এত কাঁদ্‌তাম না।" কমলা রামধনের স্কন্ধে আপন মস্তক রক্ষিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিল, রামধন কন্যাকে বক্ষে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামধনের মস্তকে টাক্ ছিল, কমলা তাহাতে হস্ত বুলাইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য বিবাহের ফল।

আজি কমলা বিধবা, শ্যামমোহিনীর সাধের কমলা বালবিধবা, আহা মানব,—ঈশ্বর তোমার কপালে চির সুখ লিখেন নাই। দেখ, সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য কমলার পিতা মাতা কমলার বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলেন, মানব মনে মনে কত প্রকার সুখাবিলাস সৃজন করে,—কিন্তু মনুষ্য গড়ে, বিধাতা ভঙ্গ করেন, সুতরাং শ্যামমোহিনী ও রামধন কর্ত্তৃক বহুযত্ন প্রতিপালিত আশাকানন প্রবল বর্ত্যাতাড়নে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বালিকা, সে বৈধব্য বুঝিতনা, পূর্ব্বের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইত।

আজি কমলার প্রিয়সখি হরিদাসীর বিবাহ। হরিদাসীর বিবাহ,

কমলার আনন্দের আর সীমা নাই। কমলার মাতা কমলাকে অলঙ্কারাদি পরাইয়া মাথা বাঁধিয়া দিলেন, কমলা বিবাহ বাটীতে যাইবে। কমলা এক খানি বেনারসী কাপড় পরিয়া মুকুরে আপন মুখ দেখিল। মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল "মা। কাঁচ পোকার টিপ পরিয়ে দেনা" কমলার মাতা তাহাই করিলেন। কমলা আবার বলিল "মা। আমায় সিন্দুর পরিয়ে দিলিনা, তুই যে বল্‌তিস্‌ সিন্দুর পরলে আমায় বেশ দেখায়" কমলার মাতা তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কমলাকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিল না, অবাক্ হইল।

ক্ষণেক পরে কমলা বিবাহ বাটীতে গেল, সেখানে কমলার মহা আনন্দ—পান সাজিতেছে কাহার ছেলে কোলে করিতেছে, কাহার গায় চুনেহলুদ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কমলা মহাব্যস্ত কমলার মহা আনন্দ—এমন সময়ে বর আসিল, সকলে বর দেখিতে গেল, ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত ছাল্লাতলায় বর দণ্ডায়মান, বরণ হইবে। সধবা স্ত্রীলোকেরা বরণ ডালা মাথায় করিল, কমলা বরণ ডালা মাথায় করিতে উদ্যত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "কমলা, তুই বরণ ডালা ছুস্‌নে" কমলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন খুড়িমা?" কমলা তাহাকে গ্রাম সম্পর্কে "খুড়িমা" বলিয়া ডাকিত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "ও সব সধবায় ছোয়, তুমি বিধবা হও তোমার ছুতে নাই" কমলা কিঞ্চিৎ দুঃখিতা হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কমলার চক্ষে জল আসিল। স্বামীর জন্য নহে, স্বামী কি কমলা তাহা এখনও জানেনা, বরণডালা ছুইতে পাইল না ইহাই দুঃখ।

কমলা আর সেখানে অধিকক্ষণ রহিল না বাটীতে গেল, শ্যামমোহিনী বলিলেন "কমলা এখনি যে এলি?" কমলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "মা আমায় কেউ বরণডালা মাথায় কর্‌তে দিলে না।"

শ্যামমোহিনী সজল চক্ষে বলিলেন "আর সে খানে যাসনা, রাত হয়েছে ঘুমোও।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতার নিকট শয়ন করিল। শ্যাম

মোহিনী সমস্ত রাত্রি কাঁদিলেন। একবার কমলা জিজ্ঞাসা করিল "মা কাঁদ্‌ছ কেন?"

শ্যামমোহিনী। না মা কাঁদিনি তুমি ঘুমোও।

কমলা ঘুমাইল।

আর একদিন হরিদাসীর মাতা হরিদাসীর চুল বাঁধিয়া দিলে, কমলা বলিল "দেখ খুড়িমা আমি সিন্দুর পরতে চাইলে মা কাঁদে, তুমি ত আমার সইকে সিন্দুর পরিয়ে দাও।"

হরিদাসীর মাতা রাগ করিলেন, কমলা রাগের কারণ বুঝিল না, কিন্তু বড় দুঃখিত হইল। কমলা সে কথাটীও মাতাকে বলিল, শ্যামমোহিনীর হৃদয়ে কে যেন দগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল, শ্যামমোহিনী মনে মনে বলিলেন "ভগবান তোমার মনে এই ছিল, দেব। আমার ইহ সংসারে যা হবার তা হয়েছে, আর কেন, তোমার চরণ তলে স্থান দাও, সংসারের এ অসহ্য দাহন হতে অব্যাহতি পাই। ভগবান, তোমার কাছে কত কাকুতি মিনতি করে একটী সন্তান প্রার্থনা করি, তা যদি মুখ তুলে চাইলে, তবে সুখী কর্‌লে না কেন? তুমি ত অন্তর্যামী যদি সুখ পাবনা জান তবে কেন কন্যারত্ন দিলে? সে যা হোক, এখন ত সে সব সুখ স্বপ্ন ভঙ্গেছে তবে আর কেন দগ্ধ কর?" শ্যামমোহিনী এইরূপে কতই কাঁদিলেন।

পূর্ব্ব ও আধুনিক ভারত।

ঊনবিংশ শতাব্দী—পরিবর্ত্তন সময়, এ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সকল ভাবেই পরিবর্ত্তিত, এ শতাব্দীতে বঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার উজান বহিতেছে, আর বাঙ্গালী সেই স্রোতের প্রতিকূলে তুফানে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। আজ কাল বঙ্গীয় যুবক মাত্রেরই মুখে সভ্যতার মাহাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, আর যে দিকেই

নেত্রপাত করা যায়, সভ্যতার সুচিহ্ন অবলোকন পুরঃসর চিত্তের সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিয়া বাঙ্গালীর এই সুখের দিনে সুখী হওয়া যায়। দেখ যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চাশং কি ষষ্টী বৎসর পূর্ব্বে অনাচ্ছাদিত গাত্রে ও মুণ্ডিতমস্তকার্দ্ধভাগে চন্দন বিলেপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধসভাসীন হইয়া দর্শন শাস্ত্রের বিচার করণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তানের মহাপাতুক ও বর্ম্মিতাঙ্গ হইয়া টাউনহলে বাক্‌জাল বিস্তার করতঃ মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। যে বঙ্গ-বাসী কুটীরকল্প গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রাম্য সমিতির অধিনায়ক হইয়া প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীদিগের কার্য্যা কার্য্য বিচার ও দণ্ড বিধানাদির মীমাংসা করিয়াছেন, আজ সেই বঙ্গীয় যুবক ব্রীটিশ প্রসাদাৎ বিচারাসনে সমাসীন হইয়া স্বজাতীয়ের ধন, প্রাণ, মনের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছেন। যে বঙ্গে অধ্যাপকগণ চতুষ্পাটীতে ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করত অহর্নিশ শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াও স্বয়ং কায় ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তাহাতেই সুখানুভব করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই শ্রেণীস্থগণ সুরম্য হর্ম্ম্যে নিয়মিত কিঞ্চিৎ সময় ছাত্রবর্গকে কথঞ্চিৎ বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা প্রদান করিয়াই বিপুল বর্ত্তন উপভোগেও অসন্তুষ্ট চিত্তে অধ্যক্ষবর্গের নিন্দাবাদে সময়াতিপাত করিতেছেন। যে ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবসায়িগণ শাস্ত্রের যথা যথ মর্ম্ম গ্রহণান্তর, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রকটন পূর্ব্বক একটী মুদ্রার চতুর্থাংশ লাভে সুখী হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরেরা ব্যবহারাজীব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়াও স্বয়ং বক্রগ্রীব রহিয়াছেন। এইরূপ যে দিকেই নেত্রপাত করিবে সভ্যতার অনির্ব্বচনীয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি বঙ্গে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বিদ্যমানতা নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইবে।

সভ্যতার সঙ্গিনী স্বাধীনতা। বুঝি তাহারই অভাব বিবেচনা করিয়া আজ কাল সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, বা অশিক্ষিত ইংরাজিভাষাস্পৃষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে স্বাধীনতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজি পড়িয়া একটী কথা শিখিয়াছে—"স্বাধীনতা।" হাটে, মাঠে,

ঘাটে, অধিকাংশ নবাবৃন্দ মুখে শুনিতে পাওয়া যায় "স্বাধীনতা স্বাধীনতা।" আমরা যদি কোন নূতন পুস্তক পাঠ করি তাহাতে দেখি স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! যদি অভিনয় দর্শনে গমন করি, তাহাতে দেখি ঐ স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা। বলিতে কি, আজ কাল অধিকাংশ যুবক, বালকবৃন্দের মনে সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে এইটী ধারণা হইয়াছে যে আমরা বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মান যশলাভে কৃতকার্য্য হইয়াও একালেও পরাধীন আছি। আর ইহাও আক্ষেপের বিষয় যে আমরা সকল বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকারী হইয়াও কেবল পরাধীন বলিয়াই পাশ্চাত্যদিগের ঘৃণা হইতে এখনও অব্যাহতি পাইলাম না, ফলতঃ অধিকাংশ নব্য বাঙ্গালী ভাবেন যে, আমরা সভ্য হইয়াছি, তথাপি যে, বিদেশীয়দিগের ঘৃণার্হ আছি, তাহার কেবল এইমাত্র কারণ যে আমরা পরাধীন, সুতরাং আমরা তজ্জন্যই ঘৃণার্হ, নচেৎ অন্য কোন গুণে আমরা কাহারও নিকট পরাভূত নহি।

যাহা হউক আমরা এই সভ্যতাভিমানী, পরাধীনতাকাতর যুবকবৃন্দের সান্ত্বনার্থ দুই একটী কথা বলিবার উদ্দেশে লেখনি ধারণ করিব মানস করিয়াছি, ইহাতে আমাদের কি ফল ফলিবে বলিতে পারি না, হয়ত অনেকেই আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। যিনি যাহাই বলুন আমরা আজ এই কথা লইয়া আদর্শিনীর কিয়দংশ পূর্ণ করিব এবং আদর্শিনীকে কথঞ্চিৎ মুখরা দোষে দূষিত করিব।

যাঁহারা মনে করেন মুসলমান অধিকার হইতে ইংরেজ অধিকারেও (সভ্য হইয়াও) আমরা পরাধীন, সুতরাং আমরা দুঃখভোগী। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে—হিন্দুরাজ্যে (স্বাধীনতা সময়ে) আমরা সুখী ছিলাম, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, প্রথমতঃ মুসলমানাধিকারে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন হই নাই, সুতরাং তৎকালে আমরা পরাধীনতা জনিত সম্পূর্ণ অসুখী ছিলাম না। (মুসলমানাধিকারেও যে আমরা পরাধীন ছিলাম না একথা বারান্তরে লিখিত হইবে।) ইংরেজাধিকারে আমরা পরাধীন বটে, কিন্তু পরাধীন বলিয়াই যে আমরা সম্পূর্ণ দুঃখী এমত নহে। আর হিন্দু-রাজ্যকালেও যে আমরা এক্ষণ অপেক্ষা সুখী ছিলাম, তাহারও প্রমাণাভাব।

তুমি বলিতে পার, এ নূতন কথা, সজাতীয় রাজার অধিকার কালে যে আমাদের সুখের অভাব ছিল একথা কি বিশ্বাস্য। তদুত্তরে বলিতেছি যে তাহাও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে, একথা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বুঝা আবশ্যক যে রাজা ভিন্নজাতীয় বা ভিন্নদেশীয় হইলেই প্রজা পরাধীন বা সম্পূর্ণও অসুখী নহে, আর রাজা স্বজাতি বা স্বদেশীয় হইলেই প্রজা স্বাধীন বা সম্পূর্ণ সুখী নহে। স্বাধীনতা পরাধীনতার অর্থ এই, যে রাজ্যে প্রজার ইচ্ছামত গমনাগমন, কৃষি বাণিজ্য, বিদ্যালোচন প্রভৃতি করিবার অধিকার আছে, সে রাজ্যের রাজা বিজাতীয় বা বিদেশীয় হইলেও প্রজা স্বাধীন, আর যে রাজ্যের প্রজার সর্ব্বকার্য্য রাজাজ্ঞা সাপেক্ষ, সে রাজ্যে রাজা সজাতীয় বা স্বদেশীয় হইলেও প্রজা পরাধীন। সচরাচর দেখা যায় একজন মুসলমান জমীদারের অধিকারস্থ এক ব্রাহ্মণ প্রজা নির্ব্বিবাদে পৈতৃকবৃত্তি-ভোগকরতঃ সুখে দিনপাত করিতেছে, আর সর্ব্বভুক্, ব্রহ্মত্ত্বাপহারী কোন ব্রাহ্মণ জমীদার কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একজন হাহাকার করিতেছে। এমত স্থলে যেমন ব্রাহ্মণ জমীদার অপেক্ষা মুসলমান জমীদার স্পৃহনীয়, তদ্রূপ অন্যায়কারী সজাতীয় রাজা অপেক্ষা ন্যায় পরায়ণ বিজাতীয় রাজাই শ্লাঘনীয়।

এস্থলে একথা হইতে পারে যে, অন্যায়কারী সজাতীয় বা স্বদেশীয় রাজা অপেক্ষা ন্যায় পরায়ণ বিজাতীয় বা বিদেশীয় রাজা শ্লাঘনীয় বটে, বা তদ্রূপ অবস্থাতে প্রজা সজাতীয় রাজার শাসনাপেক্ষা বিজাতীয় রাজার শাসনে সুখী বটে, কিন্তু ন্যায় পরায়ণ স্বজাতীয় রাজা ও ন্যায় পরায়ণ বিজাতীয় রাজার মধ্যে স্বদেশীয় রাজা অবশ্যই শ্লাঘ্যতর্ব, তদুত্তরে আমরা বলি ন্যায় পরায়ণ সজাতীয়, স্বদেশীয় ও বিজাতীয় বিদেশীয় কিছুই বিভিন্ন নহে। কারণ প্রজার রাজার নিকট কেবল সুবিচারই প্রার্থনীয়, জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই তাহার অন্তরায় নহে। যিনি প্রজারঞ্জন সমর্থ তিনিই রাজা, নচেৎ সজাতীয় রাজাই যে সুখকর সকল স্থলে একথা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে সময়ের তারতম্যেরও অনেক অপেক্ষা করে, একথা বলার তাৎপর্য্য এই, আমাদের বোধ হয় ত এসময়ে সজাতীয় রাজাও আমাদের ফলপ্রদ হয়েন না—একথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত এস্থলে একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সকলেই জানেন রামরাজ্যের তুল্য সুখরাজ্য ভূমণ্ডলে কখনও কোথায় হয় নাই, এবং রামের তুল্য প্রজারঞ্জক রাজা কখন কেহ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যদি রামের তুল্য কেহ মহান্ রাজা হইতেন, তবে অন্য জাতির ত কথাই নাই, এই যে বিদ্যা বুদ্ধিতে বঙ্গের ভূষণ কায়স্থজাতি, আজ তাঁহাদের দশা কি হইত? এই যে উচ্চতম বিচারালয়ের প্রধান পদে অধিরূঢ় হইয়া বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালির মুখোজ্জ্বল করিলেন, আজ রামরাজ্য হইলে তিনি কোথায় থাকিতেন? হয় ত বিপ্রপাদোদক পান করিতে করিতে ও বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা বিধান করিতে করিতে তাঁহাকে জন্মসার্থক করিতে হইত। তাই বলিতেছি রাজা সজাতীয় বিজাতীয় প্রজার সুখ দুঃখের মূল নহে।

কথাটী কিছু পরিসর হইল। আমরা প্রথমতঃ বলিতেছিলাম যে ঊন-বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ যুবক মাত্রেরই মনে ধারণা আমরা সুশিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ ইত্যাদি হইয়াও পরাধীনতা দোষে বিদেশীয়দিগের নিকট ঘৃণিত, অতএব পরাধীনতা অতি মন্দ, স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠতর; তাঁহাদের মতে এ স্বাধীনতার অর্থ স্বজাতীয় রাজার শাসিত হওয়া। এ কথার প্রতিবাদে আমরা বলি যে কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয় সুবিচারক রাজার শাসিত হওয়াই প্রয়োজনীয়, অন্যায়পর রাজার অধীন হইলে সজাতীয় শাসনাপেক্ষা বিজাতীয় শাসনও শ্লাঘ্যতর এই কথা প্রসঙ্গে এ সময়ে রামরাজ্যেও প্রজার ক্লেশের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। অতএব অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে রাজা প্রজা এই কথাদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তৎপরে রাজা প্রজার সময় ঘটিত কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহারও কিছু উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে। একথার পর বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজ্যের ও আমাদের ইংরাজাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখও আবশ্যকীয়। তৎপরে এ সময়ে সজাতীয় রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইলে কি কি দোষ স্পর্শে তাহারও কিছু উল্লেখ আবশ্যক? কিন্তু এত কথা আদরিণীর পক্ষে শোভমান কিনা তাহা বুঝিতে পারি না, যাহা হউক যতক্ষণ না দোষ বুঝা যাইবে ততক্ষণ কিছু কিছু বলিতে উদ্যুক্ত থাকিব?

রাজা প্রজা দুই কথার আন্দোলন করিতে হইলে, দেখা যায় আদিম অবস্থায় মনুষ্য মধ্যে কেহই রাজা ছিল না। ইতিহাসের গবেষণা, বিজ্ঞানের ভূবিদর্শন বলে অবগত হওয়া যায় যে আদিমাবস্থায় মনুষ্যমাত্রই অসভ্য ছিল। তখন ইহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার, নিয়মিত জীবিকা এ সকলই কিছুই ছিল না, মনুষ্য পশুবৎ যথেচ্ছ বিহার, কন্দমূল ফলভোজী ও বনচারী হইয়াই কালাতিপাত করিত। পরে সভ্যতার ক্রমোন্নতি অনুসারে ইহারা তরুতল ত্যাগকরতঃ গিরিগুহা বা বৃক্ষকোটরাশ্রয়ী হয়। এই সময়েই হিংস্র জন্তু হইতে নির্ভীক হইবার নিমিত্ত ইহারা কথঞ্চিৎ দলবদ্ধ হয়। ইহাই সমাজবন্ধের মূলভিত্তি, পরে মনুষ্য যখন দেখিল সমবেত ভাবে কার্য্য করিলে অসাধ্য কার্য্যও অনায়াসসাধ্য হয় তখন ক্রমশঃই দল পুষ্ট করিতে শিখিল। এই সময়ে তাহাদের অভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল, যতই অভাব উপলব্ধ হইতে লাগিল ততই তাহার পূরণের নিমিত্ত নানা উপায়ের উদ্ভাবন হইল। এইরূপে তরুতল গিরিগুহা ত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্য কুটীরবাসী হইল, ও ফলমূল ভোজী হইতে মৃগয়াজীবী হইল। ইহার অনতি পরেই কৃষিকর্ম্ম তাহাদের অপরিজ্ঞাত রহিল না। যখন মনুষ্য কৃষিজীবী তখন তাহারা ইতরজীবদিগকেও স্বীয় দাসত্বে নিযুক্ত করিতে শিখিল। কিন্তু এখন আর মনুষ্য নিতান্ত পশুবৃত্ত নহে, এখন ইহারা দলবদ্ধ, গৃহবাসী ও হিংস্র হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ—এখন আত্মপর বিবেচনাতেও অনভিজ্ঞ নহে। এ সময়ে মনুষ্যেরা স্বীয় স্বত্ব বুঝিতেও সক্ষম। যখন কৃষিলব্ধ শস্য বা মৃগয়া লব্ধ পশুর অধিকারী ও অনধিকারী নির্ণয়ের আবশ্যকতা হইল তখনই মনুষ্য আপন আপন দলমধ্যে একজনকে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ঐ কর্ত্তা প্রথমে তাহাদের শ্রমোৎপন্ন ফলের বিধাতা, কালসহকারে সামাজিক নিয়মেরও সংস্থাপয়িতা হইলেন। কিন্তু মনুষ্য এখন শুদ্ধ এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহে, তাহারা বহুগোষ্ঠী ও বহু দলে বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন দলপতিও হইয়াছে। ঐ সকল দলপতির আবার আপন আপন দলের উন্নতিলাভেচ্ছাও বলবতী হইয়াছে, কাজেই মনুষ্য সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তাহাতেই মানব সমাজে

আবার নিজ নিজ দলের শক্তি ও মর্য্যাদা রক্ষার্থ কতকগুলি স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত হইল। এরূপ অবস্থায় এক সম্প্রদায় রক্ষক ও এক সম্প্রদায় কার্য্য প্রবর্ত্তক প্রত্যেক দলেই নিয়মিত হইল। পাঠক জানিবেন এইরূপেই রাজপদের ও সমাজের সৃষ্টি, সামাজিক সমস্ত নিয়ম এইরূপেই উদ্ভাবিত, ও এইরূপেই মানব পাশব বৃত্তি হইতে ক্রমোন্নতি মাহাত্ম্যে ক্রমশঃই উন্নতি-পথে ধাবিত হইয়া এই ঊনবিংশতাব্দীর সভ্য পদবীরূঢ়।

সংক্ষেপতঃ যাহা কিছু উল্লিখিত হইল তাহাতে এইরূপ প্রতিপাদিত হইল যে, রাজা প্রজা সাধারণের প্রতিষ্ঠিত, স্বত্বাস্বত্বের অবধারক মাত্র। রাজার নিজের স্বত্ব প্রজার স্বত্ব ভিন্ন নহে, তিনি প্রজাবর্গকে নিরাপদ করিবেন, প্রজাকুল স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের কিয়দংশ দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। রাজা যেমন স্বয়ং নিঃস্বার্থ হইয়া সামাজিক নিয়ম রক্ষণে ও হিত সাধনে তৎপর থাকিবেন, প্রজা সাধারণ ও তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি সম্পন্ন, তদাজ্ঞাপালনরত, ও তাঁহার প্রতি দেবোচিত ভক্তি সম্পন্ন হইবে। যে রাজা ইহার ব্যতিক্রম করিবেন তিনি রাজযোগ্য নহেন, যে প্রজা তথাবিধ গুণ সম্পন্ন, রাজার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন নহে সে দণ্ডার্হ। অতএব বলিতেছি রাজা স্বদেশীয়, সজাতীয় কি বিদেশীয় বিজাতীয় উভয়ই সমান। যে রাজা প্রজারঞ্জন সমর্থ তাঁহার অধীনস্থ প্রজা কখনই পরাধীন নহে।

অঙ্গরাগ।

মানব মাত্রই সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতি, সকলেই সুন্দর বস্তু ভাল বাসে সুন্দরী স্ত্রী, সুশ্রী পুত্র কন্যা, সুন্দর গৃহ, সুন্দর পুষ্প সংক্ষেপে সমস্তই সুন্দর কেনা ভাল বাসে? একটী সুন্দর বস্তু দেখিলে কেনা বিমোহিত হয়। মনুষ্য সুন্দর বস্তু ভাল বাসে আবার তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়, যে বস্তুটী তত ভাল লাগে না, তাহা ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা সুন্দর করে,

অথবা তাহার বিনিময়ে সুন্দর বস্তু গ্রহণ করে। যে সুন্দর বস্তু এত ভাল বাসে সে যে আপনি সুন্দর হইতে চায় না ইহা অসম্ভব, এই সৌন্দর্য্যাভিলাষেই মানব সুন্দর বেশভূষা প্রভৃতি ভাল বাসে। এবং ভাল বাসে বলিয়াই দিন দিন নূতন নূতন প্রকারের বেশভূষা প্রস্তুত হইতেছে, মানবের বিলাসিতা বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে।

যে দুর্ব্বল সে অঙ্গাবরণ ব্যতীত অন্যের সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে, অতএব বোধ হয় যাহার সৌন্দর্য্য যত কম তাহার তত অন্য উপায়ে সুন্দর দেখাইবার ইচ্ছা বলবতী।

প্রধানতঃ রমণীগণের বেশ বিন্যাস ও অঙ্গরাগে অনুরাগ পুরুষ অপেক্ষা অধিক, তবে কি পুরুষগণ রমণী কুল অপেক্ষা সুন্দর, কাহার কাহার মতে তাহাই বটে—তাঁহারা বলেন, রমণীগণের যৌবন অতি ক্ষণিক পুরুষগণের তদপেক্ষা অনেক অধিক, আরও তাঁহারা ইতর প্রাণীগণ মধ্যেও পুরুষের সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য স্বীকার করেন, যথা—সিংহীর কেশর নাই কিন্তু সিংহের কেশর আছে, সুতরাং সিংহ সুন্দর।ময়ূরীর পুচ্ছের শোভা নাই কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছ শোভা অতি মনোহর, অধিক কি কপোতী চটকী অপেক্ষা কপোত চটকের সৌন্দর্য্য অধিক, যাহাই হউক আমরা সৌন্দর্য্য লইয়া সংসার সহায় রমণীগণের সহিত বাকযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি, রমণীগণ পুরুষ অপেক্ষা যে কোন কারণেই হউক প্রধান।—(সুন্দরী বা কুৎসিতা হউক) পুরুষগণ যখন রমণীগণের পদানত, রমণী লইয়া পাগল তখন রমণীগণ যে পুরুষগণকে হয় গুণে নয় রূপে এত বাধ্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক সে বিষয় লইয়া আমাদের এস্থলে তর্ক আবশ্যক করেনা।

রমণী সুন্দরী বা কুৎসিতা হউক তাহাদের অঙ্গরাগ নিতান্ত আবশ্যক ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতার প্রভাবেও তাহারা যে সমস্ত অঙ্গ বিন্যাস করিতে নিবৃত্ত হয় নাই, অথবা সভ্যতায় অঙ্গ বিন্যাস হ্রাস হয় না, কেবল মাত্র সভ্যতর অঙ্গবিন্যাস সৃজিত হয়।

পূর্ব্বে রমণীগণের অঙ্গবিন্যাস এক প্রকার ছিল, এখন অন্যপ্রকার হইয়াছে, তখনকার রমণীগণের মধ্যে উল্কী, পেটী পাড়িয়া মাথা বাঁধা, দাতে মিসি, ও অলক্তক ব্যবহার করা ইত্যাদি কতিপয় অঙ্গবিন্যাস

অতিশয় প্রবল ছিল, সিঁতিতে সিন্দুরের ঘটাও বিলক্ষণ ছিল, এখন তাহা কিছু ফিরিয়া গিয়াছে, সে অলক্তক ব্যবহার এখনও আছে, কিন্তু এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সৌখিন হইয়াছে। মাথায় আর সে রূপ মোম দিয়া পেটী পাড়া নাই, মধ্যে মোমের পরিবর্ত্তে আতর ও মোমে মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মঞ্জন নামে দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তদ্বারাই পেটীর শোভা সম্পাদন করা হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে এলবার্ট ফ্যাসানে খোপা বা সাধারণ ফিরিঙ্গী খোপা আরম্ভ হইয়াছে। মিসি আর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়, উল্কী উঠিয়াগিয়া তৎপরিবর্ত্তে খদির বা কাঁচ পোকার টিপ হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও মোম বা আতর মোম মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা মাথা বাঁধা হয়। পূর্ব্বে বঙ্গ রমণীরা যেরূপ হস্তে পদে এবং নখাগ্রে অলক্তক দ্বারা রঞ্জিত করিতেন এখনও অনেকে সেরূপ করিয়া থাকেন। অনেকে অলক্তকের পরিবর্ত্তে মেহদী পাতাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যাবনিক প্রথা বলিয়া প্রসিদ্ধ। য়ীহুদী, মোগল, মুসলমান ও মিসর প্রদেশীয়গণের মধ্যে এখনও মেহদি পরিবার প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ঐ সকল জাতিয়ের স্ত্রীলোকই যে মেহদি ব্যবহার করেন এমন নহে, পুরুষেরাও তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকেন। পুরুষগণ অধিকন্তু গুম্ফ ও শ্মশ্রু রঞ্জিত করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানীদিগের চন্দন ও তিলক মৃত্তিকার দ্বারা অলকা তিলকা ব্যবহার প্রসিদ্ধ। ইংরাজ প্রভৃতি সভ্য রমণীগণের মধ্যে এক প্রকার সৌগন্ধ বিশিষ্ট শ্বেত চূর্ণ মুখ মণ্ডলে এবং লোহিত চূর্ণ ওষ্ঠ ও কপোল প্রদেশে ব্যবহার করা নিয়ম। সুন্দরী রমণীগণ যৌবনকালে ঐ লোহিত চূর্ণ তত ব্যবহার করেন না, কারণ যৌবনের সময় রক্তাধিক্য প্রযুক্ত তাহাদের সেই সকল স্থান স্বভাবতই প্রায় লাল থাকে, তবে যৌবন অতীত হইলে আর তত থাকে না। সেই সময়ই লালচূর্ণ তাহাদের বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়া উঠে ঐ সমস্ত চূর্ণ আজ কাল বঙ্গীয় রমণীগণ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন। তাহা সাধারণতঃ শ্বেত বা লাল পাউডার বলিয়া জ্ঞাত।

তিব্বত দেশীয় স্ত্রীগণ অসামান্য রূপবতী ও লাবণ্যময়ী, তাহারা সেই সমস্ত রূপের বোঝা লইয়া রাজপথে বিচরণ করিলে পাছে পুরুষগণ উন্মত্ত

হয় এই আশঙ্কায় তাহারা তাহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্পন্ন বদনে কালিমা লেপন করে।

উৎকল হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এখনও হরিদ্রালেপন ও উল্কী ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। এমেরিকা ও আযারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অসভ্যেরা এখনও উল্কী ব্যবহার করিয়া থাকে। জাহাজের ইংরাজ নাবিক প্রভৃতির হস্তে এখনও নঙ্গর জাহাজ প্রভৃতি চিত্রের নানাবিধ উল্কী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম প্রদেশে একাল পর্য্যন্ত উল্কী বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত দুই একজন ইংরাজের আমরা পাদ প্রদেশ হইতে গলা পর্য্যন্ত উল্কী দেখিয়াছি। এদেশীয় শৈব ও শাক্তেরা শ্বেত ও রক্ত চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকেন।

নয়ন যুগলের শোভা সম্পাদন করিতে এদেশীয় রমণীগণ চক্ষে কজ্জল ব্যবহার করিতেন, এখন সে প্রথা অনেক পরিমানে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী ও মুসলমান রমণীরা চক্ষে কজ্জলের পরিবর্ত্তে সুর্ম্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইজিপ্ট দেশীয় রমণীগণ কোহল নামে কজ্জলের ন্যায় এক প্রকার বস্তু চক্ষে ব্যবহার করে। মিসর দেশীয় রমণীগণ অত্যন্ত মেহদাভক্ত, মেহদা ব্যতীত কোন ক্রমেই তাহাদের অঙ্গরাগ সম্পাদন করা হয় না। এদেশে কাঁচা মেহদী পাতা ও খদির একত্রে পেষন করিয়া মেহদী ব্যবহার করে। কিন্তু মিসরদেশীয়েরা মেহদীর শুষ্ক পত্র উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার সারাংশ দ্বারা রং প্রস্তুত করে। সেই রং হস্ত পদ অঙ্গুলী ও নখাগ্রে লেপন করিয়া তাহা সমস্ত রাত্রি রেশমী কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে সেই রং প্রায় এক পক্ষ কাল স্থায়ী হয়। বর্ণ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলে কেহ কেহ পুনর্ব্বার মেহদী লেপন করে কেহ কেহবা গোড়াচুন ভূষা ও মসিনার তৈল একত্রে পেষণ করিয়া সেই সমস্ত স্থানে লেপন করে, তাহাতে ঐ সমস্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু যাহারা অত্যন্ত বিলাস প্রিয় তাহারা অঙ্গুলির এক পর্ব্ব উক্ত প্রকারে কৃষ্ণ ও অপর পর্ব্ব মেহদী দ্বারা লোহিত বর্ণ করে, এইরূপে তাহারা করতলের অর্দ্ধেক কৃষ্ণ ও অর্দ্ধেক লোহিত বর্ণ সম্পন্ন করিয়া বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করে। বিবাহাদি কালে এই মেহদী ব্যবহার প্রথা লইয়া মহা সমারোহ

হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বদিন পাত্রীকে মেহদী দ্বারা সুন্দর রূপে সুসজ্জিত করিয়া প্রকাশ্য রূপে স্নান করিতে লইয়া যাওয়া হয় পরে সায়ং কালীন আহারাদি সমাপনান্তে পাত্র কন্যা এক পাত্র মেহদী লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা বিদ্ধ করিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রদান করে। ইহার নাম "নুকত।" ইহারই অনুকরণে এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা সংস্কারোপলক্ষে এক প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে যাহার নাম "মেহদী ভাঙ্গা।"

নুকত সম্পন্ন হইলে পাত্র কন্যা ঐ থান ও টাকা একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করে এবং নূতন মেহদী দ্বারা হস্ত পদাদি রঞ্জিত করে, আর অবশিষ্ট মেহদী দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আপন আপন হস্ত রঞ্জিত করেন।

এইরূপ আরও নানা প্রকার অঙ্গরাগ প্রথা নানাদেশে প্রবর্ত্তিত আছে, সে সমস্তের বাহুল্য উল্লেখ একপ্রকার অসম্ভব। আমরা কেবল সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য কতিপয় দেশ বাসীগণের অঙ্গরাগ প্রথা মাত্র প্রকটন করিয়াছি। যাহাই হউক সভ্যতার প্রভাবে অঙ্গরাগ প্রথারও যে সর্ব্বিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অঙ্গরাগ প্রথা সমালোচনা এক প্রকার অসম্ভব, দেশ ভেদে রুচি ভেদে নানা প্রকার অঙ্গরাগ হইয়া থাকে, তবে সভ্য দেশীয় অঙ্গরাগ প্রায় সকলেরই নিকট সমভাবে আদৃত, সুতরাং আমরা সে সমস্ত সম্বন্ধে এক প্রকার পক্ষপাতী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক যে অঙ্গরাগ স্ত্রীলোক মধ্যে বাহুল্যরূপে প্রচলিত সে অঙ্গরাগ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে অদ্য প্রস্তুত নহি, এবং ইচ্ছাও করি না।

বার্দ্ধক্যে জীবনের প্রতি মমতা।

বয়োবৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের জীবনাশা বলবতী হইতে থাকে, বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে ইহার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বাল্যাবধি কত সুখ,

কত দুঃখভোগ করিয়াছে, এমন অবস্থা নাই যে তাহার ভোগ করিতে বাকী আছে, মনুষ্যের দশদশা সকলই তাহার ভোগ করা হইয়াছে, মনুষ্য জীবনে যাকিছু দেখিবার, শুনিবার আছে, সকল তাহার হইয়া গিয়াছে। আমোদ আহ্লাদ, হাস্য পরিহাস, তাহার পক্ষে কিছুই নূতন নাই। তাহার সকল সাধ মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বাঁচিবার আশা কমে না, কেহ তামাসাচ্ছলে মৃত্যুর কথা কহিলে, বৃদ্ধ বিকৃতমুখে তাহার উত্তর দেয় ও আন্তরিক কষ্ট বোধ করে। যদি এই পৃথিবীর সকলই তাহার পুরাতন, নূতন কিছুই নাই, তবে তাহার বাঁচিবার সাধ এত অধিক কেন? জীবনের প্রতি মমতাই ইহার একমাত্র কারণ। বাড়ীতে চাকর রাখিলে সে যদি দীর্ঘকাল গৃহস্থের কাজ করে, অনুগত থাকে, তবে তাহার প্রতিও স্নেহ বসে, তাহার সুখে সুখ, তাহার দুঃখে দুঃখ জন্মে। গবাদি গৃহ পালিত পশু, পোষা পাখী মারা পড়িলে মনে কষ্ট হয়, পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা অপেক্ষা একটা ভাল ঘর প্রস্তুত করিলেও পুরাতনের জন্য মনটা কেমন করে; যে স্থানে জন্মগ্রহণ করা যায়, বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, সে স্থানটা ত্যাগ করিতে সহজে ইচ্ছা জন্মে না, কোন লোকের সহিত দীর্ঘকাল জানাশুনা থাকিলে তাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখের উদয় হয়। এ সকল কেবল বহুদিনের পরিচয়ের ফল, আমাদিগের এই জীবন, জননীজঠর হইতে যাহার সহিত পরিচয়, যাহার সহিত দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া কত নূতন বস্তু দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছি, নূতন শব্দ শুনিয়া শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতেছি, প্রতিদিন নূতন জ্ঞান লাভে মানস মন্দির উজ্জ্বল করিয়া দশজনের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি, যাহার সঙ্গে এই নানা রঙ্গময়ী ধরামধ্যে অবস্থিতি করিতে পাইব তাহাতে যে সকল অপেক্ষা অধিক মমতা জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে। অজ্ঞান শিশুর এ মমতা নাই, সে মরা বাঁচা জানে না, যতদিন সে অজ্ঞ থাকে, ততদিন তাহার মাতাপিতা তাহাকে যত্নে প্রতিপালন করেন, তাহাকে সুস্থ সচ্ছন্দ রাখিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন পরে তাহার বয়োবৃদ্ধি হয়, ভাল মন্দ জানিতে পারে, আপনার দেহের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য বুঝিতে পারে, জীবন যে কি, তাহার সহিত দেহের সম্বন্ধ কতদূর, যখন তাহা জানিতে পারে তখন তাহার জীবনে মমতা জ

মৃত্যু ভয় জন্মিতে থাকে; এই বৃত্তি বালকের অতি কম, যুবার ততোধিক, বৃদ্ধের আরও অধিক, অজ্ঞতা বশতঃ বালকের কম; জ্ঞান সত্বেও যৌবন সুলভ চাপল্য, ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতা ও হঠকারিতা বশতঃ বৃদ্ধের অপেক্ষা যুবার অল্প, বৃদ্ধ বহুদর্শী, জ্ঞানবান, জীবনের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, যৌবনের ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতাদি তাহার কিছুই নাই, দেহে পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, অস্থ দন্ত বিহীন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেরূপ প্রাখর্য্য নাই, সকল কাজেই অসমর্থ, এ অবস্থায় স্বতই সাবধানতার বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেক কর্ম্মে সন্দেহ, ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যৌবনে বহু আয়াসে যে সমুদায় বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছে এই সময় তাহারা ফলবান হইয়াছে, অনেকে সখের যে সকল গৃহ রচনা করিয়াছিল তাহাও এখন দীর্ঘকাল ভোগ করা হয় নাই; যে সকল পুত্র পৌত্রদিগকে বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখাইয়াছে তাহাদের এই উপার্জ্জনের সময়, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত দেহে শ্রম করিয়া যে সমস্ত বিষয় বিভব সংস্থান করিয়াছে সে সকল দীর্ঘকাল নিজে ভোগ করিতে হইবে, এই সকল কারণে জীবনের প্রতি মমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতি বৃদ্ধ হইলে জীবন একরূপ ভার ভূত বলিয়া বোধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকারিতার অনেক হ্রাস হইয়া আইসে, চক্ষু বিকৃত হইয়া পড়ে, স্পষ্ট দর্শন চলে না, কর্ণ বধির হইয়া আইসে, উচ্চস্বরে কথা না কহিলে শুনিতেও পায় না, জিহ্বার আস্বাদন শক্তি কমিয়া আইসে, শরীরের পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া পড়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হয়, দর্শন হীন হয়, বদনের চর্ব্বণ সুখ একবারে যায়, পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া আইসে, আহারে সুখ জন্মে না; জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর জড়তায় বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না; দৌর্ব্বল্যবশতঃ সর্ব্বাবয়ব কাঁপিতে থাকে, ইন্দ্রিয় বিকৃতিতে জ্ঞান ও স্মারকতা শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে। এরূপ স্থবিরের পক্ষে জীবনের প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখিতে পাই না, এ অবস্থায় জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু আশ্চর্য্য মমতা। ঈশ্বরের কি ঐন্দ্রজালিক মায়া। এ অবস্থাতেও লোক মৃত্যুর সাধ করা দূরে থাকুক বরং দীর্ঘজীবন কামনা করে। যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধ যে মৃত্যুকে অধিক ভয় করে, তাহার কারণ আছে। যুবা জানে যে সে এইমাত্র জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে; বল, বুদ্ধি, ভরসা

সবে এইমাত্র তেজ করিয়া উঠিতেছে, নূতন সংসারে এত অভিনিবিষ্ট যে হয়ত তাহার মনে পরিণাম চিন্তার উদয়ই হয় না। সাংসারিক কার্য্য কলাপে এত ব্যস্ত যে সে ভাবনা ভাবিবার হয়ত সময়ও পায় না, যদি পায়, মনে করে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তবে শরীরের কথা বলা যায় না সময় নাই অসময় নাই যদি অকস্মাৎ দেহ-যন্ত্র বিকল হইয়া অসংস্কার্য্য হয়, অমনি ফুরাইয়া যায়—যদিও জল বায়ুর দোষে সুরাপান ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে আজি কালি অকাল মৃত্যু অসাধারণ নহে, তথাপি অস্বাভাবিক ঘটনা বলিতে হইবে।

বৃদ্ধ জরাভাবে বল বুদ্ধি হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, পরলোক যাত্রার পূর্ব্ব সংবাদ প্রাপ্ত হয়, জানিতে পারে অতি সত্বরেই তাহাকে সাধের বাড়ী ঘর, বিষয় বিভবের মায়া কাটাইয়া বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনদিগের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে, জন্মভূমি আত্মীয় পরিবারবর্গের মায়া এমনি যে কাহারও প্রতি কারাবাস বা দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা হইলে সে কত আকুল, কত ব্যথিত, কত বিপন্ন হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সে সকল একবারে ত্যাগ করিতে হয়, তাহার পক্ষে এটী কত যন্ত্রণাদায়ক। মায়াতেই জগৎ চলিতেছে, মায়াবন্ধন না থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি চলিত না, সেই ঐশ্বরিকী মায়া পাশ ছেদ করা সামান্য মনুষ্যের কর্ম্ম নহে; জীবনের সহিত নাকি ইহলোকের যাবতীয় পদার্থের সম্বন্ধ সেই জন্যই জগতের যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা জীবনে এত অধিক স্নেহ ও মমতা জন্মে। সত্য বটে অনেকে ক্রোধ, লজ্জা, অপমান, দুঃসহরোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হয়, সে কেবল তাহাদিগের আকস্মিক উত্তেজনাজনিত চিত্তবিকৃতির ফল। আত্মহত্যা কখন লোক সমক্ষে সংঘটিত হইতে শুনা যায় না, আত্মহত্যাকারী উত্তেজনা কালে যদি উপদেশ পায়, বা তাহাকে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কিম্বা সে স্বয়ং যদি সে বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আত্মজীবন নাশে নিবৃত্ত হইয়া যায় সন্দেহ নাই। মনুষ্যের জীবনাশা বড় অল্প বলবতী নহে, বরং সকল মনুষ্যে অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যূনাধিক্য আছে; কোথাও বা একেবারে কোন কোনটার অভাব দেখা যায় কিন্তু এই অসামান্য বৃত্তি

বিহীন লোক জগতে অতি বিরল। ইহার আতিশয্য বশতই "প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে যযাতি জরা ভার অর্পণ করিয়াছিলেন"। ইহা অপেক্ষা বার্দ্ধক্যে জীবনের মমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কোথায় মিলিবে?

উচ্ছ্বাস।

(চতুর্দ্দশ পদী।)

কোমল কুসুমে তুলি, নিষ্ঠুরতা তব ভুলি,
কে হেন নিরেট বোকা হাতে হাতে সপে দিল?
ভেবে ছিল ভালমনে, তুষিবে কুসুম ধনে,
কি ভাবিল একি হল, কেনরে সে শুকাইল?
নারীর কোমল-প্রাণে, সবই সয় সবে জানে,
তাবলে কি সহাইতে হয় যত সয় প্রাণে?
কেমনই পুরুষ চিত, ভ্রমে পড়ি অবিরত,
সুধা ছাড়ি নিরবধি, যায় ছুটে বিষ পানে।
সেও ভাই, ক্ষতি নাই, সুখ পেও, এই চাই,
সুখে থেক এই আশা জানি সুধু এ জীবনে।
আমি জানি তোমা ধনে, চাহিনা তোমার মনে,
তুমি চেও যারে পেয়ে সুখী হও এভুবনে।
কুসুম, তবেলো কেন আক্ষেপ করিস্ হেন,
সেযে তোর দেব—তুই থাকিবি লো সে চরণে।

শ্রীমতী শ, কু, বি।

অসার কে?

পৃথিবীতে অসার কে? মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদাদি লইয়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য কে? কন্দর্পকান্তি হইয়াও নিকৃষ্ট অস্পৃশ্য জীব অপেক্ষা হেয় কে? বিদ্যায় সরস্বতী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইয়াও জনসমাজে অনাদরণীয় কে? বিপুল বিত্তের অধিপতি হইয়াও সমাজের কণ্টক তুল্য কে? রাজদ্বারে অতুল সম্মানিত হইয়াও সাধারণের অভক্তি-ভাজন কে?

যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরম শোভনীয় বিনয়গুণে আপনাকে সাজাইতে না পারে, পদগৌরবের গরিমায় যে আপন অপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার না করিয়া মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ জীবের ন্যায় জ্ঞান করে, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপে যে আপন মর্য্যাদার অপচয় জ্ঞান করে, চাটুকারিতা দ্বারা স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্মাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে ব্যক্তি বিনয় ও শিষ্টাচারের পাঠ অভ্যাস করে না, যে ব্যক্তি আপনা আপনি বড় হইবার ইচ্ছায় নিয়ত পেচকের ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, আর কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সহস্র সহস্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি করযষ্টি-অবলম্বী, চির পরিহিত বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জদিগের বিনয়-প্রার্থনা-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বারাঙ্গনা ভবনে গিয়া সুরাদি মাদক দ্রব্যের জন্য অকাতরে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করে, পরদুঃখে যাহার মন আর্দ্র হয় না; অনাথ দীনহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগকে রুক্ষ জীর্ণ শীর্ণ অনাবৃত অঙ্গে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিতে দেখিয়া যাহার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু না আইসে, পরম ভক্তি-ভাজন ইহলোক দেবতা স্নেহময় জনক ও সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী করুণা জননীকে যে না মনের সহিত ভক্তি করে, এবং তাঁহাদিগকে সেবার জন্য আপনার দেহ, মন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত ভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হইতে পারে, বা তাহাতে কষ্ট বোধ করে; পতিপ্রাণা সরলা

সহধর্ম্মিণীর বিশুদ্ধ প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি পশুজাতীয় আমোদের জন্য বারবিলাসিনী সহবাস বাঞ্ছনীয় বোধ করে; যে ব্যক্তি পতিপুত্র বিহীনা স্ত্রী, অনাথ মাতৃ পিতৃ বিহীন বালক বালিকা কিম্বা অপর কোন সরলমনা ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিষয়ে বঞ্চিত করিবার জন্য শঠতা জাল বিস্তারে, সামান্য অকিঞ্চিৎকর অর্থোপার্জ্জনের জন্য অমূল্য নরজন্মসার পরলোকসম্বল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়; যে ব্যক্তি জগদারাধ্য পরমকরুণাকর জগদীশ্বরে বিশ্বাস না করিয়া অকাতরে পাপকার্য্য করিতে মনে কষ্ট বোধ না করে; সে ব্যক্তি যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় মানী, যত বড় ধনী, যত বড় রূপবান, যত বড় গুণমান্ হউক সে ব্যক্তি অতীব হেয়, অতীব ঘৃণ্য, তাহার তুল্য অসার আর কেহ নাই। তাহার ধন, তাহার রূপ, তাহার গুণ, তাহার অঙ্গ শোভা তাহাকেই থাকুক। সে ব্যক্তি মনুষ্য শ্রেণীতে গণ্য হইতে, মনুষ্য নামগ্রহণে, যোগ্য হইতে কখনই অধিকারী হইতে পারে না।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সময়। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। ব্যবসায়ী যন্ত্রে মুদ্রিত। কলিকাতা। নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

যখন বঙ্গবাসী প্রথম বাহির হয়, তখন আমরা বলি যে এরূপ সুলভ মূল্যে এরূপ বৃহৎ পত্রিকা আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। আজি আবার বলিতেছি যে "সময়" ও "সঞ্জিবনী" তুল্য সুলভ মূল্যের বৃহৎ পত্রিকা আর নাই। যাহাই হউক আমরা আন্তরিক আহ্লাদ সহকারে পত্রিকা দুখানি পাঠ করিয়া থাকি। এদুখানি পত্রিকাই যে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা এত বড় কাগজ এত সুলভ মূল্যে দিয়া বাঙ্গালির রুচি পরিবর্তিত করিতে, ও সাধারণের দ্বারে

দ্বারে রাজনীতির কথা উত্থাপন করিতে এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। লেখা বেশ সরল ও সতেজ, এরূপ পত্রিকার প্রচার যত বাহুল্য হইবে ততই দেশের মঙ্গল তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা এরূপ উৎকৃষ্ট পত্রিকার স্থায়িত্ব বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ করি না, যখন বঙ্গবাসীর ৮৫০০ গ্রাহক হইয়াছে, তখন ইহাদের কেনই বা না হইবে। বঙ্গবাসী সম্পাদক আধুনিক পাঠকগণের রুচি বুঝিয়া নানা ধরণের নানা বিষয় লিখিয়া সংবাদ পত্র নামধারি বঙ্গবাসীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু সংবাদ পত্রে সে সমস্ত প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। বঙ্গবাসী ব্যবসায়ী লোক, সুতরাং বঙ্গবাসী সে সুযোগ ছাড়েন না, স্রোতে গা ঢালিয়া দেন, অর্থ সংগ্রহ ও গ্রাহক বৃদ্ধি করা তাঁহার যত উদ্দেশ্য তত আর কিছুই নয়। বঙ্গবাসী ও স্কুলের বালক একইদরের লোক, ইহারা হুজুগ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু "সময়" ও "সঞ্জিবনী" সে ধরণের পত্রিকা নহে। ইহারা বুঝেন যে পাঠকের রুচি নাই, রুচি লেখকের লেখনীর তেজ। লেখক গুণে পাঠকের রুচি। আমরা আশা করি "সময়" ও "সঞ্জিবনী" এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে যেন বিস্মৃত না হন, হুজুগে না ভুলেন, যদিও একটু আধটু ভুলিয়া থাকেন, তাহা যেন সামলাইয়া লন, তাঁহাদের পত্রগুলি যেন প্রকৃত প্রস্তাবে "সংবাদ পত্র" হয়, বঙ্গে সে রূপ সুলভ সংবাদ পত্রের অভাব বটে।

বঙ্গবাসী সম্বন্ধে শেষ দুই এক কথা বলিবার আবার আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। বঙ্গবাসীকে আর একবার দুই এককথা বলায় বঙ্গবাসীও দুই সংখ্যা আদরিণীতে বিশেষ কিছু পাঠ্য নাই বলেন, যদি বঙ্গবাসীর এ কথা গুলি ভাল না লাগে তাহা হইলে আবার না হয় বলিবেন। আমরা বঙ্গবাসীর সেরূপ ভ্রূকুটী ভাঙ্গিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি না। বলিতে কি বঙ্গবাসী প্রথম সুলভপত্র, বঙ্গবাসীর পূর্ব্বে কখন এরূপ সুভ মূল্যের পত্র প্রকাশ হয় নাই। আর বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের যে এত গ্রাহক হইতে পারে তাহাও অনেকের ধারণা ছিল না, সে নিমিত্ত সে সাহসের নিমিত্ত আমরা

বঙ্গবাসীকে একবার নয়, শত বাব, সহস্রবাব ধন্যবাদ দি। আমরা পূর্ব্বেই বলিযাছি বঙ্গবাসী ব্যবসাযী লোক, তিনি এখন ও বিশ্বাস কবেন না যে "সময়," বা "সঞ্জিবনী" স্থাযী হইবে। যাই "সময" ও "সঞ্জিবনী" বঙ্গবাসী অপেক্ষা বৃহদাকাবে প্রকাশিত হইল, অমনি তিনি বঙ্গবাসীব আকার দ্বিগুণিত কবিলেন, কিন্তু তাহা "ক্রোডপত্র" তাঁহার নাকি বিশ্বাস নাই যে সময ইত্যাদি স্থাযী হইবে তাই অতিরিক্ত কাগজটী ক্রোড পত্র—উক্ত পত্রিকাগুলি লয প্রাপ্ত হইলে আবাব ক্রোড পত্র যাইবে, বোধ হয এরূপ ইচ্ছা আছে। তাই বলি বঙ্গবাসী ব্যবসা বুঝেন, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা তাঁহার এ ব্যবসাব নিন্দা কঁবি না ববং প্রসংশা করি। যাহাই হউক বঙ্গ-বাসী যখন এটুকু বুঝিযা এত বড ক্রোড পত্র দিলেন, তখন লেখাব প্রতি পূর্ব্ব মনযোগ কোথায় গেল? এটী বঙ্গবাসীব শুভ চিহ্ন নহে।

আমবা পূর্ব্বে বলিযাছি বঙ্গবাসী হুজুগ চায, তাহাব এক প্রধান হুজুগ "পঞ্চানন্দ"। সাধাবণী এক দিন লেখেন যে বঙ্গবাসীতে পঞ্চানন্দেব আবির্ভাব হইবে, এবাব অষ্টবজ্র একত্রিত হইল—সাধু সাবধান! আমবা সাধু নহি সুতবাং সাবধান হইতে পাবিলাম না। সংবাদ পত্রে পঞ্চানন্দ কেন? আর ভাযা পঞ্চানন্দ কি কলিকাতাব গ্যাসেব আলো ও কলেব জলে মজিযা বর্দ্ধমানেব বাঙ্গামাটি ভুলিলেন?

পঞ্চানন্দ ইচ্ছা কবিলে সংবাদ পত্রেব উপযোগী কবিযা লেখনী ধারণ কবিতে পাবেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহা কবেন নাই। তাই দুই এক কথা বলিলাম। সুধু হাসিবাব আবশ্যক নাই, রুচিব প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই নতুবা "একজন এম-এগ্রস্থ বাবু এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিযাছেন, যে দোকানে না লইযা বঙ্গ মহিলাবা আমাব নিকট পত্র লিখিলে অর্দ্ধমূল্যে "ভাঁল বাসা" পাইবেন। পঞ্চানন্দ জানিতে চাচ্ছেন, ভালবাসাব আশায বঙ্গমহিলারা সশবীবে বাবুর কাছে উপস্থিত হইলে অমনি পাইবে কি না? কথাটা নাকি উঠিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা কবিযা সন্দেহ ভঞ্জন কবা আবশ্যক হইযাছে।"

এরূপ জঘন্য কুরুচিকর ঘৃণোদ্দীপক রসিকতা, যে রসিকতা অনুসন্ধান করিলে পথে ঘাটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায সেরূপ রসিকতার অবতারণা

করিয়া বহুবচনান্ত বঙ্গমহিলার বিন্দুমাত্র অবমাননা বা লজ্জার উদ্রেক করিতে লজ্জিত না হইয়া যিনি পঞ্চানন্দী নাম জাহির করিতে চান, তিনি যদি পঞ্চানন্দ—এত আড়ম্বর ময়, নাম জাদা পঞ্চানন্দ তবে যাত্রার সং ও সার্কাসের ক্লাউনেরা কেন পঞ্চানন্দ নয়?

এ বিষয়ে বঙ্গবাসী সম্পাদকের লক্ষ্য রাখা উচিত, কিন্তু দেখিলাম—"বঙ্গ-বাসীর এই অংশ সম্পাদনের ভার পঞ্চানন্দ সম্পাদকের উপরেই রহিবে।" ইহাতে কি বুঝিব?—পঞ্চানন্দ নামক বঙ্গবাসীর কলম পুরাইবার জন্য যদি কেহ লেখনী ধরেন, তবে সে লেখা গুলি পঞ্চানন্দ সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন, তিনি ধোলাই করিয়া বা চাকিয়া "বঙ্গবাসীতে পাঠাইবেন—কিম্বা ইহাতে যাহা কিছু ছাপা হইবে তৎসম্বন্ধে বঙ্গবাসী সম্পাদকের কোন সংশ্রব নাই। যাহা দেখিবার বা বুঝিবার তাহা তিনি বর্দ্ধমান হইতে দেখিবেন বা বুঝিবেন। ইহাতে বঙ্গবাসীর লভ্য কাগজ পোরা, আর পঞ্চানন্দের লভ্য লয়প্রাপ্ত পঞ্চানন্দকে যেন তেন প্রকারেণ পুনর্জ্জীবিত করা। যদি তাহাই হয় তবে বড় দুঃখের বিষয় বটে। তবে বঙ্গবাসী সম্পাদক আর কি বলে "ভূমি শূন্য রাজ্‌ রাজ্‌ডার ধামাধরার কাজ।" একই কথা নাকি?

বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা লাইব্রেরির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ।

"পুস্তকালয়টীর বেশ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। আজ কাল অনেক গুলি পুস্তকালয়ের পুস্তক ক্রয়ের ব্যয় অপেক্ষা, ছাপাই খরচ অধিক;—এটির তাহা নাই।"

নৈশ বিহার।

—:o:—

শ্রীক্ষেত্রে।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আমি সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতে উপস্থিত। নৈশ গগনের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিতে কুমুদিনীনায়ক শশধর সমুদিত। চাঁদের হাসি, সেই বিশ্ববিমোহন হাসি, প্রকৃতির সর্ব্বশরীরে উছলিয়া পড়িতেছে। শশধর আকাশের সুনীল কোলে বিমল কৌমুদিরাশি ছড়াইয়া হাসিতে হাসিতে যেন কোথায় কাহার উদ্দেশে ছুটিতেছে, কে জানে চাঁদ তোমার কি উদ্দেশ্য ? তোমার সে নিগুঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার আমার এ সময় নয়, এখন আমি তোমার শোভায় বিমোহিত। এ পর্য্যন্ত আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার শোভার শেষ দেখিতে পারিলাম না। যত দেখি ততই নূতন, ততই মধুর—ততই অপূর্ব্ব।

পাঠক! আজি আমার সম্মুখের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছ কি? যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দিগন্ত প্রসারি সাগর ও অনন্তব্যাপি ধূমরাশি। আমার শ্রুতিবিবরে শোঁ। শোঁ। রব যেন লাগিয়া রহিয়াছে। যেদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করি সেই দিকেই দেখি যে আকাশ ও সমুদ্র পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছে, পরস্পরের সঙ্গমে প্রকৃতি এক হইয়া যেন আপন করালবদন বিস্তার করিয়াছে। আর চাঁদ তুমি তাহার মধ্যে বসিয়া সুখের হাসি হাসিতেছ। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির যেন সে হাসি ভাল লাগিতেছে না। তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তোমায় ধরিতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না, ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমি তাহাদের আশা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পরিহাস করিতে করিতে সরিয়া যাইতেছ। আবার দেখি তা কেন, তুমি ত শুধু আকাশে নাই, তোমার বিলাস ক্ষেত্র সমুদ্রও আকাশ। সাগর যেন তোমায় পাইয়া তোমার বিমল ছবি বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। হাসির তরঙ্গে কর্ণ বধির করিতেছে।

আবার দেখি সাগর মধ্যে একখানি অর্ণবপোত তরঙ্গাভিঘাতে নাচিতেছে, দুলিতেছে, খেলিতেছে, কৌমুদী তরঙ্গে অঙ্গমিশাইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে। যে দিকে দেখি সেই দিকেই নূতন দৃশ্য—যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই প্রকৃতির অপূর্ব্ব মধুরিমা।

পশ্চাৎ ফিরিলাম,—শ্রীক্ষেত্রের সেই শ্রীমন্দির, সেই সিংহদ্বার, সেই সমস্তই আমার নয়নপথে পতিত হইল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখি, যে সুদর্শন যেন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ জগন্নাথের শ্রীমন্দির প্রতি স্থির দৃষ্টি হইয়া রহিলাম। তখন ক্রমশ যেন আমার হৃদয় কবাট উন্মুক্ত হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে যেন হৃদয়ে কত প্রকার নবভাব সমুদিত হইতে লাগিল।

প্রথম মনে হইল—হিন্দুধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচার, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক পাঞ্চালীর পতি হওনরূপ অসভ্যতা ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার দোষ হৃদয়ে আবির্ভাব হইতে লাগিল—পরে ভাবিলাম হায়, তবে আর্য্যসন্তানেরা কি এত মূর্খ ছিলেন? আমরা যে ধর্ম্মকে এত হেয় বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি, আর্য্যগণ কি করিয়া সেই হেয় ধর্ম্মের অনুশীলনা করিয়াছেন। আমি অনেকক্ষণ এই চিন্তায় মগ্ন রহিলাম, পুনর্ভাবিলাম এই যে জগন্নাথ তীর্থ—যেখানে সময়ে সময়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণী সমাগত হয় ইহা কি? এখানে আসিবার কি কাহার কোন উদ্দেশ্য নাই?—

দেখিলাম জগন্নাথ তোমার উদ্দেশ্য নাই এমত নহে, অতি মহান্ উদ্দেশ্য আছে। মনে হইল যিনি যিনি যে মহান্ ব্যক্তি এই শ্রীক্ষেত্রের স্থাপয়িতা তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। শ্রীক্ষেত্র তুমি অন্ধ মনুষ্যকে যে শিক্ষা প্রদান কর, সে শিক্ষা এ অন্ধতম ঊনবিংশ শতাব্দিতে কেহ কাহাকেও দেয় কিনা সন্দেহ। বঙ্গবাসি! যদ্যপি একপ্রাণতা শিক্ষা করিতে চাও, যদি ভাই ভাই এক হইতে চাও, যদি জাতিভেদ বিস্মৃত হইতে চাও তবে শ্রীক্ষেত্রে যাও। আর হিন্দুধর্ম্ম তোমার কি শিক্ষা দিবার কৌশল, তুমি ধর্ম্মের সহিত কি সমাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু মনুষ্য অন্ধ, মূর্খ সে তোমার গূঢ় তাৎপর্য্য চিন্তা করে না, সে তোমার মহৎ উদ্দেশ্যের গভীর গর্ভে প্রবেশ করিতে চায় না। উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। তুমি

নাস্তিক হও, আস্তিক যে হও তোমার এই পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মে আস্থা প্রদান করিতে ভ্রমেও বলি না। তোমার বিশ্বাস হয় করিও, না হয় করিও না, কিন্তু একবার সেই আর্য্যগণের, বাঙ্গালি! তোমার সেই স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মের সহিত সমাজ বন্ধনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি স্মরণ কর। শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইলে ধর্ম্ম না থাকুক,—সে কথা বলিতেছিনা, তুমি একবার জ্ঞান চক্ষু বাহির করিয়া চাহিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব ভাব, কি হৃদয়-হারী জ্ঞান, কি মানসমুগ্ধকারী সমাজবন্ধন। কে যেন সকলের কাণে কাণে বলিতেছে "এই নাও আমি তোমার মুখে আহার্য্য তুলিয়া দি, তুমি খাও, জাতিভেদ ভুলিয়া যাও, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যাও। একপ্রাণতা শিক্ষা কর।" আমি অনেকক্ষণ ইহার নিগুঢ়তত্ত্ব চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলাম। শ্রীক্ষেত্রের স্থাপয়িতা—তিনি দেবতাই হউন আর মানবই হউন, আমি মনে মনে তাঁহাকে, তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তখন কে যেন আমার কাণে কাণে বলিল, মূঢ় ইহাই সমাজবন্ধনের শেষ নয়। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই শেষ শিক্ষা নয়। কোন দিকে দেখিবে? যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের অসীম গুণের, গাঢ় চিন্তার, এবং সমাজ সংস্কার প্রিয়তার অপূর্ব্ব চিহ্ন দেখিবে।

ঐ দেখ যমুনার পরপারে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কি কীর্ত্তিই না করিয়াছেন। বাঁশির রবে যমুনা উজান বহিত। পাঠক! ইহা কি? ইহা প্রণয়ের জলন্ত মূর্ত্তি। বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি পর্য্যন্ত প্রেমভরে নত। ব্রজবালাগণ এখনও সন্ধ্যাকালে দীপালোকের ঘটা করিয়া মহাসমারোহে সেই প্রণয়বিপুল শ্রীকৃষ্ণের আরতি সন্দর্শন করে। বৃন্দাবন সেই প্রণয়ের রঙ্গস্থল, মানবকে প্রণয় শিক্ষা দেয়। ইহা দ্বারা যে কেবল প্রণয় শিক্ষা হয় তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের অমর জীবনী শুধু প্রেম শিখাইবে না, প্রণয়ের সহিত রাজ-নীতি বীরত্ব ও অকুতো সাহসের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কি বিপুল প্রেম! সে প্রেম যে কেবল কুলকামিনী রমণীতে ন্যস্ত ছিল তাহা নহে,—কি গোপবালা, কি গোপবালক কি সাধারণ লোক সকলেই সে প্রেমে পাগল ছিল। বনের পাখি, বনের গাছ, বনের লতা, বনের ফুল পর্য্যন্ত যে প্রেমে গদগদ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমার নিন্দা করি

না। তোমাব সমস্ত গুণই দেখিতে পাই। তোমাব অক্ষয কীর্ত্তিব অক্ষয় গুণ আমার হৃদয রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আবাব এদিকে এই মহানগবী কলিকাতাব কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যাও—দেখিবে করাল বদনা ভীমা কাত্যাযনী করাল বদনব্যাদান করিয়া অসি হস্তে নবমুণ্ডমালা পরিধান করিয়া যেন তাধেই তাধেই করিয়া নৃত্য করিতেছেন। যেন শক্র বিনাশে ক্ষীপ্রহস্ত। যে জাতীব কুলরমণীবা পর্য্যন্ত শক্র বিনাশে এত উৎসুক, এত যত্নবতী, তাহাদেব উন্নতিব অবধি কোথায? ভাই আমেরিকান তোমাদেব রমণীবা কি এই দীপিচর্ম্ম পবিধানা লোলজিহ্বা বিভীষনা কপালিনীব শক্র বিনাশেব অনুকরণে স্বাধীনতাব বিজয নিশান স্বদেশে অক্ষয়রূপে উড্ডীন করিতে সৈনীক জীবন অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইযাছে? যাহাই হউক এ সমস্ত চিন্তা করিযা আমাব মনে হিন্দুধর্ম্মেব গুঢতত্ত্বের প্রতি বডই আস্থা জন্মিল, সমযে সমযে হিন্দুধর্ম্মেব গুঢতত্ত্ব অনুসন্ধানে যত্নপর হইব ইহা স্থির করিলাম। চিন্তাবেগ হ্রাস হইল—অমনি সেই সাগর কল্লোলেব শোঁ শোঁ রব আমার কাণে পশিল। তখন দেখি চন্দ্র যেন আমাকে এই সমস্ত বিষয চিন্তা করিতে দেখিয়া হাসিতেছে। সাগর যেন তাহা বুঝিযা আনন্দে বাহু তুলিযা নাচিতেছে। আমাব মনে আনন্দ উছলিযা উঠিল। তখন মনে হইল ভাই বঙ্গবাসি। তোমরা হিন্দু ধর্ম্মেব এ গুঢতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া কেন হৃদয়কে সুখী কর না, কেন সমাজেব উন্নতিকল্পে যত্নপর হও না?

তখন আমি মনে মনে সেই জগন্নাথক্ষেত্র, সেই সুন্দর শ্রীমন্দির, সিংহদ্বার, গড়ুরস্তম্ভ, পতিতপাবনেব মন্দিব, তরঙ্গসঙ্কুল সাগব, শুধাংশু—আবাব কখন বা যমুনা তটস্থ বৃন্দাবন, আদিগঙ্গাকুলস্থিত কালীঘাট প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

উচ্ছ্বাস।

১

উন্মাদ হয়েছি প্রাণে,
সুধু তোর ছবি ধ্যানে
তবু কি নিঠুরা তুই
ভাল মোরে
বাসিবিনা ?
কেঁদে মরি
তোর তরে,
দিবানিশি ঝর ঝরে
ভাল রে কঠিন প্রাণ
এক বিন্দু কাঁদিবিনা ?

২

চোখে দেখা
চোখে আঁকা,
মনে আঁকা মাখা মাখা,
মাখা মাখি করে কেন,
কাঁদাইলি মোরে হেন ?
ভাল অবলার চিত,
ভাল লো রমণীরীত,
ভাল খেলা শিখাইলি, ভাল প্রেম দেখাইলি,
সুধু প্রাণে লাগাইলি, সুধু প্রাণ পোড়াইলি ?
তোমরা অবলা যদি
সবলা কোথায় আর ?
তোমরা সবলা যদি
সরলতা নাহি কার ?

৩

বলি শুন।—

দেখে কি পাগল মন,

• দেখে কি পাগল জন,

দেখে কি প্রণয় স্রোত তীব্র বেগ তার,

করে সুধু প্রেম ভান, ভেঙ্গে দিলি মনপ্রাণ,

দেখাইলি প্রণযেতে জলন্ত বিকার?

ভালরে অবলা জাতি,

ভালরে সবল মতি,

সবই ভাল,

তোর পদে

প্রণাম আমার।

৪

অবলা সবলা প্রাণ

না না সবলতা ভান,

করে সুধু প্রেমিকেরে

করিতে নিধন।

'অবলা সরলা বালা, নাহি জানে কোন ছলা,'

আর নাহি সেই কথা

মানেরে এ মন।

৫

একটী মিনতি করি,

তোমার চরণে ধরি,

যা হবার হইযাছে, প্রেম সুখ পশিয়াছে,

হৃদয়ের অন্তস্তলে

বড় মনোরম।

আর নয, এই শেষ,

আশার আশার লেশ,

দূরে গেছে প্রাণ হ'তে নাহিক এখন,
দেখা দিয়ে কাঁদাওনা,
ভালবাসি বলিও না,
ভালবাসা দেখাওনা,
দেখাইও নিষ্ঠুরতা তোমার ভূষণ।

৬

শিখিবে তাহাতে প্রাণ,
প্রণয়ের প্রতিদান,
আর কি শিখিবে ভাই, শিখিবে প্রণয় নাই,
ভাবিবে প্রণয় সুধু নিশার স্বপন।

৭

তোমার হৃদয় হ'তে,
আমি পারি দূরে যেতে
কি করে তোমার ছবি করিব অন্তর?
তবে সুধু কাঁদা সার, প্রেমে কিছু নাহি আর,
প্রণয়ের প্রতিফল হয়েছে বিস্তর।
জানি তারে পাইব না,
তবু তারে ভুলিব না।
ভালত নিষ্ঠুর সেই
সৃজিয়াছে প্রেমযেই?
ওহো প্রেম, ওহো যেই সৃজিয়াছে তোরে,
প্রণিপাত করি আমি বিষাদের ঘোরে।

কমলা।

—:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

———০:÷:০———

সখী-সমিপে।

এখন কমলার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, কমলা এখন দিবানিশি বিমর্ষ। সেই হাসি হাসি মুখ হইতে কে যেন জোর করিয়া হাসি কাড়িয়া লইয়াছে। সেই সুটানা নয়ন দুটীকে কে যেন জলে ডুবাইয়াছে। সেই সুবর্ণ লাবণ্য ছটাতে কে যেন কালিমা অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু কে জানে কেন এ বিষাদ কাননে যৌবন ফুল ফুটিল। কমলার এ যাতনা যৌবন বুঝিল না, সেই উষার ক্ষেত্রে সে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। যে সকল দেহায়তন ক্ষীণ ও অপুষ্ট ছিল, তাহা সরস ও পুষ্টিবান হইয়া উঠিল। কমলার অঙ্গে মদনের অপরূপ রাজ্যাধিকারের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। কমলার কোন যত্ন নাই, তথাপি তাহার যৌবন কাননে নিত্য নিত্য নবীন ফুল ফুটে, তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত করে।

কমলা এক দিন সন্ধ্যাসমাগমে তাহার প্রিয়সখী হরিদাসীর সহিত তাহাদের বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্করণীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিল। অনেকক্ষণ সেই আবক্ষ নিমর্জ্জিতা রমণীদ্বয় পুষ্করণী আলো করিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে হরিদাসী কহিল "ভাই। এমন সোনার প্রতিমা বিধাতা কেন সৃজন কর্‌লেন?"

কমলা। অন্তর্দাহ সহ্য কর্‌তে।

হরিদাসী। দেখ্ কমলা, তোকে দেখলে আমার বুকটা ফেটে যায়, দেখ ভাই এই পুকুরজলে রয়েছিস্, বোধ হচ্চে জলের কালরং যেন

তোর বঙ্গে আর নেই, আহা তোর যদি তখন বিয়ে না হ'ত, তা হ'লে বিধবা হতিস্‌নে। এ জীবনটা মিছে গেল, কোন সুখ পেলিনে। সব যেন স্বপন, যেন ভাই পুতুলের খেলা হয়ে গেল।

কমলা। শুনেছি ঈশ্বর দয়াময়, কিন্তু তিনি দয়াময় হয়ে কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করলেন। বয়ে পড়ি—পতিপ্রেম, কিন্তু পতিপ্রেম জানা দূরে থাকুক, পতিমুখ দেখেছি কিনা স্মরণ হয় না।

হরিদাসী। আহা তোর যদি তখন বিয়ে না হয়ে এখন আমাদের প্যারীদাদার সঙ্গে বিয়ে হ'ত তা হ'লে তুই কত সুখী হতিস্‌।

কমলার কপোলে, অধরে রক্তের সঞ্চার হইল, কমলা নিরুত্তর।

প্যারী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আমরা পরে করিব।

হরিদাসী। না কমলা, আমার কাছে লুকুস্‌নে, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই প্যারীকে ভালবাসিস্‌ না। আমি দেখেছি, তুই প্যারীকে দেখতে আকুল হস্‌, প্যারীকে দেখলে ভাল থাকিস্‌, আড়াল থেকে যেন অন্য কিছু দেখছিস্‌ এই ভাবে তাকে উঁকি মেরে দেখিস্‌।

কমলা। দেখ ভাই, প্যারীর মা বাপ নাই, আমাদের বাটীতে ছেলে বেলা থেকে আছে, কে জানে সেই জন্যে তার উপর কেমন এক প্রকার ভালবাসা জন্মেছে।

হরিদাসী। আচ্ছা প্যারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হতিস্‌ কিনা বল দেখি?

কমলা। তা কি করে বল্‌ব?

হরিদাসী। আজ কাল বিধবা বিবাহ নিয়ে যে হুলুস্থূল পড়েছে, এই সময়ে যদি তোর বাপ প্যারীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেন?

কমলা সে কথায় কান না দিয়া আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল "বল্‌না?"

কমলা বলিল "আর জলে মাতেনা ওঠ—"

হরিদাসী দেখিল কমলার চক্ষু ছল ছল করিতেছে, সুতরাং হরিদাসী সে কথা স্থগিত রাখিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিল। বসন্তকাল, দক্ষিণ দিক

হইতে মলয়নিল মৃদুমন্দ বাহিত হইতেছিল। একবার জোরে বাতাস বহিল, কমলার দেহ কণ্টকিত হইল, সেই সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কণ্টকিত হইল। সেই জনশূন্য স্থানে অসঙ্কুচিত চিত্তে রমণীদ্বয় অঙ্গ মুছিতে লাগিল। মৃদু পবন তাহাদিগের সুকোমল অঙ্গে উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাকাল সূর্য্যদেব যেন তাহাদের ছাড়িয়া আর যাইতে চান না। অগত্যা তিনি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন। অপরদিকে সেই শোভা দেখিয়া অবাক হইয়া যেন শশধর বিমান পথের পথিক হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্ন।

কমলা ও হরিদাসী গাত্র মার্জ্জনান্তর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া দুই সখীতে সেই কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে হস্ত সংস্থাপন করিয়াছে, যেন দুইটী রূপের তরঙ্গ একই স্থানে প্রতিঘাত হইতেছে। দুইটিই সুন্দরী, দুইটিই সমবয়স্কা। এ যুগলরূপ দেখিলে দর্শককে প্রকৃতই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। কোনটীকে দেখিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কমলার শরচ্চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়ী রূপলাবণ্য দেখিবেন, কি হরিদাসীর নিরুপম শ্যামবরণের ছটা দেখিবেন; উভয়েরই চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে, একটীতে যেন বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়িয়া চাঁদে মিশিয়াছে, আর একটীতে মনোরম নবঘনে স্থিরা সৌদামিনী, একটী অধরে বসরাই গোলাপের সৌন্দর্য্য, আর একটীতে ব্ল্যাকপ্রিন্স।

কমলা নানা ফুল তুলিয়া হরিদাসীকে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা করিল। হরিদাসীর কুসুমভূষণে যেন রূপলাবণ্য দ্বিগুণিত হইল। একটী বড় গোলাপ তুলিয়া বলিল "দেখ্ সই এই গোলাপটী দিয়া তোর স্বামীর পা পূজা করিস্?"

হরিদাসী কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া সেই ফুলটী ছুড়িয়া কমলাকে মারিল।

কমলা। আমায় মারিস্ কেন?

হরিদাসী। অমন কথা বল্লি কেন?

কমলা। আমি কি অন্যায় বলিছি।

হরিদাসী। সব্বাই পূজই করে কিনা।

কমলা গোলাপটিকে নখদ্বারা ছিন্ন করিল।

হরিদাসী। ফুল ছিড়্লি যে?

কমলা। ও ফুল জ্বলে গেছে।

হরিদাসী। কেন?

কমলা। আমার গায়ের আগুনে।

হরিদাসী দেখিল কমলার হৃদয় আবার বিচলিত হইয়াছে। তখন নানা কথায় কমলাকে অন্যমনস্কা করিতে চেষ্টা করিল, কমলার হৃদয় ক্ষণেক পরে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, কিন্তু সে বিষাদ তিরোহিত হইল না। অনেকক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হরিদাসী বলিল "চল বাড়ি যাই।"

কমলা। এখনি?—আমি জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে অনেকক্ষণ থাকি। আজ এখন যাবনা।

হরিদাসী। তবে আমি যাই।

কমলা। কেন লো গরহাজির দেখে রাগ কর্‌বে নাকি?

হরিদাসী হাসিতে হাসিতে বলিল "কি কর্‌ব ভাই যার খেতে হয়, তার দুট কথাও শুন্‌তে হয়, মনও যোগাতে হয়।

হরিদাসী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন কমলা একাকিনী সেই উদ্যানে আপন রূপের বিভায় চারিদিক সুশোভিত করিয়া একটী গোলাপ তরু সন্নিকটে দাঁড়াইল। তাহাতে একটী বেশ বড় গোলাপ ফুটিয়া ছিল। কমলা তাহা ছিঁড়িল, একবার আঘ্রাণ করিল। আবার সজলনয়নে ফেলিয়া দিল বলিল "না ফুল তোরে কাজ নাই, যার হাতে দিয়া সুখী হ'তে পারি তাকে ত দিতে পারব না।" আবার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "বিধাতঃ! একি করিলে?—বিধবা করিলে কিন্তু সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার

নিবৃত্তি করিলে না, যদি করিবে না জান তবে শ্রুতি দিয়া শ্রবণ শক্তি দাও না কেন? পিপিসা আছে পানীয় নাই কেন? না না বিধি তোমার দোষ নাই, আমার কপাল, ওঃ প্যারি! কেন তোমায় ভালবাসি, কেন তোমায় দেখে সুখী হই।”—কমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কি চিন্তা করিল, তাহার চক্ষে বেগে জল আসিল, কমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল “জগদীশ্বর আমি বিধবা, বাল বিধবা, আমার হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তি কেন, এরূপ আশার সঞ্চার কেন? এ বালিকা হৃদয়ে এ অসহ্য যন্ত্রণা কেন?”

এমত সময়ে সহসা তথায় প্যারী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্যারি কমলার দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব পুত্র। প্যারীর পিতা মাতার মৃত্যুর পর রামধন তাহাকে আপন গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। প্যারী যখন রামধন গৃহে আসে তখন তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র, প্যারী রামধন ও তাঁহার স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। আজি সে প্রায় ষোড়শ বৎসর রামধন গৃহে প্রতিপালিত। প্যারীর এখন যৌবনকাল, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যাকৃতি, নাসিকাটী বেশ উন্নত, অঙ্গাস তন মন্দ নয়। প্যারীকে দেখিয়া কমলা কিছু লজ্জিতা হইল। প্যারী কমলার পদতল সম্মুখে যে প্রস্ফুটিত গোলাপটী পতিত ছিল তাহা কুড়াইয়া লইল এবং কমলার হস্তে দিয়া বলিল “কমলা! গোলাপটী কাকে দিতে ইচ্ছা হয়?”

কমলা অধোবদনে বলিল “না—আ—”

আর কথা ফুটিল না।

প্যারী কমলার হাত ধরিয়া বলিল “কমল বল।”

কমলা কাঁদিতে লাগিল। সেই নলিনীনয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। প্যারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল “আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেছি, না প্রত্যক্ষ ঘটনা, কমলা—”

প্যারী একবার কমলার মুখপ্রতি চাহিল, চক্ষে জল আসিল, একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া চকিতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কমলা চিত্রাপিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———০ঃ০ঃ০———

আশার শেষ।

কমলা ক্ষণেক সেই স্থানে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কমলা গৃহে যাইয়া দেখিল শ্যামমোহিনী নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। শ্যামমোহিনী কমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা! এতক্ষণ কোথা ছিলি মা?"

কমলা। পুকুর ধারে।

শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার চক্ষু ফুলিয়াছে, রক্তাভ হইয়াছে, বুঝিলেন কমলা কাঁদিয়াছে। কমলাকে অন্যমনস্কা করিবার জন্য কহিলেন "আমি কি একলা এত কাজ কর্‌তে পারি, একবার এদিকে আয় না।"

কমলা মাতার কার্য্যে যোগ দিল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসিল "হ্যাঁ মা কে এসেছে গা এত আহারের উদ্যোগ কার জন্য কচ্ছিস্?"

শ্যাম। তোমার বাপের একজন বন্ধু, বাড়ী কল্‌কাতা, ভারি বড়মানুষ, এই দিকে কোথা যাচ্ছিলেন তাই দেখা কর্‌তে এসেছেন।

কমলা বলিল "আমি দেখে আসি"

শ্যাম। এস।

কমলা রন্ধনশালা ত্যাগ করিয়া চলিল। যে গৃহে কমলার পিতা বসিতেন, তাহার উত্তর দিকে একটী দ্বার ছিল, সে দ্বারটি বন্ধ থাকিত, কমলা সেই দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল যে অপরিচিত বাবুটী তাহার পিতার দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃতি শান্ত অথচ গম্ভীর। বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বর্ষ কি কিছু অধিক, কিন্তু মস্তকের কেশ এক গাছিও পাকে নাই। কমলা যে সময়ে উপস্থিত হইল সে সময়ে কমলার পিতার সহিত আগন্তুক বাবুটীর এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

বাবু। তাইত তোমার কন্যা বালবিধবা হয়েছেন শুনে যারপর নাই দুঃখিত হইলাম।

রাম। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা, হাত ত নাই,

বাবু। কিন্তু ভাই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেছেন সেটী ভারি উত্তম।

রাম। যদি চলে।

বাবু। চালালেই চলে।

রাম। কিন্তু এখনও চলেনিত?

বাবু। কেন চলবে না, দুই একটা বিবাহ প্রায়ই হচ্চে।

রাম মৃদু হাসিয়া কহিল "কোথায়"

বাবু। তবে তুমি কোন সংবাদই রাখনা।

রাম। তা হ'তে পারে।

বাবু। ভাই রাগ করনা আমার মতে তোমার মেয়েটীর বিবাহ দেওয়া উচিত, আহা মানুষের শরীর ত, তারা যে কত কষ্টে নৈশর্গিক বিকার দমন করে তা তারাই জানে, দিবানিশি তাদের মলিন বদন। বাপ মা হয়ে উপায় থাকতে ননীর পুত্তলীগুলিকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া আমার মতে সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাম। তা হ'লে সমাজ ছাড়্তে হয়।

বাবু। সমাজ কি, যা পাঁচজনে কর্বে তাইত সমাজ, একজন একজন করে কতজন করবে, তার পর তাই সমাজ হবে।

রাম। তা বটে কিন্তু অগ্রে করে কে?

বাবু। যার দরকার সেই কর্বে, তোমার দরকার তুমিই কর।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন "না আমার তত আবশ্যক নাই।"

বাবু। কেন?

রাম। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে তাদের প্রবৃত্তি হবে কেন?

বাবু। বটে! এতক্ষণে এই হ'ল কিন্তু ভ্রূণহত্যা হয় কেন?

রামধন হাসিয়া কহিলেন "সে সব আমাদের ঘরে নয়, নীচ জাতির বাড়িতে হয়।

বাবু। ঈশ্বর করুন তোমার কোন কিছু না হোক্, কিন্তু ভাই তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিবান্ ও বিবেচক হয়ে কি করে এমন কথা বল্‌লে তা তুমিই জান, আর—

রামধন বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ওকথা চুলয় জাগ্‌গে, চল তোমাকে আমাদের গ্রাম দেখিয়ে আনি।

বাবুটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "চল।"

কমলাও সেই দ্বারের অন্তরাল হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। কমলা শশব্যস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল। এমত সময়ে কমলার পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "কমলা শুনিসে" কমলা চমকিয়া উঠিল, দেখিল প্যারী। প্যারী আর কোন কথাই কহিল না, কমলার প্রতি একটী বিলাপ সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রমণী।

—:০:—

সংসার রঙ্গালয়ের প্রধান অভিনেত্রী সংসার সাগরের সহায়তরী, জীবনের প্রধান সম্বল—রমণি! তুমি যে কি তাহা আমরা বুঝিনা। মোহমুগ্ধ মানব অভ্রান্ত চিত্তে তোমার গুণ গান করে, তোমারই জন্য প্রাণ পন পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, অর্জ্জিত অর্থ তোমার হস্তে দিয়া সুখী হয় কিন্তু তুমি কে?

আমরা বলি রমণী তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব, তোমার সহবাসে আমরা জগতে এক অভিনব সুখলাভ করি, মনে মনে বলি তুমি আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব। তুমি আমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? মানব কেন তোমায় এত মুগ্ধ, তুমি কি মোহিনীমন্ত্র জান যাহাতে মানবগণকে এত দূর বশ করিয়াছ।

প্রথমত রূপ, তোমার ঐ মনমোহিনী চক্ষু, ঐ আরক্তিম বিম্বোষ্ঠ, ঐ

ঈষৎ উন্নত নাসিকা ঐ অমিয় রূপ সাগর যাহাতে মানব মন আকুল হইয়া ভাসিয়া যায়। কিন্তু কেন, মন কেন সেরূপে মুগ্ধ, সে সুধাপানে পাগল?

নূতন বস্তু নয়নপথে পতিত হইবামাত্র তাহা মানস আকৃষ্ট করে, ইহা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিকী ধর্ম্ম। সেই রূপসাগরে ভাসাইয়া মানব নয়নে একটী অভিনব বস্তু দেখাইয়া সেই সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া তুমি প্রথমত মানব হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। কিন্তু কালে যখন রূপ তৃষ্ণা মিটিয়া যায় তখন আপনা হইতে সে মোহিনী শক্তি সরিয়া যায়, তখন তুমি আর চিত্ত বিনোদন করিতে পার না, ক্রমে মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। কুরূপ মানব তখন আর তোমার মনযোগাইতে পারে না, সুরূপা রমণী তখন তুমিও তাহাকে আর ভালবাসিতে পারনা। তবে রমণী, তবে তোমার রূপে কেন মুগ্ধ হইব? পতঙ্গের ন্যায় পোঁকার মজায় পড়িয়া কেন অনলে আত্ম সমর্পণ করিব?

দ্বিতীয়তঃ তোমার গুণ—তোমার গুণের সীমা নাই, তোমার এক একটী, এক একটী স্বর্গীয় বস্তু—সতীত্ব, সরলতা, স্নেহ, মায়া, দয়া, ভালবাসা, বিনয় সৌজন্য প্রভৃতি গুণচয় যাহা মানবগণ চিন্তায় ভাবিতে পারে তাহা তোমাতে মূর্ত্তিমান। সেই গুলির প্রভাবে তুমি সংসারের শ্রেষ্ঠ, সেইগুলির জন্যই তুমি পুরুষের আরাধ্য, সেই গুলির জন্যই আমরা প্রীতি সহকারে তোমার পূজা করি। তোমার পতিপ্রাণতা, তোমার যত্ন মানব হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু বলিতে পার মূর্খ মানব তথাপি কেন তোমায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না?

যখন সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীকে দেখি তখন তাহাদের পতিপ্রাণতা প্রেম ভালবাসা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হই, তাহাদিগকে পূজা করি। যখন দেস-দিমোনার স্বর্গীয় ছবি নয়নপথে পতীত হয় তখন জগতের স্বার্থীত্ব বিস্মৃত হই, তখন তোমার চরণ বন্দনা করিলেও যেন দেহ মন পবিত্র হয় বলিয়া ধারণা হয়। এমিলিকে দেখিয়া তোমাদের সখীত্ব বুঝি, কিন্তু লেডি ম্যাক্‌-বেথকে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠি। সূর্য্যমুখী কমলমণীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে বাসনা জন্মে, কিন্তু এক এক সময়ে তোমাদিগের আবার রূপান্তর ভাবান্তর

দেখিয়া ভয়ে প্রাণ বিচলিত ও চকিত হয়। তাই বলি রমণী তুমি সংসারের কে?

তোমরা প্রণয়ের দাসী বা কামের দাসী তাহা স্থির বুঝি না। যখন তোমাদিগকে প্রণয়িনী বলিয়া ভাবি, যখন তোমাদের প্রণয়ের গভীরতা ভাবি তখন অবাক হই, মর্ম্মে মর্ম্মে শিরায় শিরায় হৃদয়ের প্রত্যেক যন্ত্রে তাড়িতবেগ প্রবাহিত হয়, তোমরা প্রণয়ের জন্য, ভালবাসার জন্য, কত যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। এক ভালবাসার জন্য প্রেমিক লইয়া পাগল, প্রেমিক পাইয়া সর্ব্বত্যাগিণী, প্রেমিক সহবাসে স্বর্গসুখ উপভোগ কর। কিন্তু আবার দেখি, একজনকে ত্যাগ করিয়া অপরে অনুরক্তা হও, পূর্ব্ব প্রণয়ীর সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হও না। তাই বলি তোমাদের প্রণয়ের গভীরতা বুঝি না,—ইহা কি প্রেমিক বাছাই করিবার ভ্রম? না কামের বিজয়?

সংসারের উপস্থিত সুন্দর বা অতীত সুন্দর তাহা বুঝি না। তোমরা পূর্ব্বে সরলা ছিলে বা এখন সরলা তাহা জানি না, আজ কাল দেখা যায় যে সাধারণতঃ রমণীগণ সমাজবন্ধনে বা চিরায়ত প্রথানুবর্ত্তিনী হইয়া ভালবাসে। প্রাণের মিল বড় কম। বিবাহ হইলে স্বামীর বশে থাকিতে হয়, ভালবাসিতে হয়, তাই যেন বশে থাক তাই যেন ভালবাস, সে ভালবাসায় স্বার্থ আছে তাই যেন ভালবাস। নতুবা বাসিতে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ স্বামী অপেক্ষা তোমরা নির্ভাবনায় সমবাতিপাত কর। এ সমস্ত ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমান স্বত্বেও কেন যে তোমায় সরলা বলি, কেন যে তোমার আরাধনা করি তাহা জানি না।

সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলে তোমরা যে ঐ সমস্ত গুণ সম্পনা থাক তাহার প্রমাণ নাই, বরং বিপরীত প্রমাণ আছে—প্রধান আদর্শ স্বাধীন আমেরিকা। স্বাধীন হইয়া ক্ষমতা পাইয়া রাজ্ঞী এলিজেবেথ কি কোমলাঙ্গি নারী স্বভাবোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন? রুডিমেরী কি সরলভাব কার্য্য করিয়াছেন? কে না তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তবে রমণী কই তোমার দয়া মায়া? কই তোমার সরলতা? তোমরা গৃহে আবদ্ধ থাক, সংসারের সকল বস্তু দেখিতে পাও না, তাই হয়ত আপনা হইতে

কতকটা গুণ তোমাতে বর্ত্তিয়া যায নতুবা সেগুলি তোমাব প্রাকৃতিক গুণ নহে।

মানব হৃদযে যেমন বীবরস ও করুণবস উভযই বর্ত্তমান, তেমতি তোমা-তেও তাহা আছে, সময শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে তোমবাও বীব নাবী হইতে পার, তোমাদের কোমলতা ঘুচিযা যায। তাহার আদর্শ সাযাম। সাযামে এখনও রণনিপুনা সহস্র সহস্র রমণী বহিযাছে। তাই বলি রমণী তোমরা পুরুষ অপেক্ষা কোন বিষযে ন্যূন নহ, কোন বিষযের অভাব জন্য পুরুষেব সহানুভূতি পাইবায যোগ্য নহ, তথাপি পুরুষ তোমার উপাসক। তোমাদেব হৃদয বুঝি, তোমবা যে সকল বিষযেই পুরুষেব ন্যায তাহা জানি, যে দোষ পুরুষে বর্ত্তমান সে দোয নাবীতেও আছে, যে গুণ পুরুষে সম্ভব, সেই সমস্ত গুণই নাবীতে থাকিতে পাবে, তবে নাবীতে আমবা কেন এত অনুবক্ত?

তোমবাও যেমন স্বামী দুই স্ত্রীতে বা অপব বমণীতে আশক্ত হইলে মহা হুলস্থুল বাধাইযা দাও, পুরুষও তোমাবা ব্যভিচাবিণী হইলে সেইরূপ বা কিছু অধিক কবে, তাহাব কাবণ, ব্যভিচাব সম্বন্ধে পুরুষেব পক্ষে সমাজ বন্ধন কিছু শিথিল। এখনও বাঙ্গালি ব্যভিচাবিণী স্ত্রীর ব্যভি-চাবেব মূল্যস্বরূপ ক্ষতি পূবণ চাহে না, পবে কি হইবে তাহাব স্থিব কি? তখন তোমবাও পুরুষেব সঙ্গে এ সম্বন্ধে সমান পদ প্রাপ্ত হইবে। এত চখে চখে বাখিযাও যখন সুযোগ পাইলে তোমবা শিকলি কাটিতে ছাড়না, যখন অনুসন্ধান কবিলে অনেক গৃহে দুই একটী গোলমালেব কথা প্রায শুনা যায়, তখন কসুরই বা কি? তাই বলি বমণী তুমি যে কি গুণে পুরুষকে এত আযত্বাধীন করিযাছ তাহা বুঝি না। তোমাব চক্ষে যে কি গুণ আছে, কি মোহিনী শক্তি আছে তাহা আমি বুঝি না, সেই জন্য তোমাকে সংসাবেব একটী অভিনব বস্তু বলিযা ভাবি। শুধু আমি নয় এ সংসারে এমন জাতী নাই যে ভাবে না, অতএব রমণী তুমিই ধন্যা! তোমার ক্ষমতা অসীম! তোমাব বুদ্ধি প্রখবা, প্রবলা!!!

চিন্তা।

যেরূপ আমাদের নাসিকা রন্ধ্রে অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, সেই রূপ আমাদের অন্তরে অবিরাম গতিতে উপর্য্যুপরি চিন্তা উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। চিন্তা মনের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জগতে এমন কোন মনুষ্যকে জীবিত দেখিবে না, যাহার মনে চিন্তা নাই—যিনি নিশ্চিন্ত। চিন্তা ত্রিবিধ প্রকার—বর্ত্তমান চিন্তা, ভাবি চিন্তা, এবং অতীত চিন্তা।

মনোমধ্যে যখন উপস্থিত বিষয় ঘটিত চিন্তা উদিত হয় তখনই আমরা বর্ত্তমান চিন্তায় মগ্ন থাকি। যখন মনে গত বিষয় সম্বন্ধীয় কোন চিন্তা আইসে তখন অতীত চিন্তায় এবং যখন মনে ভাবি ঘটনার চিন্তা আইসে তখন আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভিভূত হই। মনুষ্য সম্বন্ধে চিন্তা বিশেষ উপকারী। আপনার বা স্বদেশের উন্নতি একমাত্র চিন্তা সাপেক্ষ। চিন্তাশীল ব্যক্তিই আপনার এবং স্বদেশের উন্নতি সাধনে সক্ষম। চিন্তার বিষয় বহুল, তদ্‌সমস্ত নির্দ্দিষ্ট বা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা চিন্তার অগ্রাহ্য, অতএব অসার বিষয়িণী চিন্তা পরিহার করিয়া সার বিষয়িণী চিন্তাতে মগ্ন থাকা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

উক্ত ত্রিবিধ চিন্তাকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সৎ ও অসৎ চিন্তা। সকল কালেই অসৎ চিন্তাকে সর্ব্বতোভাবে মন হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য। অসৎ চিন্তা যেমন অবিদ্যা চিন্তা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি বহু শত আছে তদ্‌সমস্তকে যত্নের সহিত অন্তর হইতে অন্তরে রাখিতে হইবে।

সদ্‌চিন্তার ফল সুখময় অমৃতময়; অসদ্‌চিন্তার ফল বিষময় এবং বিপদজনক। মনুষ্য মন সতত চঞ্চল, এক মুহূর্ত্ত কোন একটী চিন্তা ভিন্ন স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং সদ্‌চিন্তার অভাব হইলেই স্বতই অসদ্‌-চিন্তা আসিয়া মনোরাজ্য অধিকার করে।

কেবল মনুষ্যই যে চিন্তা করিয়া থাকে এমত নহে। দেহী মাত্রেই,

জীবমাত্রেই, অহবহ চিন্তা করিতেছে। ঐ যে বৃহৎ লাঙ্গুল যুক্ত মর্কটকে অম্রকাননের মধ্যে এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তবে লাফাইযা যাইতে দেখিতেছ উহার কাবণও চিন্তা। উহার মনে ক্ষুধাব চিন্তা উদ্রেক হইযাছে সেই জন্য একবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষেব পক্ক অম্রগুলি খাইতে যাইতেছে। ঐ যে মেষপাল ডাকিতে ডাকিতে মাঠেব মধ্য হইতে ছুটিযা আসিতেছে, উহাব কাবণও চিন্তা। উহারা ঐ যে নভোমণ্ডলে কাল একটী মেঘ উঠি-য়াছে ঐ দেখিযা আশু বৃষ্টিপতনের ভযে আশ্রয স্থানের জন্য দৌড়াইয়া পলাইতেছে। ঐ রূপে সকল জীবেই চিন্তা করিতেছে, যাহার চিন্তা নাই তাহাব জীবন নাই। চিন্তা দেহেব সহিত আইসে, দেহের পতন হইলে চলিযা যায।

চিন্তা রত্নাকব সদৃশ, ইহাব মধ্যে নানাবিধ রত্ন আছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি সর্ব্বদাই উহা হইতে নানবিধ বত্ন বাহির কবিযা আপনার ও আপন দেশের এমন কি পৃথিবীব মঙ্গলসাধন কবিযাছেন ও আজিও করিতেছেন।

যখন মনুষ্য সভ্যতাব আলোক প্রাপ্ত হয নাই, যখন তাহাবা আদিম অবস্থায অবস্থিত ছিল, তখনও চিন্তা তাহাদিগেব মনে বিবাজিত ছিল এবং সেই চিন্তাব ফলেই ক্রমে তাহাবা আপন অবস্থাব উন্নতি কবিতে সমর্থ হইযা আজ ঊনবিংশ শতাব্দিতে সভ্যতাব উচ্চতব সোপানে আরো-হণ কবিযাছে। অদ্য তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ তদ্ সমস্তই চিন্তা প্রসূত। ঐ যে বৃহৎ অট্টালিকা আব উহাব অভ্যন্তরস্থ নানাবিধ বিলাসের দ্রব্য দেখিতেছ সমস্তই চিন্তার ফল। পবিত্রধাম বারানসী প্রভৃতি দূবস্থ পুণ্য-তীর্থ সকলে যাইতে হইলে পূর্ব্বে সকলে স্ত্রী পুত্র পবিবাব আত্মীয় কুটুম্ব-গণের নিকট হইতে বিদায লইযা, আপন বিত্ত বিভব যদেচ্ছা প্রদান কবিয়া যাইতেন। কাশীধামে যাইতে পূর্ব্বে তিনমাস কাল লাগিত, বহুদিন ভ্রমণ জনিত অনেক দৈহিক কষ্ট সহ্য কবিতে হইত এবং অনেক অর্থ ব্যযিত হইত। কিন্তু চিন্তাশীলব্যক্তি একমাত্র চিন্তা দ্বাবা লৌহ বর্ত্ম প্রস্তুত করিযা যে পথ যাইতে তিন মাস লাগিত আজি সেই পথ দুই দিনেব মধ্যে মনুষ্যে অনাযাসে অতি অল্প ব্যযে গতাযাত কবিতেছে। চিন্তাব বলে অগাধ জলধিবক্ষে অর্ণবপোত ভাসাইযা বনিকেবা এক দেশজাত দ্রব্য সকল অন্যদেশে লইয়া

আসিতেছে এবং বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপন আপন অবস্থা উন্নতি করিতেছে। আমাদের দেশের তন্তুবায়কেরা একমাস পরিশ্রম করিয়া দুই তিন যোড়া মাত্র বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু চিন্তা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশে এবং কিছুদিন হইলে কলিকাতা নগরীর নিকটে বস্ত্রবয়ন কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐ সকল কলে প্রতিদিন শত শত যোড়া বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। যে বস্ত্র আমরা পূর্ব্বে দশটাকা দিয়াও পাইতাম না, এক্ষণে সেইরূপ বস্ত্র অতি সুলভ মূল্যে আমরা পাইতেছি। উলঙ্গ বঙ্গদেশে বস্ত্র সুলভ হওয়ায় আমাদের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা গৃহস্থ মাত্রেই অবগত আছেন।

একমাত্র চিন্তার দ্বারা নানাবিধ বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইয়াছে। এখন কলের দ্বারা তৈল প্রস্তুত হইতেছে, কলের দ্বারা ময়দা হইতেছে, কলের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ ইষ্টক, সুরকি ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিদিন প্রস্তুত হইতেছে। কলের দ্বারা দৈহিক শ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইতেছে। শ্রম ও সময় এই দুইটীই সমাজের প্রকৃত অর্থ। যত অল্প শ্রমে ও অল্প সময়ে আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত সকল প্রস্তুত করিতে পারিব ততই আমাদের ধনের বৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত দ্রব্যের বহির্বাণিজ্য দ্বারা আমরা ধনী হইতে পারিব। আজ ইংলণ্ড যে এত ধনী তাহার কারণ একমাত্র চিন্তা, চিন্তার দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহারা অগ্নি জল ও তাড়িতকে আজ্ঞাধীন করিয়া সকল সভ্য দেশাপেক্ষা ধনী হইয়াছে। একমাত্র চিন্তার ফলেই তাড়িত, এক্ষণে আমাদের বার্ত্তাবহন করিতেছে। ছয় শত যোজন দূরস্থ ব্যক্তিকে বিশেষ আবশ্যক হইলে তাড়িত দ্বারা আমরা ছয় মিনিট সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখা যাউক ত্রিবিধ চিন্তার মধ্যে কোন চিন্তা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং কোন চিন্তা দ্বারা আমরা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি।

(ক্রমশঃ)

ভূতের কথা।

বঙ্গদর্শনের জনৈক লেখক ভূতের কথা সম্বন্ধে "জীয়ন্ত মানুষের ভূত" লিখিয়া মানব জীবিতাবস্থাতে কিরূপে ভূতত্ব প্রাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে একটী বেশ প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। মানবমাত্রেই ভূত জাতীয় এইরূপ প্রমাণ দ্বারা ভূতের কথা ভূতে না লিখিয়া মানুষে লিখিলেও ক্ষতি নাই এইটীও যেন কতকটা প্রমাণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা সেই বঙ্গদর্শনের সাহসে মানুষ হইয়াও ভূতের কথা লিখিলাম। আমাদের এ কথায় যদ্যপি কেহ আমাদিগকে কুপিত হইয়া ভূত বলিয়া গালি দেন, তাহা হইলে আমরা বঙ্গদর্শনকে নজির করিয়া তাঁহাকেও ভূত সপ্রমাণ করিব।

আমাদের দেশে ভূতের ভয় বিলক্ষণ আছে, এবং নানা রকমের ভূতও আছে যথা—ব্রহ্মদত্তী, ভূত, প্রেতিনী, নিশি ইত্যাদি কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিশির ভয়ই অধিক। নিশিরা রাত্রীতে মানবকে ভুলাইয়া লইয়া যাইয়া গাছে টাঙ্গাইয়া রাখে এবং লেহন করিয়া বধ করে এইরূপ প্রবাদ আছে। শুনা যায় তাহারা নাকি রাত্রিতে পরিচিত ব্যক্তির গলার স্বর করিয়া ডাকে, কিন্তু তাহাতে উত্তর দিলেই সর্ব্বনাশ। তাহা হইলেই তাহাকে নিশির আয়ত্তাধীনে পতিত হইতে হয়। এই জন্য রাত্রে তিনবার না ডাকিলে অনেকে উত্তর দেন না। এইরূপ ভূতের নাম "নিশি" এবং তাহার বশীভূত হওয়ার নাম "নিশিপাওন।" কেহ কেহ বলেন নিশি পাওয়া স্বপ্নের কার্য্য মাত্র। স্বপ্নে যেরূপ হৃদয়গত ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে দেহ স্বপ্নগত কার্য্যে নিযুক্ত হয় না, নিশি পাওয়ায়, সেইরূপ হৃদয়ের সহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার পর্য্যন্ত কার্য্য হয়, কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় সকল সুষুপ্ত থাকে। অনেক নিশিপাওন চিকিৎসাগুণে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। অজীর্ণ দোষে স্বপ্নের আধিক্য হইয়া থাকে, অনেকে বলেন সেই কারণে এবং আরও দুই একটী কারণে মানবকে নিশিপ্রাপ্ত হয়, অতএব উহা একপ্রকার স্বপ্ন মাত্র। যাহাই হউক নিশি ভূত কিনা সে

বিষয় লইয়া মাথা বকাইব না। নিশির কার্য্য কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ঘটনাবলির প্রকটন করিব।

নিশি পাওয়ায় বা এই কায়িক ও মানসিক স্বপ্নে—মনুষ্য নিদ্রিতাবস্থায় গোঁগায়, ভ্রমণ করে এবং শারীরিক বা স্বাস্থের কোন প্রকার অনিষ্ট ব্যতিরেকে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এ অবস্থায় তাহাদের নয়ন মুদ্রিত থাকে। প্রায়শঃযুবতী রমণীগণ মধ্যে নিশি পাওয়ার আধিক্য লক্ষিত হয়—নিশিরা যুবতী রমণীতে কেন এত অনুরক্ত তাহা আমরা জানি না।—নিশি পাইলে অনেকে প্রথমতঃ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া পরে উঠিয়া বসিয়া নানা প্রকার বকিতে থাকে এবং অনেকে অনেক ভবিষ্যত বাণিও বলিয়া থাকে। কেহ কেহ এমত বলবতী হয় যে জলপূর্ণ ঘটও অনায়াসে দন্তদ্বারা স্থানান্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

স্পেনসর সাহেব সার্কেশিয়া দেশে ভ্রমণ কালে দেখিয়াছেন একজন দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা সার্কশ জাতীয় বালিকা দুই বৎসরাবধি নিশি প্রাপ্তির প্রলাপভোগ করিয়াছিল। প্রলাপ একসপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। এ অবস্থায় সে চিক্কণের কার্য্য করিত, সুরলয় সঙ্গত বংশি বাজাইত এবং সুমধুর স্বরে গান করিত। এ সময়ে তাহার ভবিষ্যত বক্তৃতা শক্তিও উৎপন্ন হইত। উক্ত পীড়া ভোগকালে ঐ রমণী স্বদেশীয় বীর পুরুষগণকে বলিত যে "রুষ যুদ্ধে তাহারা কখন পরাভূত হইবে না।" কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার এ সমস্ত কিছুই স্মরণ থাকিত না।

কলকুহল সাহেব লেখেন যে ফ্রান্স দেশীয় জনৈক দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া রমণী মধ্যে মধ্যে ঐরূপে পীড়াক্রান্তা হইত। পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র সে ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট ও অচেতন ভাবে শায়িত থাকিত, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে উঠিয়া বসিত এবং অনর্গল নানা কথা কহিত। এ সময়ে তাহার সুস্থ মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা হইলেও তাহার বিন্দু মাত্র জ্ঞান বা চেতনা থাকিত না। নিশ্চেষ্টাবস্থার সপ্রমাণ করিতে তাহার নয়নপুত্তলিকায় অঙ্গুলি স্পৃষ্ট করা হইয়াছিল। প্রজ্জ্বলিত দীপ তাহার চক্ষের এরূপ নিকটে ধরা হইয়াছিল যে তাহার ভ্রূ দগ্ধ হইয়া ছিল, তাহার

চক্ষে ব্রাণ্ডি ও নিসাদলের একপ্রকার প্রখর আরক দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহার বিন্দুমাত্র চেতনা হয় নাই। সে রমণীটী এ অবস্থায় গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, অথচ এই ভ্রমণ-কালে সে কোন দ্রব্যের উপর পতিত হইত না। তাহার জ্ঞানের পুনরভ্যুদয় হইলে তাহার এ সমস্ত বিষয়ে কিছুই স্মরণ থাকিত না।

যাহাই হউক নিশি যে কেবল গর্ভবতী রমণীগণকেই পাইয়া থাকে তাহা নহে, অনেক পুরুষও উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। অথচ তাহারা মনোভিষ্ট পদার্থ উত্তমরূপে দেখিতে পান। আমরা আমাদের এক ইংরাজ বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি—যে তিনি যখন এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠ করিতেন সেই সময়ে তাঁহার এক সহপাঠী ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। রজনীতে পাছে কোথাও যায় এই নিমিত্ত বোর্ডিংএর অধ্যক্ষ্য তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। একদিন রাত্রে অধ্যক্ষ্য তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া দেখিলেন বালক তাহার শয্যায় নাই—তখনি তাহার অনুসন্ধানে সকলে বাহির হইল। ইতিপূর্ব্বে বালকটী এক রাত্রে নিশি পাওয়া অবস্থায় বোর্ডিং সন্নিহিত একটী গোরস্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল, সুতরাং প্রথমতঃ সেইখানেই অনুসন্ধানে যাওয়া হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে বালকটী একটী নবখনিত গোর মধ্যে শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

গেলেন নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পূর্ব্বে নিশি পাওয়া বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তিনি বলেন যে এক রাত্রে তিনি নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা নিদ্রাবস্থায় একপোয়া পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, পরে একটী প্রস্তরে পতিত হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

ফ্রান্স দেশীয় একজন যুবা ধর্ম্ম যাজক নাকি রাত্রে নিদ্রাবস্থায় গাত্রোত্থান করিয়া আপন টেবিলের নিকট উপবেশন করিতেন, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় স্তোত্র লিখিতেন। এ সময়ে যদিও তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত থাকিত, তথাপি যেমন সহজ লোকে লিখিতে লিখিতে কোন ভ্রম হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দেয় সে অবস্থাতে অনায়াসে তিনিও তদ্রূপ করিতেন। এমন কি সে সময়ে যদ্যপি কেহ একটি কাষ্ঠ ফলক তাঁহার চক্ষের নিকট ধরিত

তাহা হইলেও তিনি অনায়াসে বিনা বাধায় সে সমস্ত স্থানের ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন।

যাহাই হউক এটাকে আমরা ধার্ম্মিক ভুত বলিব। ভূতেরা প্রায়ই মনুষ্যকে মন্দ কর্ম্মে রত করে, কিন্তু এ ভূতটী ধর্ম্ম যাজককে সেরূপ না করিয়া ধর্ম্ম বিষযক কর্ম্মে নিযুক্ত করিত। ইটালিতে মদ্যপানাশক্ত একব্যক্তি রজনীতে এইরূপ নিশি পাওয়া অবস্থায় অনায়াসে তাহার নিম্নতলস্থ গৃহ হইতে মদ্যপান করিয়া আসিত। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিত। তাহার স্ত্রী কোন প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিত। কিন্তু পরদিবস সে সম্বন্ধে তাহার কিছুই স্মরণ থাকিত না।

শুনা যায উড়িষ্যা দেশীয বণ পা নামক এক প্রকার কাষ্ঠ পাদুকার সাহায্যে একব্যক্তি নাকি নিদ্রিতাবস্থায নিশির সাহায্যে এক বেগবতী নদী পার হন, পরপারে যাইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর সে রাত্রে বাটী প্রত্যাগত হইতে পারেন নাই। ইহাতে বোধ হয নিশির দযা ও বুদ্ধি আছে। নদীর মধ্যস্থলে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই চক্ষুস্থির হইত।

নিশি সম্বন্ধে আমরা নানা কথার উল্লেখ করিযাছি, আর এ বিষযের বিশেষ উল্লেখ করিযা পাঠকের বিরক্তি সাধন করিব না। আপাততঃ আমরা নিশিকে ত্যাগ করিয়া ভূত সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব।

আমাদের দেশে মানুষ মরিযা ভূত হয একথা অনেকেরই ধারণা আছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা জার্ম্মনি প্রভৃতি দেশবাসিগণের বিশ্বাস যে জীবীত মানবগণেরও আত্মা চালনা করা যায, এবং নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আর মৃত মনুষ্যের প্রেতাত্মাও কোন প্রকার কৌশলে আবির্ভাব করা যায ইহারও তাঁহারা প্রমাণ দিযা থাকেন।

বেদান্ত মতে শরীর কোষময, শেষ কোষত্রয়ের নাম সূক্ষ্ম শরীর, সেই সূক্ষ্ম শরীরই ভূত। সূক্ষ্ম শরীর যে কেবল শরীর পতন হইলে দেহ হইতে বহির্গত হয় এমত নহে, পণ্ডিতেরা বলেন আরও তিনটী কারণে ইহা বহির্গত হইতে পারে প্রথম—নিদ্রাবস্থায, দ্বিতীয যোগবলে, তৃতীয আপনা হইতে বিনা চেষ্টায। দৃষ্টি সঞ্চারণ বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বাহুল্য। আজ কাল সে বিদ্যা লইয়া ইংলণ্ড প্রভৃতিতে মহা হুলস্থুল বাধিযা গিযাছে। তাঁহারা

বলেন দৃষ্টিসঞ্চারণ দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সম্পূর্ণ বশ করা যাইতে পারে। যাহার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারণ করা যায় তাহাকে যাহা বলা যায় তিনি তাহাই করেন। নিদ্রা যাইতে বলিলে নিদ্রা যান, কোন বিষয় উল্লেখ করিতে বলিলে করিয়া থাকেন, দেহ ত্যাগ করিতে বলিলে তাহাই করেন, এবং সেখানে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর যাহা যাহা দেখে তাহাও উল্লেখ করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সে সমস্ত সম্পূর্ণ সত্য।

নিদ্রাবস্থায় আপনা আপনি কখন কখন সূক্ষ্ম শরীর বা ভুত বহির্গত হইয়া থাকে। আমরা সে সম্বন্ধে একটী গল্প পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ উদ্ধৃত করিলাম—যিনি গল্পটী প্রথম প্রচার করেন তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। অতএব যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি এ গল্প বিশ্বাস করিতে পারেন—"একদিন রাত্রে একজন কর্ণেল সাহেব যথা প্রথা সস্ত্রীক হইয়া নিদ্রার অর্চ্চনা করিতে করিতে সকল মনস্কাম হইয়াছিলেন। সেই রাত্রের ঘটনা তাঁহার স্ত্রী এইরূপ বলেন যে "আমরা উভয়ে নিদ্রা গেলে কতক রাত্রে দেখি আমি শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি, আমার স্বামী কর্ণেল সাহেব শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে আমার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলাম, আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি আর আমার দেহ ওখানে কিরূপে থাকিল? আমি কতই ভাবিতে লাগিলাম, তাহার পর বিশেষ করিয়া দেখিলাম আমার সেই শরীর মৃতদেহের ন্যায় দেখাই-তেছে—স্পন্দন রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস বিবর্জ্জিত। তখন আমার ক্রমে ক্রমে স্থির বিশ্বাস হইল আমি নিশ্চয়ই মরিয়াছি। শেষ ভাবিলাম উত্তম হইয়াছে, মরণের কষ্ট কিছুই পাইতে হইল না। এই সময় আমায় যেন প্রাচীরের দিকে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে হইল, আমার নিজের ইচ্ছা নাই অথচ সেই দিকে যাইতে হইল, ভাবিলাম প্রাচীরে আটকাইয়া থাকিব। কিন্তু তাহা হইল না, আমি প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, যেমন প্রাচীর সেইরূপ থাকিল, কোথাও ভেদ চ্ছেদ কিছুই হইল না। প্রাচীরের অপরদিকে একটা বৃক্ষ ছিল, ভাবিলাম এই বৃক্ষে আমার দেহ আটকাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও হইল না, যেমন বৃক্ষ সেইরূপ থাকিল অথচ আমি তাহার ভিতর দিয়া সরিয়া গেলাম। তাহার পর শূন্যপথে কতকদূর গিয়া

দেখিলাম সম্মুখে গোবাদেব বাবিক, একজন সান্ত্রী বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহাবা দিতেছে। আমি তাহাব সম্মুখে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে একেবাবে দেখিতে পাইল না, তাহাব পব অস্ত্রাগাবে গেলাম সেখানেও সান্ত্রী পাহাবা দিতেছে, আমি তাহাবও সম্মুখে দাঁড়াইলাম সে ব্যক্তিও আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহাব পব আমাব কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, গৃহিনীব সহিত অনেকক্ষণ ধবিয়া কথা বার্ত্তা কহিলাম। তখন বাত্রি ৩টা বাজিল।

প্রাতে আমাব নিদ্রা ভাঙ্গিলে আমি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলাম "তবে আমি মবি নাই।"

চীৎকাব শুনিয়া আমাব স্বামী জিজ্ঞাসা কবিলেন ব্যাপাব কি? আমি তখন আদ্যোপান্ত সকল পবিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন তুমি একথা শুক্রবাব পর্য্যন্ত প্রকাশ কবিও না, আমাদেব যে আত্মীযেব সহিত তুমি কথা কহিয়া আসিয়াছ বলিতেছ, তিনি এই শুক্রবাবে আমাদের এখানে আসিবেন। আসিয়া কি বলেন তাহা শুনা যাইবে।

শুক্রবাবে সেই আত্মীয় যথাসময়ে আসিলেন। তাঁহাকে লইয়া আহ্লাদ আমোদ হইতে লাগিল। অপবাহ্নে সকলে একত্রে পুষ্প উদ্যানে বেড়াইতে টুপিব কথা উঠিল। আমি বলিলাম এবাব আমি গোলাপি বর্ণের টুপি ক্রয় কবিব; ঐ বর্ণ আমি বড ভালবাসি। তাহাতে আমাদের আত্মীয ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহা আমি জানি, সে দিন রাত্র ৩টার সময় যখন আমাব গৃহে তুমি গল্প কবিতে গিযাছিলে, তখন তোমার গোলাপি বর্ণেব বেশ ভূষা ছিল।"

তাহার কিছুদিন পবে কর্ণেল সাহেব ভাবতবর্ষেব এডজুটাণ্ট জেনেরল হইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবি বিলাতে থাকিতেন। বিবিজি পূর্ব্বমত ভূত বেশে ভাবতবর্ষে আসিবাব জন্য কতই আকাঙ্ক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহা হইত না।"

নিদ্রাবস্থায় দেহ হইতে জীবন্ত মনুষ্যেব ভূত কি রূপে বহির্গত হয় তদ্ সম্বন্ধে উপর্য্যুক্ত ঘটনাটী উল্লেখ কবিলাম, এখন মরা মানুষের ভূতের কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া অদ্য এ প্রবন্ধ শেষ কবিব।

আমাদের দেশে "ভুত নামান" আছে। সে সকল ভুতের কার্য্য একরূপ, অন্ধকার গৃহে আবির্ভূত হইয়া লাফালাফি ও কতকটা গলাবাজি এইমাত্র তাহাদের কার্য্য কলাপের শেষ। বোধ হয় সেরূপ "ভূত নামান" আমাদের পাঠকদের মধ্যে অনেকেই পাবেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ভূত নামান প্রথা অন্যরূপ। তাঁহারা ভূতগণকে এরূপ বাধ্য করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহাদের যদেচ্ছা কার্য্য করে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার "ডেভন পোর্ট ব্রাদার্স" নামে একদল ভুতুড়ে আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের ভুত নামান দেখিয়াছি। একটী আলমারির মধ্যে দুইজন লোককে হস্ত পদ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। আলমারির মধ্যে গুটি কত ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র রাখা হইল, আলমারির দরজা বন্ধ করিতে না করিতে বাদ্য যন্ত্রগুলি বাজিয়া উঠিল। আলমারির দরজায় একটী বড় ছিদ্র ছিল, তাহা হইতে পাঁচ সাতটী ছোট ছোট হস্ত বাহির হইল তাহাদের হস্তে পূর্ব্বকথিত ঘণ্টাগুলি বাজিতেছে।

একটী লোক পাঁচ সাত বর্ণের পাঁচ সাতটী জামা গায় দিয়া বসিল, তাহাকে উত্তম করিয়া একটী চেয়ারে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। দর্শকেরা যে বর্ণের জামাটি বলিলেন সে তৎক্ষণাৎ শতবন্ধনীসত্ত্বেও তাহা বাহির করিয়া দিতে লাগিল। জামাগুলি যেন উড়িয়া উড়িয়া অঙ্গ হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল।

গিটার নামক বাদ্য যন্ত্রে ফসফরাস লাগাইয়া দিয়া গৃহ অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল। গিটারগুলি আপনা আপনি শূন্যে বাজিতে বাজিতে উড়িতে লাগিল। আমাদের মাথার কাছ দিয়া ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কাহার গায়ে লাগিল না। আমি মৃদুস্বরে "আমাকে স্পর্শ কর" বলায় একটী গিটার ধীরে আমার কেশ স্পর্শ করিল। আমার পার্শ্বে একটী বিবি বসিয়া ছিলেন, তিনি আমায় জিজ্ঞাসিলেন আপনি সত্যই কি আপনাকে স্পর্শ করিবার কথা বলিয়াছিলেন? আমি তাঁহাকে তদ্বিষয় পরীক্ষা করিতে বলায় তিনিও ঐ কথা মৃদুস্বরে বলিলেন। গিটার তৎক্ষণাৎ তাঁহার দক্ষিণ বক্ষ অতি ধীরে স্পর্শ করিল, বিবি গিটারটীকে ঠেলিয়া দিলেন কিন্তু গিটার যেন তাহা শুনিল না, নাচিতে নাচিতে আসিয়া

আবার তাঁহার বাম বক্ষ স্পর্শ করিল। বিবি হাস্য করিয়া গিটারটীকে "বোকা" বলিয়া গালি দিলেন।

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে কোন প্রকার মন্ত্রবলেই বুঝি ভুতদিগকে স্বীয় আয়ত্বাধীনে রাখা যায়। এখন দেখিলাম তাহা নহে, আরও অনেক উপায় আছে যদ্দ্বারা ভুতেরা মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হয়। "রাম রাম" বলিলে ভূতাপসরণ হয় কিনা তৎবিষয়ে সন্দেহ আছে।

আত্মা পরিচালকেরা অনায়াসে অন্ধকার গৃহে আলোক উৎপন্ন করিতে পারেন, এবং সেই আলোক সম্মুখে কাগজ ও পেনসিল রাখিলে ঐ পেন্‌-সিল মৃত ব্যক্তির নাম ও নানা রহস্য জনক ব্যাপার লিখিয়া দেয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট ভক্তি থাকিলে অনেকে ঐ আলোক মধ্যে মৃত ব্যক্তির অবয়বও দেখিতে পান।

কিয়ৎ দিবস হইল কলিকাতায় একজন ইংরাজ আসিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে একটী বড় কাষ্ঠফলক ও খানিকটা চকখড়ি থাকিত, তিনি যখন গৃহে না থাকিতেন সে সময় গৃহমধ্যে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে খড়ি সেই কাষ্ঠে তাহার উত্তর লিখিয়া দিত।

বিলাতে ও মার্কিণে প্রমাণিত হইয়াছে যে জড় পদার্থে আত্মার আধিক্য হইলে, ঐ সকল বস্তু গমনশীল হয়। বঙ্গদেশে বেত ও বাটীচালা ঐ শক্তির দ্বারা সম্ভবতঃ চালিত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে মার্কিণে চারিজন ব্যক্তি একটী মেজ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ সেই মেজ চালিত হইল, তাঁহারা সেই মেজের পায়ায় একটী পেনসিল বান্ধিয়া দিয়া তাহার নিম্নে একখানি কাগজ রাখিয়াছিলেন। সেই পেনসিল কাগজে তাঁহাদের নানা প্রশ্নের রহস্যজনক উত্তর দেয়। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ প্ল্যাঞ্চেটের উৎপত্তি। প্ল্যাঞ্চেট কি তাহা বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকই অবগত আছেন।

শুনিয়াছি মেজ বা চৌকিতে পেনসিল বান্ধিয়া দিলে তাহারা কেবল যে প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহা নহে, কবিতা ও গ্রন্থ রচনাও করিতে পারে। গোয়া-ডুলুপ স্থানের রাজকীয় মুদ্রা যন্ত্রাগারে "জুয়ানিটা" নামক একখানি পুস্তক বিক্রয় হয়। উহা উক্তরূপ চৌকি দ্বারা অনেক বিশ্বস্ত ব্যক্তির সম্মুখে লিখিত।

"ওএষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ" নামক পত্রে লিখিত বিষয়টি আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস পাঠকের ইচ্ছা।—ভূতেরা গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা নৃত্য গীত ও বাদ্যই অধিক ভালবাসে। উত্তর আমেরিকার একটী গ্রামে এক অল্প বয়স্কা দাসী অর্দ্ধ রাত্রিতে আত্মাভিনিবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছিল, সেই চীৎকার শব্দে বিরক্ত হইয়া গৃহস্থগণ দাসীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, দাসী একটি কম্বল মুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া গান করিতেছে। তাঁহারা সেই গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা খাট হইতে গদিখানি রাগভরে উর্দ্ধে উঠিয়া লাফাইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া খাটের পায়াগুলি এমন ভাবে তাল দিতে লাগিল যে বুঝি তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। হাতা ও চিমটা স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া খাটের মধ্যে শয়ন করিল। জলপূর্ণ ঘটি গৃহ হইতে রাজপথে প্রস্থান করিল, সম্মার্জ্জনী অকারণে খাটের সহিত বিবাদ করিয়া আপন অঙ্গ চূর্ণ করিতে লাগিল।

শুনিয়াছি যাঁহারা আত্মার চালনা দ্বারা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারা জগতের যাবতীয় স্থান নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পান। সকল স্থানের সংবাদ ইচ্ছা মাত্র জানিতে পারেন। চিত্র বিদ্যা কিছুমাত্র না জানিয়াও উত্তম চিত্র আঁকিতে পারেন, এবং সঙ্গীত বিদ্যার অভাবেও সুকঠিন রাগ রাগিণীতে গান করিতে পারেন। মার্কিণ দেশে এই আত্মা দ্বারা দূরদেশ হইতে সংবাদ আনাইবার চেষ্টা হইতেছে; যত্ন সফল হইলে, তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বত্রে আর তার বসাইতে হইবে না। যাহাই হউক পুরাকালের ঋষিগণ ধ্যান পরায়ণ হইয়া যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ হইতেন, আধুনিক শ্বেতপুরুষেরাও ভূতের সাহায্যে সেইরূপ হইবার চেষ্টায় আছেন।

আমরা অদ্য ভূতের কথা সমাপ্ত করিলাম, আশা করি এত কথা লেখায় পাঠক আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না। আরও আশা করি এ সংবাদে বাগবাজারের বিখ্যাত গাঁজা খোরেরা আত্মচালকেরা তাহাদের ব্যবসায় ভ্রষ্ট করিতেছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইবেন না। তাঁহাদের গাঁজার ধূমের অপূর্ব্ব গুণে ইহা অপেক্ষা শত শত শ্রেষ্ঠতর ভূত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সেক্সপীয়র কৃত গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড সেক্সপীয়রের জীবন বৃত্তান্ত ও ঝটিকা। গঙ্গোপাধিক (বোধ হয় গঙ্গোপাধ্যায়োপাধিক) শ্রীকেদার নাথ দেবশর্ম্মণঃ কর্তৃক অনুবাদিত। শীল-যন্ত্র কলিকাতা।

পাঠক বোধ হয় গ্রন্থের নাম পাঠ করিয়াই পুস্তকের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং তদ্‌সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বহুল্য। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বা সবিশেষ সমালোচনা করিতে আমরা ভীত হইতেছি, কারণ ইতিপূর্ব্বে আদরিণীতে একখানি কাব্য গ্রন্থ সমালোচিত হয়, পুস্তকখানি ভাল নহে সুতরাং তাহাকে ভাল বলা হয় নাই। তাহার উপর আবার গ্রন্থকার প্রেরিত একটা প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই—দোহাই গ্রন্থকার, পূর্ব্বে ইহা আপনার লেখা বলিয়া জানিতাম না। গ্রন্থকার চটিয়া আগুন, তিনি এক পত্র লিখিয়া বসিলেন—পত্রখানির বঙ্গানুবাদ এইরূপ "মহাশয়! গ্রন্থ সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে গ্রন্থকারের বিদ্যার গভীরতা কত। আপনি জানেন যে আমি একজন বি এল এবং উকীল। আমি আর আপনার পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করি না।"

গ্রন্থকার বিএ এমএ সে জন্য যে তাঁহার ছাই পাঁশকে আদর করিতে হয় তাহা জানিতাম না, যাহাই হুউক বিএ গ্রন্থকার মহাশয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। তিনি পত্রিকা না লইলে বার্ষিক আমাদের দুই টাকা আয় কমিবে তাহাতে দুঃখিত নহি, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদের সহিত তাঁহার সংশ্রব ঘুচিল। যদিও আমাদের এমএ বিএ গ্রাহকের অপ্রতুল নাই তথাপি সং ব্যতীত যাত্রা ভাল লাগে না, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? এ সংসারে এমএ পাশ করিয়া কে আর তাঁহার মত সঙ সাজিবে?

শুনিলাম যে কেদার বাবুও বিএ, বিশেষ আমাদের গ্রাহক। তিনি যখন বিএ তখন পুস্তক যে উত্তম তাহাতে সন্দেহ কি? তিনি যখন

এত ক্লেশ করিয়া বিএ (!) পাশ করিয়াছেন তখন তিনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও সুলেখক তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আমরা এত কথা বলিলাম, আশঙ্কা কাব্যগ্রন্থকর্ত্তা বিএল মহাশয়ের মত আদরিণীর গ্রাহক শ্রেণী হইতে তাঁহার নামটীও যেন কাটিয়া দিতে অনুমতি না করেন।

প্রজাবন্ধু। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, ফরাশীস চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক পয়সা।

প্রজাবন্ধু সমালোচনায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে পত্রখানি চলিলে চন্দননগরের গৌরব বটে। আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। গতবারের আদরিণীতে "বঙ্গবাসীকে" দুই একটী কথা বলায় "বঙ্গবাসী" ভায়া রাগ করিয়াছেন। তিনি সেই দিন হইতে আর আদরিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন না। ইহাতে আমরা বঙ্গবাসীর রুচি ও প্রবৃত্তিকে নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা মনে করিয়াছিলাম বঙ্গবাসীর বালকত্ব কমিয়াছে, কিন্তু তাহার বালকস্বভাবসুলভ চাপল্য কমে নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা বঙ্গবাসীর মঙ্গলের জন্য, পঞ্চানন্দ যে প্রকৃতই তাঁহার ঘাড়ে চড়িয়াছে তাহা আমরা জানিতাম না। যাহাই হউক এরূপ ব্যবহারটা বঙ্গবাসীর পক্ষে অতি লজ্জার বিষয়! অতি ঘৃণার কথা!!

সঞ্জিবনী। ইহা একখানি বৃহদাকারের সুলভ মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা। গতবারে "সময়" সমালোচনের সময় ইহারও সমালোচনা করা হইয়াছে। বস্তুত ইহার সমালোচন আবশ্যকাভাব, যে দিন বাঙ্গালি প্রকৃত প্রস্তাবে সংবাদপত্র পাঠ করিতে শিখিবে সে দিন "সঞ্জিবনী" প্রধান পত্র বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু এখনও তাহার কিছু বিলম্ব আছে। বাঙ্গালির হুজুগ বাই নিবৃত্তি না হইলে "সঞ্জিবনীর" আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কিছু কম।

জগতের সুখ কি ?

—:o:—

জগতের সুখ কি ? এ কথা কে বুঝিবে। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যেকেই নূতন, নূতন উত্তর দিবেন। কেহ কহিবেন, অর্থই জগতের সুখ, কেহ বা সন্তোষ, কেহ বা নব প্রণয, কেহ বা তাহার প্রগাঢ়তা। কিন্তু তুমি আমি তাহাতে কি বুঝিলাম ? একজন কবিকে বিজ্ঞব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা কর যে জগতের সুখ কিসে, তিনি আর ভাবিবেন না, অমনি কহিবেন কৌমুদী-সুশোভিত প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শনে। ইহাতে মন কি বুঝিল ? কবি ভগ্ন-হৃদয়ে করুণভাবে পরের দুঃখ গাহিলেন, তাহাতেই তাঁহার সুখ; কিন্তু তোমার তাহাতে সুখ কি ? শৈশবের সুখ যৌবনে থাকে না, যৌবনের সুখ বার্দ্ধক্যে থাকে না, যখন মনুষ্যের হৃদয়গত ভাবের পরিবর্ত্তন এত অধিক, তখন কি করিয়া উপলব্ধি করিব যে জগতের সুখ কি ?

এই যে অবনীমণ্ডলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাদের প্রত্যে-কের হৃদয় ভিন্ন, আশা ভিন্ন, সুখ ভিন্ন, এবং বাসনা ভিন্ন, একব্যক্তি যাহাতে সুখবোধ করিতেছে, হয় ত অপর ব্যক্তি তাহাতে দুঃখ অনুভব করিতেছে। তবে কি করিয়া বুঝিব কিসে সুখ ? এ জগৎসংসারে যে সুখলাভ করিয়াছে—সেই মনুষ্য, নতুবা জন্মপরিগ্রহ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সে সুখ অতি বিরল। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও আন্তরিক সুখী হইলে না, আন্তরিক সুখলাভ করিলে না। হয় ত এক ঘৃণিতজাতির মত্ততা দেখিয়া মনে করিলে উহারাই সুখী কিন্তু তুমি কি সেই দশাপন্ন হইতে বাসনা কর ? কখনই না। তবে তাহাতে সুখ কি ? এ জগৎ সংসারে সুখী হইব বলিলেই সুখী হইতে পারিবে না। সৌন্দর্য্যশালী হইতে পার, ধনী হইতে পার, সুন্দরীভার্য্যার অধিকারী হইতে পার, কিন্তু ইহাতেই কি তুমি সুখী হইলে ? তোমার হৃদয়তরি কি সুখ-সাগরে টলমল করিতে লাগিল ? বোধ হয় না। পক্ষান্তরে, এক দরিদ্র ব্যক্তি কুরূপা

পত্নী সহবাসে সুখে কালাতিপাত করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর জগতের সুখ কি? সে তোমায় গদগদ স্বরে কহিবে "সুখ মনে।" মনের সুখ নিতান্ত সহজ নহে। যে মনে সুখী, সেই সুখী। কিন্তু মনের সুখ কিরূপে হয়? একজন বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও কহিবে যে মনের সুখই সুখ, কিন্তু কে বুঝে যে সে সুখের উৎপত্তি কোথা হইতে। তুমি তন্ন তন্ন করিয়া সেই সুখী ব্যক্তির হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিবে যে সে সুখের উৎপত্তি ভালবাসা ও সন্তোষ হইতে। যদি ভালবাসিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবে, অন্যথা সুখের আশা করিও না। সেই ভালবাসা কিসে জন্মে?

রূপে ভালবাসা জন্মে না, যদিও জন্মে তাহা ক্ষণস্থায়ি মাত্র। তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ অনেক গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন যে দম্পতী অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহাদের হৃদয়েই অনন্ত বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। অতএব সে প্রণয় কিরূপ? তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ হইয়া অকালে প্রেমের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ভালবাসার সহিত রূপের কোন সম্পর্ক নাই, তবে এরূপ হয় যে প্রথমতঃ রূপে বিমোহিত হইল, বা অন্য কোন উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাহার সহিত সম্পৃক্ত হইল, পরে তাহা ভালবাসায় পরিণত হইল, কিন্তু সে ভালবাসা অতি বিরল। রূপজ ভালবাসার পুনঃ পুনঃ উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় ও বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার পরিতৃপ্তি কোথায়? রূপজ ভালবাসা মোহমন্ত্র বিশেষ, ইহা প্রথমতঃ মনকে প্রমত্ত করিয়া তুলে, পরে আবার স্বর্গ হইতে রসাতলে নিক্ষেপ করে। আসক্তিও যৌবনের সহিত সৈকতভূমির জলের ন্যায় ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায়। বরং গুণজ ভালবাসাকে প্রকৃত ভালবাসা মধ্যে গণ্য করিলেও করা যাইতে পারে। যে দেশে স্বেচ্ছামত কেহ বিবাহ করিতে পায় না, যেখানে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বাসনানুযায়ী পরিণয় প্রথা প্রবল, সেখানে যথার্থ প্রণয় প্রতি গৃহে দেখিবার প্রত্যাশা নিতান্ত দুরূহ। তবে যে কাহারও হৃদয়ে প্রণয় বিরাজ করে না, একথা বলিতে পারি না। তাহাদিগের মধ্যেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রণয়কে উচ্চতম

শ্রেণীর ভালবাসা বলিতে বাধা কি? সেই প্রণয়ই যে মনুষ্যহৃদয়ে ইহলোকে স্বর্গের সুখাস্বাদ প্রদান করে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

তুমি আমি স্বার্থের দাস, স্বার্থের নিমিত্ত ভালবাসিতে শিখিয়াছি, অতএব কোথা হইতে সেই দেবতা-দুর্লভ সুখ পাইব? ভালবাসায় অপরিমেয় অনন্ত ও অসীম সুখ। কিন্তু সেরূপ ভালবাসিতে কে শিখিয়াছে? কে ভালবাসিয়া আপনার হৃদয় পরের নিকটে বিক্রয় করিয়াছে? ভালবাসিতে পারিলে সুখ সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যে ভালবাসিতে পারে সে কুটীর দ্বারে বসিয়া যে সুখলাভ করে, ধরণীর অধীশ্বর সে ভালবাসা জানেন না বলিয়া সে সুখের অধিকারী হইতে পারেন না। তিনি যদি কোন সুখ উপভোগ করেন, সে প্রকৃত সুখের ছায়া মাত্র। ভালবাসার সুখ হৃদয়স্পর্শী।

ভালবাসা এ জগতের একটী সুখস্তম্ভ ভালবাসার অন্ত নাই, বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। যত ভালবাসিবে ততই ভালবাসিতে শিখিবে, মন ততই উন্মত্ত হইবে। ভালবাসা যদিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে, তথাপি ভালবাসা একটী অমূল্য ধন। স্বভাবজাত ও অভাবজাত এ দুটী স্বতন্ত্র। যাহা স্বাভাবিক, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, আপনিই হয়। একটী বীজ ক্ষেত্র মধ্যে রোপণ করিলে বৃক্ষে পরিণত হয়। সে বীজ যেমন কোন অবস্থায় থাকুক না, তাহাতে যত কেন জলসেচন করা যাউক না, উহা যে বৃক্ষের বীজ, উহাতে সেই বৃক্ষ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কিন্তু ভালবাসা সেরূপ স্বাভাবিক নহে, যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে ভালবাসায় বিরহ থাকিত না। যে প্রাণের সহোদরের সহিত বাল্যকাল হইতে আমোদ করা গেল, কালের কুটিল গতিতে হয়ত তাহার সহিত ঘোরতর বিচ্ছেদ হইল। তবে ভালবাসা কি করিয়া স্বভাবজাত? যাহা স্বভাবজাত তাহা একবারেই হয়। তুমি স্বভাবের নূতন শিশু, নূতন ভালবাসিতে শিখিয়াছ, বন্ধুর বিরহে কাঁদিয়া আকুল, হয়ত তোমার যৌবনে সে ভাব থাকিবে না। যে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রের অদর্শনে বা অল্পমাত্র ক্লেশে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু তাঁহারা কালের চক্রে অন্তকের হস্তগত হইলে আর অধিককাল সে ভাব থাকে না।

হৃদয় সে দুঃখও ভুলিয়া যায়। তবে সে ভালবাসাকে কি করিয়া স্বাভাবিক বলিব? তবে এই বুঝা যায় যে ঘনিষ্ঠতায় সহিত ভালবাসার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। যে যাহার যত ঘনিষ্ঠ সে তাহার তত ভালবাসার পাত্র।

বন্ধুত্বও এইরূপে হয়। যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত কখন বন্ধুত্ব হয় না। ঘনিষ্ঠতাই বন্ধুত্বের মূল। কোন ব্যক্তি একদিনের মধ্যে কাহারও বন্ধু হইতে পারে না। বহুদিবসের ঘনিষ্ঠতা বা সহবাস ভিন্ন বন্ধুত্ব হয় না। সেই বন্ধুত্ব প্রথমতঃ মুকুলিত, পরে ফল ফুলে সুশোভিত হয়। প্রিয়তমা প্রণয়িনীর কোকিল-বিনিন্দিত স্বর, অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সুকুমার কুসুম-বাঞ্ছিত কর ধারণ করিয়া অবনীতে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছি বলিয়া শ্লাঘা করা সহজ, কিন্তু একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া সহজ নহে। প্রকৃত বন্ধু অপেক্ষা অমূল্য নিধি আর এ জগতে নাই। যে প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছে সে এই নির্ম্মম সংসারে অনেক সুখ পাইয়াছে। কিন্তু এক বন্ধু পাইলেই যে এ জগতের সমস্ত সুখের শেষ হইল, তাহা নহে। সংসারে সকলই চাই। ভাই, ভগিনী, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি পরিবারবর্গ সকলই চাই। যে সেই সকল লইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই সুখী। এই বিস্তৃত ভূমণ্ডল তাহারই। নতুবা জন্মিয়া অবধি উভয় ভ্রাতায় এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, একস্থানে ক্রীড়া, একস্থানে শয়ন করিলাম, এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইলাম, কিন্তু এখন যৌবন দশা উপস্থিত, এখন চক্ষু ফুটিল, হৃদয় কঠিন হইল, নির্দ্দয় হৃদয়ে সেই প্রাণ-প্রতিম সহোদরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়তমার অলক্তক-রঞ্জিত পদারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতে লাগিল। মানব হৃদয় কিছুতেই বুঝে না। মনুষ্য এই অল্প প্রাণ লইয়া নশ্বর অবনীতে এক অবিনশ্বর জীবনধারণ করিয়াছি বলিয়া, সেই ভাই ভগিনী পিতামাতার মনে ক্লেশ দেয়। অতএব ইহা কি স্বাভাবিক নিয়ম? যদ্যপি ভালবাসা স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে তাহার কখন ব্যতিক্রম ঘটিত না। কিন্তু যাহা অভ্যাসজাত তাহা পরিবর্ত্তনশীল।

ভালবাসা তিন প্রকার। এক যথার্থ ভালবাসা, এক ভালবাসার

ভালবাসা, এবং এক স্বার্থের ভালবাসা। যথার্থ ভালবাসা প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। "ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে" এ কথা অন্তরের সহিত কয় ব্যক্তি বলিতে সক্ষম ?, তুমি আমায় ভালবাস বা না বাস আমি তোমায় ভালবাসিব। তুমি আমায় অযত্ন কর, তথাপি তোমায় আমি যত্ন করিব, তুমি আমায় দেখিয়া বিরক্ত হও, তথাপি আমি তোমায় দেখিয়া সুখী হইব। এ সুখ কে অনুভব করে ? যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিল, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন "I will not stay to offend you" আবার ডাকিবামাত্রেই "My Lord" বলিয়া নিকটে আসিলেন। ওথেলো অকৃত অপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু সতী পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয় পৃথিবী শূন্যময় দেখিয়া ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ;

"O good Iago
What shall I do to win my lord again ?
Good friend, go to him ; for by this light of heaven,
I know not how I lost him. Here I kneel .—"

যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় সুপ্তা দেসদিমোনার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া "বধ করিব" বলিয়া দাঁড়াইল, তখনও সুলোচনার রাগ নাই, অস্নেহ নাই, অবিনয় নাই ; তখন সতী প্রাণভয়ে ভীতা হইয়া এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু মূঢ় তাহা শুনিল না, তথাচ দেসদিমোনার স্নেহ, বিনয়, যত্ন পূর্ব্ববৎ রহিল। মুমূর্ষু কালে যখন ইমিলীয়া তাঁহাকে এ কার্য্য কে করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল,তখনও পতি-পরায়ণা সতী পূর্ব্ববৎ স্নেহপূরিত বাক্যে বলিল

"No body, I myself ; farewell :
Commend me to my kind lord ; O, farewell."

যখন রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে গর্ভবতী সীতাদেবীকে বনে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনিও এইরূপ পবিত্র প্রণয়ের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও রামের প্রতি কোপ বা বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যুত, তিনি অন্তরের সহিত তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এরূপ যত্ন ও প্রেম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? এই ভালবাসাই যথার্থ ভাবাসা। এবং এই প্রণয়ই স্বর্গীয় প্রণয়।

দূর সাগরস্থিত দ্বীপে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে প্রতিপালিতা, সংসারের সুখ, দুঃখ, ভোগ, বিলাস প্রভৃতি অনভিজ্ঞা মিরন্দা, ফার্দ্দিনন্দকে প্রথম দর্শনেই আত্মসমর্পণ করিল। অবসর মতে বলিল—

" I am your wife, if you will marry me ;
If not, I'll die your maid , to be your fellow
You may deny me, but I'll be your servant
Whether you will or no "

ঐ গুণবতী যখন পিতৃমুখে ফার্দ্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিল, তখন অম্লানবদনে বলিল,

" My affections
Are then most humble , I have no ambition
To see a goodlier man."

ইহাতে মিরন্দার কি চমৎকার পবিত্রতা, স্বার্থশূন্য আত্মসমর্পণ ও ভালবাসা প্রকাশ পাইল। মিরন্দা ফার্দ্দিনন্দের ভালবাসা চাহিল না, তথাচ তাহাকে ভালবাসিল। তাহাকে পাউক বা না পাউক, এ জীবনে আর কাহারও পত্নী হইবে না বলিয়া সংকল্প করিল। ফার্দ্দিনন্দ অমৃত কি গরল তাহা দেখিল না, অথচ তাহাকে হৃদয় মধ্যে অরাধনা করিতে লাগিল। কোন্ সহৃদয় পাঠক এরূপ প্রেমকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ না দিবেন? কিন্তু এ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম। যখন জুলিয়েট বলিল—

" O Romeo, Romeo ! wherefore art thou Romeo
Deny thy father, and refuse thy name
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a capulet."

তখন তাহার প্রণয়কে উচ্চতম শ্রেণীতে স্থান দিতে সঙ্কুচিত হই, যদিও উভয় বংশের ভয়ঙ্কর বিবাদ ও ঘৃণা সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ের হৃদয় মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তথাপি যে প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রেম পরীক্ষা করিতে বা জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রেম অন্তঃশূন্য নহে। রোমিও টাইবল্ট্‌কে বধ করিলে, ক্যাপুলেট বংশ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইল। সেই দুঃখের সংবাদ জুলিয়েটের ধাত্রী তৎসমীপে বিবৃত করিলে জুলিয়েট যে কথা কহিয়াছিল, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং জুলিয়েটের প্রেমের গভীরতায় নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

" Back foolish tears, back to your native spring,
Your tributary drops belong to woe,
Which you, mistaking, offer up to joy,
My husband lives, that Tybalt would have slain,
And Tybalt is dead, that would have slain my husband,
All this is comfort, wherefore weep I then
Some word there was, worser than Tybalt's death,
That murder'd me, I would forget it fain,
But, O! it pressed to my memory,
Like damned guilty deeds to sinner's minds
Tybalt is dead, Romeo—banished,
That banished, that one word—banished,
Hath slain ten thousand Tybalts."

জুলিয়েটের প্রেম অনন্ত ও অসীম। সে প্রেমও যথার্থ প্রেম। ঐরূপ প্রেমেই যে ইহলোকে স্বর্গসুখের পূর্ব্বাস্বাদ উপভোগ করে, তাহাতে সন্দেহ কি?

তুমি আমায় ভালবাস, আমিও তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাসিলে না, আমিও তোমায় ভালবাসিব না। এইরূপ প্রেমই প্রায় অনেক হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যদ্যপি ঐ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া সকল

কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কোথা হইতে সুখী হইবে? তোমার সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যতদিন না পাইবে, ততদিন তুমি তোমার প্রেমের পাত্র পাইবে না। আর তোমার সেই সমহৃদয়াপন্ন বক্তিই যে তোমায় ভালবাসিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সুতরাং আর তোমার ভালবাসা হইল না।

আর এক প্রকার ভালবাসা স্বার্থের জন্য। সে ভালবাসা অতি ভয়ানক। তোমার নিকটে আমার একটী উপকার পাইবার প্রত্যাশা আছে, সেই নিমিত্তই আমি তোমার বন্ধু। কার্য্য উদ্ধার হইল, সম্পর্কও ফুরাইল। যে এই প্রকার ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছে, বা যাহার হৃদয় কাপট্যময়, সে কি করিয়া বুঝিবে যে এ জগতের সুখ কি?

ভালবাসা একটী মনোহর পদার্থ। ভালবাসা মানব হৃদয়কে সুখের আস্পদ করিয়া তুলে, এবং ভালবাসাই এ জগৎসংসারকে সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান করায়। কিন্তু যে ভালবাসিতে শিখে নাই, তাহার এ সমস্ত সুখ কোথায়? আর যাহার ভাগ্যে এসুখ ঘটিল না, তাহার এ পৃথিবীতে থাকিয়া ফল কি? তবে এই বুঝাগেল, যে ভালবাসাই জগতের সুখ। কিন্তু ভালবাসা নিতান্ত সহজ নহে। আপনার হৃদয় পরকে দিয়া স্বার্থশূন্য ভালবাসিতে এ জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই শিখিয়াছে। তুমি যাহাকে ভাল বাসিবে, সেই তোমার আপনার হইল, আর যাহাকে তুমি যত অধিক ভালবাসিবে, সেই তোমার তত অধিক আপনার হইয়া উঠিবে। কিন্তু তুমি যে দিবস, তোমার ভালবাসার পাত্র, তোমায় ভালবাসে কিনা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইবে, সেই দিবস তোমার ভালবাসার অন্ত হইবে। সে ভালবাসার আর উন্নতি নাই। সে ভালবাসা স্বার্থশূন্য ভালবাসা নয়।

ভালবাসার আর একটী নাম মমতা, ভালবাসা হইতেই মমতা, কিন্তু স্নেহ অপর পদার্থ। ভালবাসা ও স্নেহে অনেক প্রভেদ। এক ব্যক্তিকে স্নেহ করা সহজ কিন্তু ভালবাসা সহজ নহে। ভালবাসা পুণ্য ব্যতীত পাপ নহে, তবে যে ভালবাসিয়া পরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে বলিয়া সেই স্বর্গীয় ভালবাসাকে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিল, সে ভালবাসিতে শিখে নাই। সে কি করিয়া বলিবে যে জগতের সুখ কি?

আবার চল সেই বিজন বনে, পর্ব্বতের অন্ধকার গহ্বর মধ্যে বাস করিয়া, কন্দমূল ফলাশী হইয়া দেখ, যে তাহাতে কি সুখ? চল প্রিয়তমার বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া বনফুলে সাজাইয়া দাও, তিনি ময়ূরকে করতালি দিয়া নাচাইতে থাকুন। আলুলায়িত কেশ। বল্কল পরিধান। প্রিয়তমাকে এ বেশে দেখিয়া কি তুমি সুখী হইবে? ইহাই কি সুখের চরম সীমা? কখনই না। এ সুখে তোমার হৃদয় কখনই নাচিবে না। আবার তুমি আশায় আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। আবার জগতের সুখানুসন্ধানে রত হইবে।

তবে সুখ কোথায়? যদ্যপি সুখ পাইতে বাসনা কর, জগতের সুখ কোথা জানিতে ইচ্ছা কর, তবে গার্হস্থ্য সুখে মনোনিবেশ কর। ভাল-বাসিতে শিক্ষা কর। সন্তোষ হৃদয়ে বিরাজিত থাকুক। তাহা হইলে সুখ পাইবে। নতুবা ইহজগতে আর কোথাও সুখ নাই।

আকাশ কুসুম।

১

বাতায়ন পথে বসি,
কে তুমি লো সুরূপসী,
মাতাও পরাণ মন
ওই প্রতিভায়?
কেন মন অবিরত,
নির্ব্বোধ বালক মত,
চপলা দামিনীবালা
ধরিবারে যায়?

২

এক দৃষ্টে এক চোখে,
দেখি প্রিয়ে তাই দেখে;
দেখিযাছি হাসিয়াছ,
দেখিযাছি কাঁদিযাছ,
দেখিযাছি একদৃষ্টে,—
বিষণ্ণ বদন,
ভাসিতেছ অশ্রুনীরে,
কমল নয়ন।

৩

একি প্রণযের ধার,
একি প্রণযের ভাব,
কেন মিছে ভালবাসা,
আকাশ কুসুমে আশা,
অলিক স্বপনে কেন,
মজিলি রে মন ?

কাঁদি আমি বসে বসে,
কেঁদো প্রিয়ে অবশেষে ;
এই হলো প্রণযের্তে
মিছে প্রাণে
মিজিনু।
মিছে তোর
আশা করে,
মিছে তোর প্রেমস্মরে
জীবনের মত বুঝি
মরমেতে মরিনু।

৫

ভাল ভাল
এই হ'ল,
দেখা বুঝি সার হ'ল,
সুধু প্রাণ বিদবিল
সুধু বুঝি কাঁদিনু।
আকাশে প্রকৃতি ছবি,
আমি বুঝি মর ভাবি,
আকাশে আকাশে দূবে
প্রাণ মন সঁপিনু।

৬

সুধু প্রাণ সঁপা হ'ল,
সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
বৃথা আশা কবে মনে
তোবে প্রাণ সঁপিনু।
মিছে হ'ল প্রেম আশা,
মিছে হ'ল ভালবাসা,
সবই মিছে—
সুধু বুঝি
এ জীবনে পুড়িনু।

৭

কোথা তুই
কোথা আমি
কেন প্রিয়ে কাঁদিলি,
কোথা প্রেম
কোথা আশা
কেন প্রেমে মজিলি।

সরলা রমণী মত
সবলতা দেখালি,
জনমের মত এই
অভাগারে কাঁদালি।

৮

কাঁদি আমি,
কাঁদ তুমি,
আর কিছু হবে না
জ্বলি আমি
জ্বল তুমি
কেহ জান জানে না।

৯

ছি ছি প্রেম
ছি ছি আশা,
কোথা প্রেম
কোথা আশা,
সব ছিছি—
শুধু ধন্য মানব জীবন,
ধন্য লো রমণী মন
ধন্য প্রেম আকিঞ্চন,
ধন্য আশা
ধন্য তব
আশার বন্ধন।

কমলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী ও ভগবতী।

বসন্ত কাল, দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রি প্রায় দশটা, আকাশ নির্ম্মল, তায় পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ,—পল্লী নীরব। এমত সময়ে হরিদাসী তাহাদের দ্বিতলের দক্ষিণদিকস্থ একটী কক্ষে স্বামীসহ আসীনা। হরিদাসীর স্বামীর নাম ভগবতীচরণ, ভগবতী কালেজের ছাত্র, ফাষ্ট আর্টস পড়েন, কিন্তু জ্ঞান বিদ্যা ও বহুদর্শিতায় অনেক এমএ অপেক্ষা উন্নত। ভগবতী হরিদাসীকে ভালবাসেন। সচরাচর স্বামীগণ স্ত্রীকে যতটুকু ভালবাসে ভগবতী তাহা অপেক্ষা হরিদাসীকে অধিক ভালবাসেন। পাঠ্যাবস্থা বলিয়া ভগবতীকে স্ত্রী ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানে হরিদাসীর পত্র আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইলে ভগবতী আকুল হইয়া উঠেন, কবিতা লেখেন, ও বন্ধু বান্ধবের নিকট চিত্ত চাঞ্চল্য জানাইয়া আপন প্রণয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুবকদিগের অনেক ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আজি তিন দিবস হরিদাসীর স্বামী তাঁহার শ্বশুরালয়ে সমাগত। হরিদাসীর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। এই সুখদ নিশিতে দম্পতীদ্বয় কত প্রকার কথা বার্ত্তা করিতেছিল। দক্ষিণদিকের বাতায়ন উন্মুক্ত। হরিদাসীর মুখখানি হাসি ভরা; একে সজ্যোৎস্না রজনী, তায় বসন্তকাল, তায় আবার ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস বহিতেছিল, বলা বাহুল্য যে আজি হরিদাসীর এ আনন্দ ধরিতেছিল না। বিশেষতঃ হরিদাসী অতি অল্পদিন মাত্র স্বামী পাইয়াছে, এখন তাহার ইচ্ছা যে ভগবতীকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরাল করে না, কিন্তু আশার পরিতৃপ্তি নাই, সততই বলে "নয়ন না তিরপিত ভেল।"

হরিদাসী ভগবতীর দুই স্কন্ধে দুটি হস্ত প্রসারণ করিয়া সহাস্যবদনে তাহার বদন প্রতি চাহিল। ভগবতী মধুর হাস্যসহকারে হরিদাসীর দুই গণ্ডে দুটী হস্ত প্রদান করিয়া সেই সুকুমার অধরে আপন অধর সংযুক্ত করিলেন। হরিদাসী তাহার চক্ষুদ্বয় নিমিলিত করিল, মনে হইল, এ চুম্বনেও পরিতৃপ্তি নাই ইচ্ছা করে "বৎবেক থাকি পড়ে প্রত্যেক চুম্বনে।"

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "হরি। আজ্ যে তোমার সইকে দেখিনি?"

তখন হরিদাসীর হৃদয়ে কমলার অপূর্ব্ব ছবি উদিত হইল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলিল "ভগবান্ দেখিও অধিনীকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না" ক্রমে আপনার সুখের সহিত কমলার দুঃখের তুলনা আপনা হইতে হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল।

ভগবতী। তুমি কাঁদ্‌চ?

হরিদাসী। হ্যাঁ।

ভগবতী। কেন?

হরিদাসী। সইয়ের কথা মনে হ'ল আর প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল, সই যখন আমার কাছে তার জীবনের অসারতা প্রকাশ করে দুঃখ করে তখন আমার প্রাণ ফেটে যায়। বড় কষ্ট হয়। সে দিন কে একজন বাবু সইয়ের বাবাকে বিধবা বিবাহ মতে সইয়ের বিয়ে দিতে বলেছিলেন, তাতে তিনি বাবুটীর উপর ভারি রাগ করেছিলেন। আহা। সইয়ের বাপ্ যদি প্যারীর সঙ্গে সইয়ের বিয়ে দিতেন, তা হলে সে বড় সুখী হত। তা তিনি দিবেন কেন, তাঁকে ত ভুগ্‌তে হয় না। আচ্ছা ভাই জিজ্ঞাসা করি পুরুষরা এত স্বার্থপর কেন? তারা স্ত্রী মরার পর বিয়ের বা চুলয় যাগ, স্ত্রী থাকৃতে কত গণ্ডা বিবাহ করে তাতে দোষ নাই, কিন্তু একজন কচিমেয়ে যদি কচিবয়সে বিয়ে করে সুখী হয় তা হতে দেবে না।

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু স্বার্থপর নই, আমি তোমার বলে যাচ্চি যে আমি মলে তুমি ফের বিয়ে কর।

হরিদাসী। না ভাই তোমার পায় পড়ি আমায় ও সব ঠাট্টা করনা, আমার ও সকল ভাল লাগে না।

ভগবতী আহ্লাদ সহকারে "ভাল লাগে না" বলিয়া আবার তাহার

মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "হরিদাসি। তুমি কি বিধবা বিবাহকে ভাল বল ?"

হরিদাসী। সম্পূর্ণ বলি—বিশেষতঃ যারা সইয়ের মত বিধবা।

ভগবতী। এমন দিন হবে যেদিন ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবে, কিন্তু তার এখনও বিলম্ব আছে।

হরিদাসী। তবু কত দিন।

ভগবতী। আমাদের নাতিদের আমল থেকে।

হরিদাসী। কিসে।

ভগবতী। আমাদের মত থাকলেও, আমাদের কর্তৃপক্ষীয়ের মতাভাবে আমরা তা কর‍্তে পারি না, আমাদের ছেলেরা আমাদের চেয়ে সাহস পাবে, নাতিরা সাহস করবে। আমরা যে এক টিকিওয়ালা সমাজের দায় ব্যতিব্যস্ত, যতদিন না টিকি গুলো কাটা যাচ্চে ততদিন আর উপায় নাই।

হরিদাসী। কেন, তুমি সাহস কর না ?

ভগবতী। আমি একা কর‍্লে কি হবে।

হরিদাসী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, ভগবতী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে যে দুইটিতে কমলার জন্য রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, তাহারাও নীরব হইল, ঘোর নিস্তব্ধতা মেদিনী গ্রাস করিল

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবলার প্রাণ।

আমাদের চিরদুঃখিনী কমলা দিন দিন প্যারীকে ভালবাসিতে লাগিল। প্রথমে পিতা মাতার ভয়, লোক লজ্জা প্রভৃতি কতই মনে উদিত হইতে লাগিল, কমলার হৃদয়ে বিবেচনার যে ওতপ্রোত ভাব ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা মন্দিভূত হইল। জোয়ার ভাঁটা গেল, একটানা আরম্ভ হইল, প্যারীর

প্রতি ভালবাসাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চিন্তা. ও একমাত্র কল্পনা হইয়া উঠিল। কমলা মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্যারীকে প্রাণ দিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। ভালবাসিল, মানসিক আসক্তি জন্মিল, কিন্তু আসক্তির পরিতৃপ্তি হইল না, কেন হইল না ?—কারণ তখনও কমলার মানসিক তেজ ছিল, দর্প ছিল, আত্মার উপর ক্ষমতা বিস্তারের উপায় ছিল।

সন্ধ্যাকাল, কমলা পূর্ব্ব অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজিও সেই সরোবর তীরে উপস্থিত। কমলার এই প্রফুল্ল যৌবন কালে, কমলা একাকিনী সেই জনশূন্য স্থানে উপস্থিত। একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া একটী লতাবৃতিপূর্ণ স্থানে উপবেশন করিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী হস্তলিপি বাহির করিল, আপনি মনে মনে পড়িল, তাহা এইরূপ—

১

" উপাড়িনু শতদল পরিমলে সুবাসিত,
তরুণ অরুণ ছটা তাহে যেন সুরঞ্জিত,
দিন গতে দিননাথ,
গেল অস্ত, এল রাত,
শুকাইল সে কমল ছিল যেই সুরভিত—
গেল সে অরুণ আভা গগণেতে নবোদিত।

২

শুষ্ক কমলিনী আমি ভ্রমে পড়ে কেন হায়,
কুমুদিনী ভাবি রবি অবিরত দেখি তায়।
চাঁদের কিরণে কেন,
হাসিবেরে সে প্রসূন,
মূর্খ আমি—কমলিনী চায় যে রে দিবাকর,
কমল তপন ধনে, কুমুদেবি শশধর।"

আর নাই—কমলা কবিতার এই কএক পংক্তি প্যারীর টেবিলের ভিতর পাইয়াছে, কমলা মনে মনে বলিল " প্যারি। কি করিব ভাই, যে বিধি বিড়ম্বনে চিরদুঃখী সে কি, পরকে সুখী করিতে পারে? যাহার বিপক্ষে

সমাজ, আত্মীয়বর্গ অধিক কি ঈশ্বরও খড়্গ হস্ত সে কি অপরের মনস্তুষ্টি করিতে পারে? মনে করিতাম, পিতা তাঁহার সাধের কন্যার হয়ত বিবাহ দিবেন, হয়ত আমার আবার বিধবা মতে বিবাহ হবে, হয়ত আমি যারে চাই তারে পাব, কিন্তু আশা বিফল হল, তৃষ্ণাতুরের নয়ন সমীপস্থ জলাশয় মারিচীকায় পরিণত হ'ল। হা ঈশ্বর! তুমি দয়াময় হয়ে তোমার অসংখ্য কন্যার যাতনা সচক্ষে দেখ্ছ দেব? নাথ! একবার বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ দেব, আমার মত কত পতিহীনা যুবতী কেঁদে কেঁদে রুদ্ধকণ্ঠ হচ্চে, দেখ কত আত্মহত্যা কর্ছে, কত কলঙ্কের ডালা অনন্যোপায় হয়ে মাথায় কর্ছে, শত শত ভ্রূণ হত্যা হচ্চে, দয়াময় তোমার দুহিতার নয়নবারি যদি তুমি না মুছাবে তা হলে আর কে মুছাইবে। প্যারি কেন তোমায় ভালবাসিলাম? কেন তোমায় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর্লাম, কেন তোমায় আরাধ্য দেবতা জ্ঞান কর্লাম। কপাল বৈগুণ্যে আমি পুড়্ছিলাম, না হয় আমিই পুড়্তাম তোমায় কেন পোড়ালাম? তোমায় ভালবাসিলাম কিন্তু ইহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? তোমায় ত প্রাণ থাকিতে হৃদয়ে স্থাপিত করিতে পারিব না। পিতা মাতার অন-ভিমতে তোমায় ত পতিত্বে বরণ কর্তে পার্ব না, তাঁহাদের সরল মনে ক্লেশ দিয়ে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ত তোমার হ'তে পার্ব না।"

কমলা নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল পরে বলিল "প্যারি যদি এতদূর জানি, যদি হৃদয়ে একরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বলে ধারণা আছে, তবে তোমায় ভালবাসি কেন? কেন তোমায় না দেখে থাক্তে পারি না, হা ঈশ্বর এ অবলাকে আরও যন্ত্রনা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত? তোমার বাসনা তুমিই জান? আমরা ক্ষুদ্র প্রাণি।"

কমলা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, এমত সময়ে লতামণ্ডপের দ্বারে কিসের শব্দ হইল—কমলা চমকিল, দেখিল—প্যারী।

নবম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

শপথ।

প্যারী বলিল " কমলা কাঁদ্‌ছ কেন ? "

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

প্যারী বলিল " কমলা বল আমায় পরিতৃপ্ত কর। "

কমলা। ভাই। আমি কেন কাঁদিতেছি শুনিয়া কি সুখী হইবে ?

প্যারী। সুখী না হইতে পারি কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা পাইব।

কমলা। না প্যারি তোমার শুনিয়া কাজ নাই, তাহার প্রতিকার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

প্যারী। আমার সাধ্যায়ত্ত নহে কমলা ?

কমলা নীরব হইয়া রহিল, প্যারী পুনরপি কহিল " কমলা তোমার চক্ষে জল কেন ? কাহার কবিতা পাঠ করিতেছিলে ? "

কমলা। তোমার।

প্যারী। তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে।

কমলা। তাহাতে যাহা আছে তাহা এ জগতের আর কোথাও নাই, আমার জ্ঞানেও নাই।

প্যারী। কমলা তবে কেন বলিলে যে তোমার ক্লেশের প্রতিকার করা আমার ক্ষমতাধীন নহে ?—দেখ কমলা আমার হৃদয়ের প্রতি কে.রে দেখ, তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, দেখিবে সেখানে তোমার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই, দিবানিশি তোমার জন্য যে অসহ্য যাতনা সহ্য করি, তাহা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন, কেবল তোমার আশায় বুক বাঁধিয়া আমি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছি।

কমলা। তবে তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ।

প্যারী। কেন কমলা ?

কমলা। আমি কিরূপে তোমার হইব?

প্যারী। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তোমায় বিবাহ করিব। সমাজের ভ্রূকুটি পদতলে বিদলিত করিয়া, তোমায় হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া প্রাণ জুড়াইব। আমি যত টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছি তাহাতে এক প্রকারে তোমার সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে কখনই অকৃতকার্য্য হইব না।

কমলা। প্যারি! এ কথায় আমি পরিতুষ্ট হইলাম না, আমি সুখসচ্ছন্দতার প্রত্যাশি নহি, আমি তোমার প্রত্যাশি, ভালবাসার প্রত্যাশি, কিন্তু আমি অন্যায় করিয়াছি, অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল ধারণা করিয়াছি।

প্যারী। গরল কি কমলা?

কমলা। আশার নিষ্ফলতা।

প্যারী। এখনই আশা নিস্ফল হইল?

কমলা। এখনই নয়, কএকদিন হইয়াছে।

প্যারী। কিসে?

কমলা। পিতা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।

প্যারী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কমলা পুনরপি বলিল "দেখ প্যারি, আমি যে পিতার অমতে তোমায় বিবাহ করিব, তাহা পারিব না, সুতরাং আমাদের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। প্যারি, তোমায় অনুরোধ করি—তুমি আমার আশায় আত্ম সুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও, তোমার সুখ দেখিয়াও সুখী হইব। ঈশ্বর করুন তোমার সন্তানাদি হউক, আমি তাহাদের লইয়া সকল যন্ত্রনা ভুলিয়া থাকিব। আর আমার উপায় নাই,—প্যারি আমায় ক্ষমা কর। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।

প্যারীর চক্ষু অশ্রু বিগলিত হইল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, হৃদয়ে ভয়ানক ভাব ক্রমান্বয়ে ক্রীড়াপর হইল, প্যারি অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "কমলা! প্রাণাধিকে কমলা, তোমার আশা ত্যাগ করিব? এ প্রাণ থাকিতে নহে, কমলা, তুমি যদি আমায় বিবাহ না করিয়াও সুখে থাকিতে পার তাহা হইলে আমিও পারিব।"

কমলা। প্যারি, অধীর হইও না, বিবেচনা করিয়া দেখ যে সংসারে

আমার অপেক্ষা রূপে গুণে শতাংশে শ্রেষ্ঠা অনেক রমণী আছে, তুমি সেইরূপ একটী রমণীকে বিবাহ কর, তাহাতে কালে তুমি আমায় সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিবে, আমিও তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব।

প্যারী দুই হস্তে কমলার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবকে লক্ষ করিয়া বলিল "কমলা আমি ঐ সূর্য্যদেবের সমক্ষে শপথ করিতেছি, যে যদি কখন বিবাহ করি, তাহা হইলে তোমায় করিব, নতুবা আর কাহার পাণিগ্রহণ করিব না।"

হরিদাসী ঠিক্ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল, সে একটী সুন্দর মালা রচনা করিয়া কমলাকে দেখাইতে আসিতেছিল, সহসা প্যারী ও কমলা উভয়ে কর সংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং প্যারীকে এইরূপে শপথ করিতে দেখিয়া সেই ফুলের মালাটি তাহাদের হস্তে বাঁধিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল "আমিও এক সাক্ষী।"

প্যারী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হরিদাসী আর কোন কথা কহিল না, কমলার বদন প্রতি চাহিল, দেখিল কমলার সেই সরোজ নয়নদ্বয় আরক্তিম হইয়াছে, বদনখানি শুষ্ক হইয়াছে, কমলার এ অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষেও জল আসিল, তাহার সে হাসি যেন কি মোহমন্ত্রবলে কোথায় লুকাইল।

জীবোৎপত্তি।

—:০:—

মানব অবয়বের আদর্শ গ্রহণ করিয়া একটী পুত্তলিকা সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইলে তদ্দর্শনে প্রাণ বিমোহিত হয়? সুকুমার শিশু, সুন্দরী রমণী প্রভৃতির অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে না বিমোহিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত যে কি অচিন্তনীয় ক্ষমতা বলে সৃজিত হয়, তাহা চিন্তা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত্ব নহে। একটী নব কুমার হইতে অশিতীবর্ষীয় স্থবির পর্য্যন্ত দেখ তাহাদের সকল অঙ্গ শিরা অস্থি প্রভৃতি সমস্তই এক, কিন্তু কি অলৌকিক

ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের একেবারে সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা চিন্তা করা যায় না। কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না।

একটী ঘটিকা যন্ত্র দেখিয়া তদ্‌নির্ম্মাণ কর্ত্তাকে বহু প্রশংসা করি—তাহার চক্র ও কাঁটা ইত্যাদি দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর কি অপূর্ব্ব কৌশলে, কি অপার মহিমা গুণে এই জীব দেহরূপ যন্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না, মনুষ্যের মোহান্ধতা ও অজ্ঞানতার ইহা অপেক্ষা কি উজ্জ্বলতর প্রমাণ হইতে পারে? জীব দেহরূপ ঘটিকা যন্ত্র যে কি অপূর্ব্ব কৌশলে পরিচালিত হয় তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। মনুষ্য এ পর্য্যন্ত অকুতো অধ্যবসায় প্রভাবে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তদ্‌সমস্তই যে প্রকৃতির অনুকরণে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্র, মনুষ্য বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার পথ। মানব তদূর্দ্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। মানব নির্ম্মিত যন্ত্র ও প্রকৃতিক যন্ত্রে অনেক প্রভেদ। যন্ত্র বিশেষ বিকল হইলে তাহা আপনা হইতে সংস্কৃত হইতে পারে না, কিন্তু মানব দেহ যন্ত্রে তাহা হয়। আর যন্ত্র আপনা সদৃশ যন্ত্র উৎপন্ন করিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে সমস্ত যন্ত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে তাহারা আপনার ন্যায় অপর একটী স্বতঃ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম। ইহাই ঈশ্বরের এক অদ্ভুত কৌশল।

কিন্তু এই আশ্চর্য্য হইতে আর একটী আশ্চর্য্যতর বিষয় আমরা পাঠকের গোচর করিতেছি। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যাহা মানব চিন্তার অতীত, তাহা অতি সামান্য বস্তু অণ্ড হইতে উৎপন্ন। অধিক কি এই যে আসমুদ্রি অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড ভগবান্ মনুর মতে তাহার উৎপত্তিও অণ্ড হইতে। ডারউইন সামান্য জীব হইতে কিরূপে মনুষ্য দেহ পরিণত হইয়াছে, তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। সামান্য অণ্ডপ্রসবী ইতর প্রাণী হইতে কিরূপে ক্রমশঃ উত্তমতর জীব হইয়া ক্রমে ক্রমে মানবে পরিণত হইল তাহাও বেশ বুঝা যায়। পাঠক মনে করিবেন না যে আমরা তাঁহাকে ডারউইনের মত বিশ্বাস করিতে বলিতেছি, আমরা ডারউইনের মতের কতকটা পোষকতা করিয়া স্বীয় মতের কীর্ত্তি স্থাপনা করিলাম মাত্র।

উদ্ভিৎ পদার্থও অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ বীজ ও অণ্ড একই পদার্থ—যাহা কিছু প্রভেদ আছে তাহা অতি সামান্য অতএব বীজ ও অণ্ড উভয় বস্তুকেই বীজ বলা যাইতে পারে।

স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে অণ্ডের উৎপত্তি। জগৎপাতা এ বিভিন্নতা সামান্য ম্রিয়মান পদার্থেও রাখিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৃক্ষে অনেক পুষ্পে যেমন একত্রে উভয় প্রকৃতির অবস্থান লক্ষিত হয়, সেরূপ জীবদেহে হয় না। অধিকাংশ জীবমাত্রেই স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নতাও বেশ স্পষ্ট। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে কি বিভিন্নতা তাহা উল্লেখ বাহুল্য। অশ্ব অশ্বিনী, সিংহ সিংহিনী, স্ত্রী পুরুষ, ইহাদের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। অপরাপর জীব মধ্যেও এতাদৃশ বিভিন্নতা অনায়াসে লক্ষ্য হয়। তবে কীট পতঙ্গ ও কতিপয় পক্ষী মধ্যে এই বিভিন্নতা স্থির করা কিছু দুরূহ। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা সে সকলের বিভিন্নতার নানা প্রকার অংশ বর্ণ অবয়ব প্রভৃতির নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন।

যখন জীবমাত্রেরই উৎপত্তি অণ্ড হইতে, তখন দেহী মাত্রকেই যে কোন না কোন সময়ে অণ্ডরূপে থাকিতে হয় তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং পাঠকগণের বাল্যাবস্থা হইতে যে ঘোড়ার ডিমের কথা অলিক বলিয়া ধারণা আছে, তাহা এখন হৃদয় হইতে অপনয়ন করিতে হইতেছে। যাহাই হউক আমরা এ অবস্থাকে "অণ্ডাবস্থ" বা "গর্ভাবস্থ" কহিব। বস্তুতঃ এই অবস্থায় প্রকাণ্ড জীবগণ কিরূপে বীজরূপে পরিণত হয়, তাহা চিন্তাতীত। পক্ষীগণের ডিম্বমধ্যস্থ এক প্রকার শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ হইতে কি রূপে যে ত্বক্ মাংশ নখ্ কেশ বা পুচ্ছ ইত্যাদির সৃজন হয় তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয়।

কাহার কাহার মতে কতকগুলি জীব অণ্ডজ ও কতকগুলি জরায়ুজ। কিন্তু আমরা বলি তাহা নহে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি অণ্ড হইতে। সকলেই অণ্ড দেখিয়াছেন;—অণ্ডের উপরে একটী শ্বেত আবরণ, তন্নিম্নে দুই প্রস্ত সূক্ষ্ম ত্বক্। তাহার পর শ্লেষ্মার ন্যায় শুক্ল পদার্থ। তাহার মধ্যে একপ্রকার পীতবর্ণের পদার্থ—তাহাই অণ্ডের অতীব প্রয়োজনীয়

বস্তু। ঐ পীত পদার্থ মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুহর আছে, তাহার মধ্যে আবার একটী সামান্য চিহ্ন লক্ষিত হয়। পীতাংশই সকল ডিম্বে লক্ষিত হয়, সুতরাং পীতাংশ সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় পদার্থ। প্রায় সকল স্ত্রী জাতীয় জীবমধ্যেই একটী স্বতন্ত্র আধারে ঐ পীত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। ঐ আধারের নাম " অণ্ডাধার "। অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বের ন্যায় বস্তু তাহাতে লক্ষিত হয়, তন্মধ্যেও কখন কখন ক্ষুদ্রকুহর ও চিহ্ন লক্ষিত হয়, যাহাই হউক তাহাকে প্রাগ্ডিম্বাবস্থা বলিতে আপত্তি নাই। ইতর প্রাণি মধ্যে এবং জীবদেহ যত অধম হইতে থাকে ইহাদের সংখ্যাও তত অধিক হয়। যে সকল স্ত্রীগণের ঐ প্রাগ্ডিম্ব নাই, তাহারাই সাধারণতঃ বন্ধ্যা।

সাধারণতঃ এই প্রাগ্ডিম্ব সকল সুষুপ্ত থাকে। জীবদেহ পূর্ণ বয়স্ক হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে, নির্ব্বন্ধিভূত কোন বিশেষ কারণে তাহা উত্তেজিত হইলে অণ্ডাধার হইতে গর্ভশয্যায় স্থাপিত হয় এবং তথায় জীবদেহ ভেদে অণ্ডজ জীব হইলে নির্দ্দিষ্ট কালে তাহা প্রসূত হয় এবং জরায়ুজ জীবের জরায়ুতে তাহা জীবের অবয়ব প্রাপ্ত হয়। যাহাই হউক জরায়ুতে জীবদেহ প্রাপ্ত হইয়া যাউক, আর অণ্ড প্রসূতানন্তর দেহ প্রাপ্তি হউক জীবমাত্রকেই যে কোন না কোন সময়ে অণ্ডাবস্থায় থাকিতে হয় তাহাতে সন্দেহ কি ?

যাঁহারা জরায়ুজ ও অণ্ডজের বিভিন্নতা ও প্রভেদ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় অণ্ড হইতে উৎপত্তির কোন আপত্তি না করিয়া কেবল ভূমিষ্ঠ হওনের প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সকল জীবের উৎপত্তিই অণ্ড হইতে— তবে জীব বিশেষে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহাদের অণ্ডাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায় ও একেবারে অবয়ব বিশিষ্ট জীব প্রসূত হয়।

অনেকেই অবগত আছেন যে ডিম্ব প্রসূত হইবামাত্র তাহা হইতে দেহের উৎপত্তি হয় না। খেচরের ডিম্বে তা দিতে দিতে তাহার মধ্যে ক্রমশঃ অস্থি ত্বক্ ইত্যাদি সৃজন হয়, এবং তাহাদের অবস্থার পূর্ণত্ব হইলে তাহা হইতে দেহ বিশিষ্ট শাবক জন্মগ্রহণ করে। সকল ডিম্ব যে " তা " দিলে স্ফুটিত হয় তাহা নহে, কতক ডিম্ব আপনা হইতে ফুটে, মৎস্যের ডিম্ব জলের স্রোতে ফুটিয়া যায়। যাহাই হউক জরায়ুজ জীবের ডিম্বাবস্থা

গর্ভেই জীবদেহে পরিণত হইয়া যায়। অণ্ডজ জীবের যে কারণে কাল-বিলম্বে দেহ প্রাপ্তি হয়, জরায়ুজ জীবের সে কালবিলম্ব গর্ভাবস্থাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জরায়ুজ জীব অশ্ব কিম্বা মনুষ্যের দুই এক মাস মাত্র গর্ভাবস্থায় বীজের অবস্থা যে রূপ, অণ্ডজ জীবের অণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই অবস্থা ও অণ্ডাবস্থা একই বস্তু। যখন তাহাদের কোন বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না, তখন সে অবস্থাকে অণ্ডাবস্থা বলিতে আপত্তি কি? এবং সেই সমস্ত কারণে, জীবমাত্রেরই উৎপত্তি যে ডিম্ব হইতে তাহাই বা কেন না স্বীকার করিব?

জাতীয় জীবন রহস্য।

ভারতের উন্নতি ও অবনতির ক্রম।

দিন যায় কিন্তু কথা থাকিয়া যায়। দুঃখেই হউক আর সুখেই হউক দিন অতিবাহিত হয়, দিন কাহারও সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেনা। প্রতিদণ্ডে প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে দিন যাইতেছে, নিত্য প্রলয় হইতেছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি সুখী, কি দুঃখী সকল ব্যক্তির দিন যায়, তবে কথা বা কীর্ত্তি শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন, এক সময়ে গ্রীস, রোম, মিসর ও কার্থেজ প্রভৃতি দেশের কেমন সুদিন হইয়াছিল, কেমন বুদ্ধিবলে সভ্যতা ও গৌরবের সহিত তদ্দেশবাসিগণ জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু কালক্রমে সেদিন কালের ভীষণ কুক্ষীগত হইয়াছে। গ্রীস, রোমের সে দিন গিয়াছে, তবে সে জগৎপূজ্য নাম, সে গৌরবের কথা কি কাল-গর্ভগত হইয়াছে? না, যতদিন মানবজাতি বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন সুসভ্য দেশনিচয় হইতে পুরাবৃত্তের নাম না বিলুপ্ত হইবে, ততদিন সে নাম, সে কথা থাকিয়া যাইবে।

গ্রীস, রোম প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান ও সভ্যতার জননীস্বরূপিণী ভারতমাতারও একদিন সুদিন হইয়াছিল। ভারত বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও বীরত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সর্ব্বোচ্চসোপানে আরোহণ করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে ভারতের আর সেদিন নাই, সে দিন শেষ হইয়াছে। কালবশে ভারতবাসীর পূর্ব্বতন অধিকাংশ গুণগ্রাম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ভারত অধঃপতনের, নিম্ন সোপানে অবস্থিত। আর সে শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় সমাজসংস্কারক দেখিতে পাওয়া যায় না, আর জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আর্য্যভট্ট ও মিহির নাই, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের তুল্য সত্যপরায়ণ ধর্ম্মগতপ্রাণ সাধুগণ কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে কি আর দেখিতে পাওয়া যায়? তাঁহাদের সহিত সে পাণ্ডিত্য, সে বীরত্ব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ভারতের সেই পূর্ব্ব গুণরাশি যদিও অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি সেই পূর্ব্বগৌরবের কথা বিলুপ্ত হইয়াছে? না, তাহা লুপ্ত হইবার নহে। সে পূর্ব্বগৌরব সে পূর্ব্বস্মৃতি কে বিস্মৃত হইতে পারে? সে স্মৃতি কি ত্যাগ করিতে পারা যায়? বলিতে কি, তাহা ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির আদর্শস্বরূপ। ভারতের উন্নতি হইয়াছিল, আবার অধঃপতনও হইয়াছে। কোন্ মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের—শুদ্ধ ভারতের কেন সকল সুসভ্যদেশেরই উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, অদ্য "জাতীয় জীবন রহস্য" প্রস্তাবে আমরা সেই রহস্য-ভেদ করিতে চেষ্টা করিব। অনেকে ভারতের অবনতির মূলকারণ উল্লেখের সময় বলিয়া থাকেন, কান্যকুব্জাধিপতি দুরাচার জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতাই ভারতের অবনতির মূলকারণ। তিনি বিশ্বাসহন্তা না হইলে দৃষদ্বতী নদীজলে কখনই স্বদেশহিতৈষী পৃথ্বীরাজকে জন্মের মত সুখ ও স্বাধীনতা রত্নকে জলাঞ্জলি দিতে হইত না। পাঠক! বলুন দেখি, এইটিই কি ভারতের অবনতির প্রকৃত কারণ। না, ইহা প্রকৃত কারণ নহে। অন্য গূঢ় কারণ আছে। তাহা এক অলক্ষ্য মহাশক্তির—জাতীয় জীবনের অন্তর্ভূত। সে শক্তি নষ্ট করিবার কি একজনের ক্ষমতা হয়? তাহা সমস্ত জাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। একবিন্দু বারি

কি মহাসমুদ্রেব আকার ধারণ করিতে পারে? না, একবিন্দু বালুকাকণা সুবিস্তৃত মরুভূমির আকার ধারণ করিয়া থাকে? কখনই নয়। কোটী কোটী বারিবিন্দুতে সমুদ্র হয়, কোটী কোটী বালুকাকণার সমষ্টিকেই মরুভূমি বলিয়া থাকে। সেইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনচরিত্র ধরিয়া একটী জাতীয় জীবনচরিত্র সংগঠিত হইযা থাকে। সে জাতীয় চবিত্রের উন্নতি এক মহাশক্তির মুখসাপেক্ষ। সে শক্তি লক্ষ লক্ষ লোকের শক্তির সমষ্টিভূত। একজনে সে শক্তি নষ্ট করিতে পারে না। জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতি দীর্ঘকালসাপেক্ষ। একটী মনুষ্যের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতির ক্রম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবা যায়।

এজন্য বলিতে হইতেছে, মনুষ্যেব জীবন যেমন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এই চারি কাল বা যুগে বিভক্ত, জাতীয় জীবনও তদ্রূপ চারি কাল বা যুগে বিভক্ত। উন্নতি ও অবনতি এই চাবযুগেবই অন্তর্ভূত। জাতীয় জীবনের প্রথম যুগের নাম সত্যযুগ অথবা বাল্যকাল। এটি সরলতার সময। ধর্ম্মসূত্রে জগৎবাসীকে বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার ইহাই প্রকৃত কাল। এইকালে বালকের মনে নব নব আশা ভরসা অভ্যুদযেব ন্যায় জাতীয় জীবনেও উন্নতিবীজস্বরূপ মহাশক্তির অভ্যুদয হয। লোক তখন সত্যবাদী, সবল জিতেন্দ্রিয ইত্যাদি দেবদুর্ল্লভ গুণে বিভূষিত হইযা থাকে।

তাহার পর দ্বিতীয় যুগে (ত্রেতায) যৌবনকালে সেই শক্তির পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হয। তখন জ্ঞান, বুদ্ধি সভ্যতাবলে জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিযা থাকে। ত্রেতায় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়া তৃতীয় যুগে (দ্বাপরে) অর্থাৎ জীবনের প্রৌঢ়কালে জাতীয জীবন ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবং চতুর্থ (কলিকালে) বৃদ্ধের ন্যায় জাতীয় জীবন একবারে নষ্ট হইযা যায়।

এই কারণে বলিতে হইতেছে, জাতীযজীবনের উন্নতি ও অবনতি একদিনসাপেক্ষ নহে; ইহা দীর্ঘকালের চারি অবস্থার কার্য্যস্বরূপ। যদি এইরূপ হইল তবে পাঠক মহোদযেরা বলুন দেখি, জয়চাঁদ সম্বন্ধে যে

কথা অনেকে বলিয়া থাকেন, তাঁহা কতদূর প্রামাণিক? আর্য্যসন্তানগণের জাতীয় জীবন নষ্ট হইবার জাতিগত একটী অলক্ষ্য কারণ ছিল। একারণের কার্য্যও বহুদিন পরে কান্যকুব্জাধিপতির রাজত্ব সময়ে প্রকাশিত হয়। যাহাহউক আমরা অদ্য সেই দুর্লক্ষ্য কারণটি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ন্যায়ের সহিত পৌরাণিক মতের সামঞ্জস্য নিরূপণ করিতে এবং পুরাণ যে কেবল পূর্ব্বতন আর্য্য ঐতিহাসিকগণের স্বকপোল কল্পিত অলীক প্রলাপবাক্যে পরিপূর্ণ নহে, অধিকন্তু তাহার মধ্যে যে মহান্ উদ্দেশ্য, অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ সমাজহিতকর উপদেশরাশি গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও আলোচনা করিতে যত্নশীল হইব। আর্য্যপণ্ডিতগণ উদ্দেশ্যহীন হইয়া কেবল কল্পনার সাহায্যে একটী বাক্যও অনর্থক ব্যবহার করেন নাই।

জাতীয় জীবনের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী মনুষ্যজীবনের উন্নতি ও অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয় জীবন আর কিছুই নহে, কেবল সমাজস্থ লক্ষ লক্ষ জীবনের সমষ্টিমাত্র। এ অবস্থায় একটী জীবনের ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতির ক্রম সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মতে গুণ ত্রিবিধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ত্রিবিধ গুণের সাধারণতঃ কার্য্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। আবার পুরাণ-প্রণেতাদিগের মতে সত্ত্বগুণাবলম্বী ধর্ম্মের অবতারস্বরূপ নারায়ণ বা ধর্ম্ম। রজোগুণাবলম্বিনী অর্থের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের গৃহিণী। তমোগুণবিশিষ্ট কামের প্রতিমূর্ত্তি রতিপতি তাঁহাদের সন্তান। অর্থাৎ যেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সেইখানে ধর্ম্ম, অর্থ কাম। যেখানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সেইখানেই নারায়ণ, লক্ষ্মী ও রতিপতি একত্র স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া সৃজন, পালন ও ধ্বংস সাধন করিতেছেন। পাঠক! আমরা ক্রমশঃ একথা বিশদ করিয়া দিতেছি। বলা আবশ্যক, জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতির ক্রম এই রহস্যেরই অন্তর্ভূত।

মানুষ যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার সরলতাময় জীবনের প্রথম যুগ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় যুগে যৌবনকালে পদার্পণ করে, তখন সে যদি সুনীতি ও সৎশিক্ষাবলে জানিতে পারে যে, ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান ও তাহার কার্য্য সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশ, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন, পরোপকার সত্যনিষ্ঠা এবং সৎপথে থাকিয়া জীবনযাপন মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম; ইত্যাদিরূপ অবগত হইয়া সে যদি সেইরূপ কার্য্য করে, তবে ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। নারায়ণ প্রসন্ন হইলে মনুষ্য সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া পড়েন। তখন তাহার জীবনের প্রভাতকাল উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ের প্রথম সীমায় উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্যই উন্নতির মূল কারণ স্বরূপ। এস্থলে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে অমুক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন অধর্ম্ম বলে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সে উন্নতি কি উন্নতি নয়? আমরা বলি যাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে, অস্বাভাবিক, তাহা প্রকৃত উন্নতি নামে কখনই অভিহিত হইতে পারে না। সে উন্নতি কতকাল স্থায়ী? তাহাতে কি পবিত্র সুখভোগ করিতে পারা যায়? কখনই নয়।

যাহা হউক ধর্ম্মের কৃপা হইলে, মনুষ্য ধার্ম্মিক হইলে সংসারে প্রকৃত সুখই হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, এ সংসারে মনুষ্যের সুখ ও উন্নতি কত দীর্ঘকালস্থায়ী? কালপরিবর্ত্তনের সহিত মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অবস্থার সহিত আবার মনের পরিবর্ত্তন হয়। মানুষ আবার অবস্থার দাস। দাস হইলে কেবল ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসার যাপন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অর্থ—ধনরূপিণী লক্ষ্মী,—পৌরাণিকগণের মতে ধর্ম্মরূপী নারায়ণের বনিতা। অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্ম সেইখানে অর্থ, যেখানে নারায়ণ সেইখানে লক্ষ্মী, যে স্থলে সত্ত্বগুণ সেইস্থলেই রজঃ ও তমোগুণ। পাঠক! পুরাণ প্রণেতৃগণ কি প্রলাপবাদী, না অসাধারণ সমাজ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, এই স্থলে ক্ষণকালের জন্য তাহা বিচার করিয়া দেখুন।

পুরুষ প্রকৃতির সহযোগ না হইলে—সত্ত্বগুণে রজঃগুণের মিলন না হইলে কোন বিষয়ের সৃষ্টি হইতে পারে না। রজোগুণের আধিক্যে সাংখ্যমতে প্রকৃতির গুণেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরুষের প্রকৃতি বিনা নিজের কোন ক্ষমতা নাই (১) একারণ লক্ষ্মীপতিবিয়োগ বিধুরা হইয়া পতির সন্ধান করেন ও কিছুদিন পরে পতির সহিত মিলিতা হন। মিলিতা হইলে অমনি পুরুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্ম অর্থের সহযোগে কামের—রতিপতির জন্ম হয়। পুরুষের জীবনের দুই যুগ যাইয়া তৃতীয়দশায় দ্বাপর যুগ আসিয়া পড়ে। পুরুষ রজোগুণালবম্বী হইয়া ঘোর বিলাসী হয় ও অধঃপতনের সূত্র ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করে। এবং যেমন সূত্রটি ছিন্ন হইয়া যায় অমনি পপাত চ মমার চ হন!

মনুষ্য সংসারে রজোগুণাবলম্বী হইলে, অর্থের ক্ষমতা অধিক হইলে সত্ত্বগুণের আধিক্যের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধর্ম্মের দিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্য থাকে না, ধর্ম্ম বৃদ্ধ কালে পদার্পণ করেন, ওদিকে ধনাধিষ্ঠাত্রী জননীর কৃপা ও স্নেহগুণে পুত্র কাম, দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া যৌবনদশায় পদার্পণ করিতে থাকেন। কাম উপযুক্ত হইলে বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রকে (।) পুরুষের অদৃষ্টক্ষেত্রে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থের উপায় অনুসন্ধান করেন! ধর্ম্ম যাইলে সত্ত্বগুণ চলিয়া গেলে মনুষ্য কেবল রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন রহিলেন। কিন্তু রজোগুণের আধিক্যও অধিককাল থাকে না। ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই তিন পুরুষ। সচরাচর লোকে কহিয়া থাকে পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ, পুত্রবাৎসল্য অধিক। এজন্য পিতা ত্যাগ করিলেও মাতা ত্যাগ করিতে পারেন না। ধন সম্পত্তি কিছুদিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

কিন্তু তাহাও অধিককাল থাকে না। চিরদিন কিছুই থাকিবার নয়। যখন কালক্রমে রতিপতির সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ হয়, পুরুষ যখন তমো-

---

(১) পাঠক! একথা সত্য কি না আপনারা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিবেন।

গুণাবলম্বী কামচারী হইয়া পাপপথের পথিক হইয়া পড়ে, যখন সরলা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ বারবনিতার পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে লেপনপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইয়া অনবরত সিধুপানে ঢুলু ঢুলু হইয়া আজ অমুকের পুত্র-বধূর সতীত্বনাশের চেষ্টা করেন, কাল্ অকারণ অমুকের সর্ব্বস্বান্ত করিবার উপায় দেখেন, তখন চঞ্চলা চঞ্চলা হইযা উঠেন। তিনি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া শীঘ্রই স্বীয় নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিবা থাকেন। লক্ষ্মী চলিয়া যাইবার সময় মাতৃ স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ পুরুষকে "ভিক্ষার ঝুলি" প্রদান করিয়া যান। জীবনের চতুর্থ যুগে পুরুষ এইরূপে ধনহীন হইযা পড়িলে অধঃপতনের চরমসীমা হইযা গেল। পুরুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইযা আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিযা ফেলিলেন। সংসারে এইরূপেই পুরুষের উন্নতি ও অবনতি হইযা থাকে।

পাঠক! সংসারে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি ও অবনতির ক্রম সম্বন্ধে যে রহস্য আছে, বোধ হয এতক্ষণে তাহাব মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইলেন। এক্ষণে জাতীয জীবন-রহস্যের বিষয পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিযা আসিতেছি এবং আপনারাও বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, জাতীয জীবন আর কিছুই নহে কেবল সমাজস্থ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনেব সমষ্টিমাত্র। যদি একজনের উন্নতি ও অবনতির ক্রম পূর্ব্বোক্ত রূপ হইল, তবে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের সমষ্টীভূত সমাজের পক্ষে এ নিযম কেন না বর্ত্তিবে? অবশ্য বর্ত্তিবে। গ্রীস্, রোমই বলুন আর যে দেশেই কেন বলুন না সকল দেশের সকল সমাজের পক্ষে এই নিবম অনুসারে কার্য্য হইযা থাকে ও হইবে। জাতীযজীবনের উন্নতি ও অবনতিব ক্রম এই নিয়মেরই অন্ত-র্ভূত। এটি একরূপ স্বভাবেব নিযম স্বরূপ।

ভারত স্বভাবের নিযম বহির্ভূত দেশ নহে। ভারতের পক্ষেও এই নিযমে কার্য্য হইযাছে। যখন ভারতবাসী আর্য্য সন্তানেবা একপ্রাণতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইযা সিন্ধুনদ অতিক্রম কবিযা ভাবতের বাজদণ্ড গ্রহণ কবেন, তখন তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতির সময। তাহার পরে ত্রেতায় বুদ্ধি, জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও অর্থবলে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিযা জগৎ-

পূজ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা নিজে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা সে অর্থের যেমন সদ্ব্যয় করিতে জানেন, আলস্যপ্রিয় তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা সেরূপ কখনই করিতে সক্ষম হন না। তাঁহারা অপরিমিতব্যয়ী হইয়া শীঘ্রই সে অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিলাসিতাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। দৃষদ্বতী নদীতীরে যখন হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হয়, তখন হিন্দুগণ অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ কামমুগ্ধ। কামমুগ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, অনৈক্য প্রভৃতি দোষের যে প্রবলতা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই দোষেই ভারতের অধঃপতন হইযাছে, যতদিন এই দোষের কারণ অন্তর্হিত না হইবে ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। যাহা হউক এইখানে আমরা প্রস্তাব শেষ করিলাম।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
সুবর্ণপুর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পাক-প্রণালী। মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা, শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। চীৎপুর ডাক্তার আর, জে, চক্রবর্ত্তীর ডিসপেন্সরী হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২ টাকা। গ্রেট ইডিন্ প্রেস—কলিকাতা।

রন্ধন যে অতি গুরুতর কার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, পূর্ব্বে ভারতে রন্ধনের বিশেষ সমাদর ছিল, রমণীগণের রন্ধনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজি কালি সে শ্রদ্ধা সে যত্ন আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণের হৃদয় হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াছে। ইহা যে একটী অশুভ লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ কি?

মনুষ্য যত উন্নতীর উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবে, মানব হৃদয়ে যত সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ প্রবেশ করিবে, সামাজিক ও সাংসারিক অপরাপর বিষয়ের উন্নতি কল্পে যত আগ্রহ জন্মিবে, সেই সঙ্গে জীবনের প্রধান সুখ খাদ্যেও যে সমধিক যত্ন ও উৎসাহ আপনা হইতে হইবে তাহা নিশ্চয়। সেই নিমিত্তই আজি ইংলণ্ডে পাকের প্রতি ইংরাজ মহিলাগণের যত্ন বর্দ্ধিয়াছে। কিন্তু বঙ্গের রমণীগণ সে রন্ধন কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল নভেল ও কারপেটে আস্থা প্রকাশ করিবেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আধুনিক রমণীগণ মনে করেন যে রন্ধন কার্য্য অতি হেয়, কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম—আশা করি এই অমূলক ভ্রমটী শীঘ্রই রমণীগণের কোমলহৃদয় হইতে দূর হইবে। যে রন্ধনে অন্নপূর্ণা দ্রৌপদী প্রভৃতি বিশেষ যত্ন, বিশেষ পটুতা ও বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজি এই উনবিংশ শতাব্দির রমণীরা কেন তাহাতে ভিন্নভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা আমরা বুঝি না।

আজ কাল দেখা যায় অনেকে শিক্ষা অভাবে উত্তমরূপ রন্ধন কার্য্যে পটুতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু পাক-প্রণালী দেখিয়া বিশ্বাস হইতেছে যে অচীরে রমণীগণের সে অভাব ঘুচিবে। ইহার ভাষা বেশ সরল, সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী। প্রথম সংখ্যায় মোগলাই খিচুড়ী, মোচার দমপোক্ত ও দো পিঁয়াজা এই বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে। আমরা পরীক্ষার্থ মোগলাই খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য হইয়াছিল। মনুষ্য আহারে যত ভক্ত তত আর কিছুতেই নহে, অতএব পাক-প্রণালী যে সাধারণের নিকট সবিশেষ সমাদর পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সুখাদ্য লোলুপ, যাঁহারা সুখাদ্য ভালবাসেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহারা এ পত্রিকাখানি গ্রহণ করিলে বিশেষরূপ প্রীত হইবেন।

দেশী ও বিলাতী ইংরেজ।

———০৹০———

পাঠক! মনে করিবেন না যে দেশী ও বিলাতী ইংরেজ ভিন্ন জাতীয় জীব। উভয়েই শুভ্রাঙ্গ;—হাট, কোট, পেণ্টুলনধারী—উভয়েরই বদন দিব্য লম্বিত শ্মশ্রু বিশোভিত, উভয়েরই জন্মভূমি শ্রীপাঠ ইংলণ্ড—পাঠক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে এ প্রবন্ধের অবতারণা কেন? তাহার কারণ আছে পশ্চাৎ বলিতেছি। গৃহপালিত বিডাল যতদিন গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকে, ততদিন গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট খাইযা, গৃহস্থকে আনুগত্য দেখাইযা, গৃহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপন বিনয মধুর শব্দে তাঁহার মন ভিজাইয়া লেজনাড়িয়া নিরীহতার পরাকাষ্ঠা দেখায; কুকুর দেখিলেই প্রাণভয়ে গৃহিনীর অঞ্চলাড়ালে আশ্রয লইযা প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু সেই বিড়াল আবার বনে গেলেই বনবিডাল হয। তখন তাহার গাত্রের লোম, পঞ্জর নখর বর্দ্ধিত হয, বনে অন্যান্য পশুর সহিত স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া স্বভাবের উগ্রতা জন্মে, মনুষ্যের নিকটে আসিতে ভালবাসে না, কেহ আদর করিয়া ধরিতে গেলে আঁচড়াইয়া তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয। গৃহ পালিত বিডালের এ দোষ কিসে জন্মে? সহবাস দোষে—বনে কেবল বন্য জন্তুর সাক্ষাৎ, বন্য জন্তুর বন্য ব্যবহার দর্শন ইত্যাদি কারণেই সেই দোষ জন্মিয়া থাকে। বিপরীত পক্ষে হিংস্র বন্য জন্তুগণও আবার সহবাসগুণে মনুষ্যের এত বশীভূত হয় যে স্থল বিশেষে তাহাদিগকে গৃহপালিত জন্তুদিগেরও উচ্চ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। কযেক বৎসরের চিরাঁনিশ সার্কস্ তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

ইংলণ্ড শীত প্রধান দেশ, তথায় শীত ও বসন্ত ঋতুরই প্রাধান্য; তথায ভারতের ন্যায গ্রীষ্মাধিক্য নাই। সুতরাং তদ্দেশবাসীদিগের প্রকৃতি বড় স্নিগ্ধ, বড়ই মধুর;—সে দেশের জলবায়ু এত শীতল যে দারুণ পিত্তজনক উষ্ণ দ্রব্য সেবনেও দেহের উষ্ণতা জন্মে না। নিরবচ্ছিন্ন বহ্নিসেবন পশুলোমজ বস্ত্রে অঙ্গাবরণ করিয়াও দেহের অসাড়তা দূর হয না। দেশ

গুণে, দেশের জলবায়ু গুণে মনুষ্য প্রকৃতিও শীতোষ্ণ হইয়া থাকে। কাজেই বহুল জলরাশি পরিবেষ্টিত ইংলণ্ডবাসী বিলাতী ইংরেজের মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, চিত্ত প্রশান্ত, বিনয় ও নম্রতা গুণের একমাত্র আধার ইংলণ্ডের স্ত্রী পুরুষ সকলেই সভ্যতাগুণে বিভূষিত। যে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সামান্যতম হইতেও সামান্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া উত্তর পাইলে জিজ্ঞাসিতকে ধন্যবাদ না দেওয়াকে অসভ্যতা মনে করেন, হস্তচ্যুত কোন দ্রব্য কেহ তুলিয়া দিলে তাহাকে ধন্যবাদ না দেওয়া অশিষ্টতা হইল ভাবেন, সেই দেশের লোকেরই যে বিনয় ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা আছে একথা কেনা বলিবে। তবে যে অধিকাংশ দেশী ইংরেজকে দেখিয়া আমাদিগের গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, কাছে যাইতে ভয় করে, নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিতে হয়, কেহ না সম্মুখীন হইবার ভয়ে সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ পথে গমন করে; কেন? কি কারণে এরূপ হয়? বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব—আপনাদের অপেক্ষা গৌরতম মূর্ত্তিতে, আপনাদের অপেক্ষা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, শ্বেতের পরিবর্ত্তে নীল পীত লোহিতাদি বর্ণের পরিচ্ছদাবৃত দেখিয়াই হউক, বা রাজার জাতি, সমুখ দিয়া দুই পায়ে চলিয়া যাইলে পাছে রাজভক্তি প্রদর্শনের ক্রটী জন্য গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই আশঙ্কাতেই হউক, বাঙ্গালী ইংরেজ দেখিলেই যে ভয় পায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমরা বলি ইহার কারণ ইংরেজও নয়, বাঙ্গালীও নয়—দুর্ভাগ্যবতী ভারতভূমি। ভারতের জলবায়ু গরম, শীত প্রধান দেশবাসী ইংরেজের মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার উপযোগী নহে, ভারতের মাটীতে পদার্পণ করিলেই ভারতের জলন্ত সূর্য্যের অগ্নিময় কিরণ কোমল দেহ ইংরেজের দেহ, মন জ্বালাইয়া তুলে, মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া ফেলে, শরীরী মাত্রেই লোভাদি রিপুর পরতন্ত্র। জন্মভূমিতে থাকিয়া বহুমূল্য দিয়া যে সমস্ত রসনাতোষক প্রিয়খাদ্য ইংরেজ দেখিতে পাইতেন না, এখানে সেই সমস্ত দ্রব্য স্বল্পমূল্যে পাইয়া দুইহস্তে উদরসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতের উষ্ণ জলবায়ু ইংরেজ উদরে সেই সকল খাদ্য জীর্ণ করিতে না পারায় অগ্নিমান্দ্য, তজ্জনিত শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের বিকলতা বৃদ্ধি করিতে থাকে। কাজেই ইংরেজ কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন,

যত প্রতিকার কর কিছুতেই কিছু হয় না; তবে ভাল মধ্যম নারায়ণও বিষ্ণু তৈলে যত্নসহকারে পরিসেবিত হইলে স্থান কাল ও পাত্র বিশেষে কথঞ্চিৎ ফল দর্শে।

বিলাতী ইংরেজেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যেন বিনয় ও শিষ্টাচারের এক এক খানি ছবি। ইংরেজ ভারত যাত্রা করিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতে আসিতে ইংলণ্ডে সিভিল সার্বিশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে ভারতবাসীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর ধারণা, অসীম শ্রম সহিষ্ণুতা ও উদ্যম শীলতাগুণে ভারতবাসীকে যে একটু ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন, ভারতে আসিয়া ভারতবাসীর অধিকতর প্রিয় হইবেন, ভারতবাসীও তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধার বিনিময়ে তাঁহাকে কিসে আপনাদের কণ্ঠহার করিয়া রাখিবে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে আইসেন। ভূমধ্য সাগরে পাড়ি মারিয়া আরব সাগরের উপকূল সমীপে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার বিলাতী মস্তিষ্কে আরবের শিরক্রোব উড়িয়া গিয়া লাগিল, অমনি মাথা খারাপ হইল—ইংরেজকে দিশাহারা করিল, ইংলণ্ডপোষিত বিনয় শিষ্টাচার জমাট হইয়া গেল, তাহা আর কিছুতেই সারিল না। ক্রমে জাহাজ খানি যতই নিরক্ষবৃত্তের নিকটে আসিতে লাগিল, ততই মস্তিষ্ক গরম হইতে লাগিল, তবে সামুদ্রিক বায়ু কিছু শীতল তাহাতেই উষ্ণতা ততটা অনুভূত হইল না; উষ্ণতার আবছায়া মাত্র রহিল। ক্রমে জাহাজ খানি ডায়মণ্ড হারবার উলুবেড়ে হইয়া গার্ডনরীচে পি, এন, ও কোম্পানীর ঘাটে আসিয়া লাগিল, কলিকাতা দেখিবার কৌতুহল বাড়িল, তিনি জাহাজের কেবিন হইতে মুখ বাহির করিয়া পি, এন, ও, কোম্পানির মালগুদামটী এবং অপরদিকে ভাগিরথীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ ক্রীড়িত বক্ষ তাহার অপর পারে কোম্পানীর বাগানের কয়েকটী শমীবৃক্ষ এবং তাহার মধ্যে লুক্কায়িত দুই একটী অট্টালিকার কিয়দংশ দেখিলেন। সাহেব শশব্যস্তে আপন পেকেজগুলি একটা পৃষ্টে একটা হস্তে একটা বা কাঁধে লইয়া জাহাজ হইতে নামিতে উদ্যত, এমত সময়ে কাপ্তেন বলিল করেন কি, একি আপনি ইংলণ্ড পাইলেন! আমরা এদেশের রাজা, এ দেশের লোক আমাদিগকে দেবতা জ্ঞানে দেব ভক্তি করে, আপনি

স্বয়ং এত মোট ঘাট লইয়া সহরে প্রবেশ করিলে সম্মানের লাঘব হইবে, বিশেষ দুইটা পেনী দিলে এদেশীরা আগ্রহ সহকারে অৰ্দ্ধমাইল পথ কুকুরের মত আপনার সঙ্গে সঙ্গে মোট লইয়া দৌড়িবে। বিলাতী ইংরেজ একটু অপ্রতিভ হইলেন। কাপ্তেন সাহেব আপন প্রভুতা দেখাইবার জন্য নবাগত একটী কুলীকে হস্তস্থিত চাবুক মারিয়া কহিলেন "মোট উঠাও" কুলী বেচারী পিঠ চুলকাইতে চুলকাইতে সমস্ত মোটগুলি মস্তকে লইয়া বিলাতী ইংরেজের পিছু পিছু নামিল, তীরে উঠিয়া ইংরেজ একখানি ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলেন, লগেজ শকটের ছাতোপরি রক্ষিত হইল, কোচম্যান সজোরে গাড়ি হাঁকাইল ;—দেখিতে দেখিতে গাড়ি ক্ষিদিরপুর ছাড়াইয়া কেল্লার মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। ইংরেজ গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া আপন পূর্ব্ব পৈতামহিক কীৰ্ত্তি ফোর্ট উইলিয়মের শোভা অনিমেষলোচনে বারম্বার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ব্রিটিশ সিংহের ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির সিংহদ্বারে আসিয়া ফোর্ট উইলিয়মের দৃষ্টি হারাইলেন, কিন্তু মহানগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, যথা তথা স্বজাতিগৌরব সূচক ইংরেজ বণিক্‌দিগের বিপণি দর্শনে অপার আনন্দে ডুবিলেন। গাড়ি আসিয়া উইলসেন হোটেলে লাগিল। সাহেব তথায় আড্ডা লইলেন। মনে করুন সাহেব একজন সিবিলিয়ন, অবকাশ মতে বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা করিতে গেলেন, সেখানে গিয়া তাঁহাদিগের অনন্ত প্রাধান্য, দেব বিভব, অতুল সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন—ভাবিলেন—ভারতীয় সিবিল সর্ব্বিস অতুল পদ। তখন তাঁহার ইংলণ্ড মনে পড়িল—দুঃখ হইল যে ইংলণ্ডের ইংরেজ জীবনের এতাদৃশ অপূর্ব্ব সুখে বঞ্চিত। ইংলণ্ড হইতে সাহেব এদেশে ইণ্ডেণ্ট হইবার অনতিবিলম্বেই কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইল, সাহেব বাহাদুর জেলার আসিষ্টাণ্ট হুজুরের পদে নিযুক্ত হইয়া অমুক জেলায় স্থাপিত হইলেন। সাহেব তখন বিলাতী কম্বলে পোর্টমেণ্টো করিলেন, উইলসেন হোটেলের খোরাকীর বিলে সহী করিলেন, ব্যাঙ্কে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া পাথেয় লইলেন, ও কুকের বাড়ীতে গিয়া একখানি মাঝারি ধরণের বগী উচুরকম লম্বা চেহারার একটী ঘোড়া লই

লেন। সঙ্গে মাথাকামান কান ফোড়া পিত্তলের মাকড়ী পরা, একজোড়া উড়ে বেহারা লইয়া বাঙ্গালীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া আপন রাজ্যে রওনা হইলেন। বিলাতী ইংরেজ যেদিন গিয়া জেলায় সহকারীর সিংহাসনে অঙ্গস্থাপন করিলেন সেই দিনই শুনিলেন যে সকল বাঙ্গালী তাঁহার তাঁবে কাজ করেন সকলেই "বাবু।" তখনও সাহেব কাজের শ্রী শৃঙ্খলা জানেন না, ও বুঝেন না, আইন কানুন ইংলণ্ডে বসিয়া যাহা কিছু শিখিয়া আসিয়াছিলেন, আসিবার সময় জাহাজে তাহা ব্রেকফাষ্টের সহিত ভক্ষণ করিয়া আসিযাছিলেন; দশ পনর দিন এমন কি মাসেক দুমাস এজলাসের বাবুলোকেরা সাহেবের কাজ চালাইল। "কাম আপ্‌শে চলিল।" সাহেবও এদিকে অক্‌সফোর্ড পঠিত আইন কানুনগুলি রোমস্থিত করিতে বসিলেন। প্রতি দিন সাহেব এজলাসে উঠিতে নামিতে সেরেস্তার বাবুকে যথাক্রমে গুড্‌মর্ণিং গুড্‌ইভনিং করিতেন। আসিতে যাইতে দেখিতেন শত শত কৃষ্ণকায় তাঁহার প্রত্যাগমনের জন্য ধুলুণ্ঠিত হয, তখন হইতে সাহেবের স্নিগ্ধ মাথায অধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন সাহেব জানিলেন সেরেস্তার বাবু বিনোদবিহারী পিতার জমিদারীতে বার্ষিক ছয সহস্র মুদ্রা আয সত্ত্বেও মাসিক ২৪টী টাকার জন্য তাঁহার গোলাম, যখন জানিলেন সাহেবের যষ্টি মুষ্টি ও পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গদিগেরপ্লীহা যকৃৎ ফাটিযা প্রাণ বাহির হয, যখন সাহেব জানিলেন যে কৃষ্ণাঙ্গজীবন ইংলণ্ডের কুকুর বিড়ালের জীবনের ন্যায বেওয়ারিশ। যখন সাহেব জানিলেন ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিমেয রত্নভাণ্ডার সমস্তই তাঁহার, তখন তিনি বুঝিলেন ভারতে তাঁহার কায়েমী স্বত্ব। ভারতবাসী কেবলমাত্র একমুষ্টি অন্নের অধিকারী, তখন তাঁহার তুহিনস্নিগ্ধ মস্তিষ্কে কে যেন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আনিয়া দিল। তখন তিনি ইংলণ্ডের সদ্ব্যবহার ভুলিয়া গেলেন। তখন তিনি রক্তিমলোচনে উপযুক্ত রূপে কৃষ্ণাঙ্গ সাশন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন তিনি কৃষ্ণাঙ্গের কৃতান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া বসিলেন। তখনই তিনি যথার্থ দেশী ইংরেজ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার উপর যাহা কিছু আশা ভরসা ছিল তখন হইতে সকলই ফুরাইল।

সন্ধ্যা।

(১)

রাঙ্গা আলো ছড়িয়ে তপন
নীরদ কোলে হেসে হেসে,
সরকতে সোনার বরণ
কি বাহার ওই যাচ্ছে ভেসে।

(২)

পাতার কোলে হেলে দুলে,
রাঙ্গা আভা কর্চ্ছে খেলা,
নবীন কুঁড়ি—দুলে দুলে
মাখ্‌চে সোনা জগৎ মেলা।

(৩)

নদীর জলে রবি কিবা
হাস্‌তেছে ওই সোণার হাসি,
মেখে বরণ মনোলোভা
হাস্‌ছে সুখে বালির রাশি।

(৪)

ওই দেখ সবুজ ক্ষেতে
নবীন তৃণ শোভা-ক'রে,
আপন মনে আপনি মেতে
হাস্‌ছে—সোনার বরণ ধ'রে!

(৫)

ওই দেখ সরিৎ জলে
কুমুদিনী হাস্‌ছে রবি,
একটী কুমুদ নব ত জলে
কত কুমুদ—সারি সারি।

(৬)

চারু করে কতই সতী
সোণার অঙ্গ মাজ্‌ছে সুখে,
তাইতে বুঝি হীন জ্যোতি,
উঠ্‌তেছে চাঁদ মনের দুঃখে!

(৭)

মনের সাধে কোমল করে
তুলি কুসুম শোভার রাশি,
আপন খোঁপায় আপনি পরে
কত সতী মধুর হাসি।

(৮)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজত ছবি
উঠ্‌লো শশী গগন পটে,
রাঙ্গা বরণ ছড়িয়ে রবি
ধীরে ধীরে বস্‌লো পাটে।

(৯)

শশীর কোলে নীরদ দোলে
হাসে শশী মধুর হাসি,
হাসি দেখে কুমুদ—জলে
হাস্‌চে যেন মধুর হাসি।

(১০)

কতই মরি সুহাসিনী
মন সুখে স্বামীর পাশে,
স্বামীর প্রেমে আহ্লাদিনী
স্বামীর কোলে মধুর হাসে।

(১১)

কেউ বা দেখায় শশীর খেলা
চুমি নাথের বদন শশী,

কেউ বা দেখায় আলোর খেলা
মধুর হাসি সুরূপসী।

(১২)

কেউ বা ব'সি বিরলেতে
চিকণ চিকণ চিকণ করি,
গাঁথে মালা উল্লাসেতে
স্বামীর গলে দিতে ধরি।

(১৩)

কুন্দ দন্তে অধর ধরি
হাস্‌ছে কিবা মধুর হাসি,
মনের কথা মনে স্মরি
আপন সুখে আপনি ভাসি।

(১৪)

বিরহিনী বিরল স্থানে
ভাস্‌তেছে ওই আঁখির জলে,
হা বিধাতঃ কোমল প্রাণে
এত ব্যথা দাও কি ব'লে?

(১৫)

বিরহিনী তোমায় বলি
মুছে ফেল নয়ন বারি,
মানব প্রাণে সয় সকলি
মিছে দুঃখের দাগাদারি।

(১৬)

অনাথ স্মরণ লওনারে মন
সন্ধ্যা হ'ল জীবনেতে,
রাত্রি হ'লে হবে মগন
নিদ্রা কোলে অভিভূতে।

(১৭)

রজত বরণ ছড়িয়ে কিরণ
চিরদিন কি হাস্‌বে শশী,
চিরদিন কি মানব জীবন
আনন্দেতে হয় উল্লাসি ?

(১৮)

ঢাকবে শশী, মেঘের মালা
ফুরাবে তার কিরণ যত,
মেঘের কোলে কর্‌বে খেলা
ভয়ঙ্কর দামিনী কত।

(১৯)

অশনি তায় কড় নাদে
কাঁপাইবে বসুন্ধরা,
শুনি সে রব মনের খেদে
হবে যেন বুদ্ধি হারা।

(২০)

তাইতে বলি জীবন রবি
নাহি হ'তে অস্তগত,
জগতের সেই অতুল ছবি
হওনারে তাঁর পদানত।

কমলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

ঘনিষ্ঠতায় ভালবাসার মাখামাখি, সে ঘনিষ্ঠতা কমলা ও প্যারীতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যদিও কমলা তাহার সতীত্বনিধি প্যারীকে দিবে না বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল, তথাপি ভালবাসার কেমন এক স্বভাব যে তাহাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। কত ছলে কত কৌশলে কত সময়ে প্যারীকে দেখিত, সুধু কমলা নহে, প্যারীও কমলাকে দেখিত। একদিন দুদিন করিয়া সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কমলা প্রথমতঃ দিনে দুই তিনবার প্যারীকে দেখিতে কেমন এক প্রকার লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু এখন সে প্রায়ই তাহার কাছে থাকে। মনুষ্য রীতি নীতি দেখিয়া মানব প্রকৃতি স্থির করে, সুতরাং কমলা যদিও মনে মনে জানিত যে সে সম্পূর্ণ সাধ্বী, তাহার চরিত্রে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তথাপি লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না, একজন দুজন করিয়া কমলার চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল।

একদিন কমলার মাতা কমলাকে বলিলেন "মা তুমি ত আর ছোটটী নাই, প্যারীও বালক নয়, এখন দিন রাত একত্রে বেড়ালে লোকে নিন্দে কর্‌বে।

কমলা বুঝিল,—দুই একদিন ঘনিষ্ঠতা কমাইল, কিন্তু সামান্য স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয়, প্রবল বেগ হয় না, সুতরাং আবার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা অপ্রতিহত ভাবে চলিল। কমলার মাতা বুঝিলেন গতিক মন্দ, অধিক বলিতে সাহস হইল না, মনে গোপন করিলেন। শ্যামমোহিনী গোপন

করিতে পারেন, হরিদাসী পারে, কিন্তু গ্রামের বামী, শ্যামী শুনিবে কেন, তাহারা পথে ঘাটে মিটিং আরম্ভ করিল, কত বক্তৃতা হয়, কত কি হয় কিন্তু উপসংহারে পরস্পরে বলে "পরের কথায় আমাদের কাজ্ কি বল।" এইরূপে দিনে দিনে জনরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমশঃ কমলার পিতার কাণে একটু আভাস গেল, তিনি প্যারীকে অপরের উদ্দেশে নানা কথা বলিলেন, কিন্তু প্রণয়ের জ্বলন্ত বহ্নি কি সহজে নির্ব্বাপিত হয়? কবি বলেন পাগল ও প্রণয়ী এক, সুতরাং সে কথা প্যারীর মনে দুই এক দিন রহিল মাত্র, পরে উত্তেজনার প্রবল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে মানসিক উত্তেজনার নিকট, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, উপকার, তিরস্কার প্রভৃতি সমস্তই অবনত শিরে হারি মানিল।

ক্রমশঃ রামধন কমলাকেও অপর উদ্দেশে তিরস্কার করিলেন, পরে তাহাকেই নানাপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, ভয় প্রদর্শনও হইতে লাগিল। কমলার অশ্রুস্রোতের বেগ, বলা বাহুল্য যে আরও প্রবল হইল। কমলা প্যারীর নিকট আর সেরূপ সতত যায় না, কিন্তু মন ভুলিল না, হৃদয়ের পূর্ব্ব-যাতনা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল, আমাদের সাধের কমল দিন দিন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল।

মনুষ্যের সকল প্রকার ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধি প্রবল ও উৎকট, আজি কমলার সেই মানসিক ব্যাধি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কমলা দিনে দিনে শীর্ণ বিবর্ণ ও বিষন্ন হইতে লাগিল, আহার নিদ্রায় বিতৃষ্ণা জন্মিল, নয়নবারিই কমলার একমাত্র সহায় ও সম্বল হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্ভাগ্য কখন একা আইসে না, সুতরাং কমলার ইহাতেই সকল যন্ত্রনার নিবৃত্তি হইল না, ভাবিয়া ভাবিয়া কমলার উৎকট ব্যাধি উপস্থিত

হইল। দিনে দিনে কমলার উদর বৃদ্ধি হইল, গর্ভের অনেক লক্ষণ প্রত্যক্ষিভূত হইল। শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, রামধনের মস্তক হেঁট হইল। রামধন প্যারীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, গ্রামস্থ সকলেও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে ক্রটী করিল না। প্যারী কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না, আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল, বিদায়কালে কমলার সেই কমলবদন আর দেখিতে পাইল না, ইহাই তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। এতদিন রামধনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া যে তাহা ত্যাগ করিতে হইল, সে দুঃখ তাহার হৃদয়ে তৎকালে স্থান পাইল না।

কমলার দুঃখের ইয়ত্তা নাই, একে প্রাণাধিক প্যারীর অদর্শনজনিত দুর্দ্দম যাতনা অহরহ সহ্য করিতে হইবে,—তাহাতে নিদারুণ লোকাপবাদ! কোথায় আসক্তি, কোথায় মিলন, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু লোকে বলিতেছে কমলা অবৈধ প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া গর্ভিণী হইয়াছে, কমলা যে ব্যাধিগ্রস্থা তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিক কি মনে মনে শ্যাম-মোহিনীও বিশ্বাস করেন না।

একদিন শ্যামমোহিনী ও কমলা উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন। শ্যামমোহিনী অনেকক্ষণ স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "কমলা, কি কর লি মা?"

কমলা স্তম্ভিত ভাবে কহিল "কেন, কি করেছি মা।"

শ্যাম। আমার কাছে লুকুলে আর কি হ'বে কমলা।

তখন কমলা শ্যামমোহিনীর চরণ ধরিয়া বলিল "মা! তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি, আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, আমি গর্ভবতী নহি, ইহা আমার এক ব্যাধি। মা, দুমাস চারমাস পরে লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই, তুমি এখন হইতে বিশ্বাস কর, তুমি না বিশ্বাস করিলে আর কে করিবে মা? এ লোকাপবাদ কিসে ঢাকিবে মা? আমি কেন জন্মিয়াছিলাম, সুখ কি তাহা জানি না, কিন্তু মা এ হতভাগিনীর কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত যাতনা, দেখ।

শ্যামমোহিনী তাহার কোন প্রতিউত্তর না দিয়া সজলনয়নে তথা হইতে

প্রস্থান করিলেন, কমলা তথায় অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে তথায় হারাণী নাপিতানী আসিয়া উপস্থিত। কমলা তাহাকে ঠাকুরণ্ দিদি বলিত, সুতরাং সে আসিয়াই বলিল "কি লো নাত্‌নি শুন্‌চি কি?"

কমলা দুঃখের সহিত বলিল "যা শুন্‌চো তাই শুন্‌চো!"

নাপি। তার ভয় কি, একি কেউ টের পাবে।

কমলা। কি টের পাবে?

নাপি। যা হয়েছে!

কমলার বড় দুঃখ হইল, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নাপি। আমি শুনেছি বলে লজ্জায় কাঁদছিস্, তা আমাকে লজ্জা কি? বল্‌তে গেলে কিছু থাকে না, কত লোকের কত হ'ল, তা আমি থাকতে কি আর কেউ টের পায়! তা তুই যেমন পাগ্‌লী আমায় আগে বল্‌তে নেই,—কাল বিকাল আস্‌বো সব ঠিক্ হয়ে যাবে। চুপকর কাঁদিস্ নে।

কমলা সরোদনে বলিল "ঠাকরণ্ দিদি! আমার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস্‌নে, একে বিধাতার ইচ্ছায় বাল বিধবা, তায় তোরা আপনার লোক হয়ে কোথায় দুঃখ প্রকাশ কর্‌বি, না বিদ্রূপ কর্‌ছিস্। নাপিত দিদি, তোর পায়ে পড়ি আমায় ওসব কথা বলিস্ না, ঈশ্বর না করুন, আমার গর্ভ হ'লে তোমায় ডাকুব কেন, তোমার সহায়তা লব কেন? ভ্রূণ হত্যা! প্রাণ চম্‌কে উঠে,—তোমায় পূর্ব্বে ভাল মানুষ বলে জান্‌তাম, এখন ঘোর নারীরূপিণী রাক্ষসী বলে জান্‌লাম। নাপিত দিদি এই যে সামান্য অর্থলোভে শত শত ভ্রূণহত্যার কারণ হও, তা একবারও কি মনে হয় না যে মর্‌তে হবে, ঈশ্বরের কাছে জবাব দিতে হবে। নাপিত দিদি, তোমার পায়ে পড়ি আমার সুমুখ থেকে যাও, তোমার মুখ দেখে আমার রাগ হচ্চে।

নাপিতানী তখন রোষপরবশ হইয়া বলিল "অ্যাঁ, তোর যা মুখে এল তাই বল্‌লি, লেখা পড়া শিখে ধিঙ্গি হয়েছিস্ নাকি? এর বেলা লেখা পড়া নেই, এই হারাণীর পায় পড়্‌তেই হবে, আমি কার্ কি করেছি

না, কার উপকার বই অনুপকার করেছি ? তোর মা কত বলেছিল তাই ভাবলুম্ মরুগ্যে একটা ঘর যায, না হয একটু উপকার করি, ওমা তায় এত কথা, এই চল্লাম।”

কমলা বিস্মিত হইযা বলিল “মা বলেছেন।”

নাপিতানী কমলার মুখের কাছে হাত নাড়িযা বলিল “কেউ বলেনি ত আমি আপনি এসেছি, কদিন ঢাকৃতে পারিস্ ঢাক্।”

এই কথা বলিয়া নাপিতানী সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য যে নাপিতানী পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহারই কাছে কমলার নিন্দা এবং গর্ব্ভের সত্যতা সম্বন্ধে নানা প্রকার অমোঘ কারণ নির্দ্দেশ করিল। “একে চায আরে পায” যে শুনিল সে আর মুচ্‌কি হাসিযা কমলার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনা।

আজি কমলার দিন আর যায না, কমলার জন্য শ্যামমোহিনীর মুখ দেখাইবার উপায নাই, রামধনের হেঁটমুণ্ড। গ্রামস্থ লোকেরা চক্র করিতেছে, কমলা রামধনের গৃহে থাকিলে আর কেহ তাঁহাকে লইয়া চলিবে না, আজি রামধনের মাথায আকাশ ভাঙ্গিযা পড়িযাছে। রামধন গৃহের নিভৃত কোনে বসিযা ভাবিতেছেন “হায কেন তখন আমার বন্ধুর কথামত কমলার বিবাহ দি নাই, তাহা হইলে পিতার উপযুক্ত কার্য্যও হইত, আর এরূপে অপদস্থ হইতেও হইত না। বিবাহ না দিযাও সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেছে, না হয কমলার বিবাহ দিযা, কমলার চক্ষের জল মুছিযা সমাজ ত্যাগ করিতাম। সমাজই বা ত্যাগ করিতে হইত কেন, আমি বিবাহ দিলে আরও অপরে বিবাহ দিত, কালে তাহা-দিগকে লইযা নূতন সমাজ সৃষ্ট হইত, আমি নূতন সমাজ পাইযা আবার

সুখী হইতাম, কিন্তু আমি ঘোর মূর্খ, ঘোর নারকী, জগদীশ্বর অন্ধতার শাস্তি দিতেছেন, আমার স্বার্থপরতার দণ্ড দিতেছেন। আমি আমার একমাত্র কন্যা, সাধের কমলার বলবতী ইচ্ছা সত্বেও তাহার বিবাহ না দিয়া তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত দিয়াছি, তাহাকে দিবানিশি কাঁদাইয়াছি, ঈশ্বর, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরদুঃখ কাতর ঈশ্বর কেন তাহা সহ্য করিবেন, তিনি আজি তাহার প্রতিশোধ দিতে ক্ষিপ্রহস্ত। এখন আমার উপায় কি? আজি সমাজ ত্যাগ করিব, না আমার প্রাণের দুহিতা কমলাকে ত্যাগ করিব? আহা ইতর প্রাণীরাও যত্নসহকারে তাহাদের সন্তান সন্ততীকে প্রতিপালন করে, হায়! আমি কি মনুষ্য হইয়া পশু অপেক্ষা হীনতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব? আমার কমলাই ত সংসার, কমলার জন্যই ত সংসার, তবে কমলাকে ত্যাগ করিব কেন? মা কমলা! আমি অম্লানবদনে সমাজ ত্যাগ করিব, তথাপি তোমায় ত্যাগ করিব না, তোমায় ত্যাগ করিলে আমি একদণ্ডও বাঁচিব না।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, রামধন চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "যদি কন্যার জন্য সমাজ ত্যাগ না করি তাহা হইলে লোকে আমায় কাপুরুষ বলিবে, সকলে আমায় ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিবে। কমলা তুই আমার কন্যা হইয়া আমার এ সকল দুঃখ বুঝিলি না, বৃদ্ধ পিতাকে কি এত ক্লেশ দিতে হয়, পাষাণি! আমি যে তোয় প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম এইকি তার প্রতিফল দিলি, আমি যে আমার বন্ধুর সাক্ষাতে দর্প করিয়া বলিয়াছিলাম যে কমলা ব্রাহ্মণ কন্যা তাহার বিধবা বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন? কমলা এই কি তাহার প্রতিফল, আমি কি করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইব? জগদীশ্বর! দয়াময় ঈশ্বর! আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।—দেব! আমার মৃত্যু হউক, এ সমস্ত যন্ত্রণা ঘৃণা হইতে এ জন্মের মত অব্যাহতি পাই।"

রামধন আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় শ্যামমোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—•×•—

রামধন ও শ্যামমোহিনী।

শ্যামমোহিনী রামধনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিন্তু রামধন ঘোর অন্য-মনস্ক থাকায় তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, ক্ষণেক পরে শ্যাম-মোহিনী বলিলেন "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে?"

রামধন চমকিয়া উঠিলেন, চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন, শ্যামমোহিনী; বলিলেন "না—কাঁদি নাই।"

শ্যাম। কাঁদ আর না কাঁদ উপায় ত নাই, তখন তোমায় এক-শ বার বলেছি যে কমলার বিবাহ দাও, তার দোষ কি, কচি মেয়ে স্বামী কি তা জান্‌লে না, এ সোমত্ত বয়সে সব্বাই ভাল থাকে। তোমায় কত-বার বলেছি যে কমলার প্যারীর সঙ্গে বিবাহ দাও, তা তখন বল্‌লেন "লোকে নিন্দে কর্‌বে?" এখন লোকে নিন্দে কর্‌ছে না, যাওনা লোকের মুখে সরা চাপা দাওগে। আপনার হয় ত টের পাও, সে লজ্জায় বল্‌তে জানেনা, তাই দোষ, বেশ করেছে প্যারীকে ভালবেসেছে, তার হবে কি, আমি কি মেয়ে ছাড়্‌ব নাকি?

রাম। এখন কি করা যাবে?

শ্যাম। কি কর্‌তে হবে তুমিই জান, আমার কথা শুন্‌তে ত যা কর্‌বার করা যেত। ওমা, পাঁচটা সাতটা নয় একটী মেয়ে, তা বাপ হয়ে তাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লে না? ধিক্ তোমায়।

রাম। এখন কি হবে?

শ্যাম। এক ঘরে হ'তে হবে আর হবে কি।

রাম। তাই বা কি করে হই।

শ্যাম। ইস্—কি করে হও তা বোঝা যাবে।

রাম। গর্ভটা কি সত্য?

শ্যাম। পোড়াকপাল, গর্ভ কেন হবে।

রাম। তবে ভয় কি?

শ্যাম। কে বিশ্বাস কর্‌বে যে গর্ভ মিথ্যা।

রাম। কেন—সকলকে বলা যাগ যে তোমরা আর দিন কতক দেখ, যদি সত্যই গর্ভ হয় তা হলে কমলাকে ত্যাগ কর্‌ব।

শ্যাম। তা ত শুন্‌লে আর কি।

রাম। কেন শুন্‌বে না, এই বিপদ যদি তাদের কার হ'ত, তা হলে কি আমি শুন্‌তাম না?

শ্যাম। হ্যাঁ, তোমরা শোন্‌বার লোকই বটে, যখন যার ঠেকে সেই তখন বলে, একবার গলাথেকে কাঁটা নাব্‌লে ত আর মনে থাকে না; সেবারে রায়েদের গোলাপীর বেলায় তুমিও কেমন লোক্‌ তা সকলে জেনেছে।

রামধন আর তাহাতে কোন প্রতিউত্তর দিলেন না, অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন, শ্যামমোহিনী রাগভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ও ভারত মাতা।

স্বর্ণলতা ধূলায় পড়ে হয় বিবর্ণ।
হেরিয়ে মুখশশী বুক হয় বিদীর্ণ॥

গীত।

এই পৃথিবী একটি বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থল—সুখ দুঃখের ক্রীড়া ভূমি; সকলেই ইহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী। কেহ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া কেবল সুখের তরঙ্গ দেখাইয়া—কেহ বা সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-যুগপৎ প্রদর্শন করিয়া আবার কেহ বা চিরদুঃখের বিষাদময় অভিনয় করিয়া চলিয়া যাই-তেছে। কাহারও জীবনে দুঃখের দারুণ দাবানল স্পর্শও করিতে পারে নাই—কেহ বা আজীবন সুখ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত

হইতে পারে নাই। এই পৃথিবীই কাহারও নিকট সুন্দর বিলাস কানন—আমোদ প্রমোদের বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি—আবার ইহাই অন্যের নিকট দুর্গম নিবিড় বন ও দুঃখের জীবন্ত আগার। পৃথিবীব একদিক চিরসূর্য্য করদীপ্ত ত্রিদিব—ইহাব অন্যদিক অমাবস্যার অন্ধকাবময বিভীষণ নিরয, ইহার একদিকে হাস্যের অনুপম তরঙ্গ—অন্যদিকে দুঃখেব হৃদয-দাহি বিষম মর্ম্মোচ্ছ্বাস; একদিকে নযনেব তৃপ্তিসাধিনী লাবণ্যলীলা—ইহার অন্যদিকে মর্ম্মোদাহিকা বিষাদময়ী প্রতিমূর্ত্তি; ইহাব কোথাও নানাজন সমাকীর্ণ সুন্দব নগবীব বিরাট শোভা—ইহাব অন্যত্র বিস্তীর্ণ মরুস্থলীব শূন্যমযতা; কোথাও চিব হরিৎ আস্তরণে সজ্জিত বিবাটবৃক্ষেব রাজীব শোভা, আবাব কোথাও ধূল্যবলুণ্ঠিতা ছিন্ন স্বর্ণলতিকার ক্ষীণপ্রভা, পৃথিবীতে এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র সুন্দব ও কুৎসিৎ প্রতিমূর্ত্তি সততই দেখিতে পাওযা যায, কিন্তু ঐ চিব-বসনাবৃতা রুক্ষকেশা সমুদায সুখস্পৃহাবিবর্জ্জিতা বঙ্গীয পতিবিহীনার ন্যায সহায শূন্যা—সম্পত্তি শূন্যা,—আশা শূন্যা—ভবসা শূন্যা, কার্য্য শূন্যা,—প্রবৃত্তি শূন্যা হতভাগিনী আব কোথাও দেখিযাছ কি?—দেখিযা না থাক, শুনিযাছ কি? ভোজনে স্পৃহা নাই—আহারে তৃপ্তি নাই,—শযনে নিদ্রা নাই—নিদ্রায শান্তি নাই, এমন কোন জীবন্মৃতা প্রাণীর কথা কোথাও শুনিযাছ কি? শুনিযা না থাক একবাব বঙ্গের হিন্দুপরিবার মধ্যে প্রবেশ কর, এমন সহস্র সহস্র জীবিত মৃত প্রাণী তোমার নযনের পথবর্ত্তিনী হইবে, এমন সহস্র সহস্র দগ্ধ কোবক তোমাব হৃদযকে শতধা বিদীর্ণ করিবে; এই বিশাল জগতেব প্রতিদেশ—প্রতি স্থান, প্রতি নগর—প্রতিগ্রাম,—প্রতি পল্লী—প্রতি গৃহ—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেও এই বিধবা বঙ্গীয ললনাব মত নিববলম্ব হতভাগিনী আর কুত্রাপিও তোমার নযনে প্রতিবিম্বিত হইবে না।

একটী নবীনা ব্রততী বহুকষ্টে একটী আশ্রযতরু পাইযা সোহাগে গলিযা—প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে বেষ্টন করিযা উঠিতেছিল, ব্রততীব সে ঢল ঢল লাবণ্যলীলা—সে নবীন পাতাব কমনীয কান্তি—সে সোহাগের প্রমত্তভাব, কাহার হৃদযকে না সুশীতল করিত; কিন্তু হঠাৎ প্রবল ঝটিকা উঠিল—কাল আকাশে কালমেঘ দেখা দিল; বিষম ঝড়ে আশ্রযতরু এদিক

ওদিক ঢুলিতে লাগিল—ব্রততীর বদন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে মলিন বদন আর উজ্জ্বল হইতে পারিল না; ভয়ঙ্কর ঝটিকায় বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হইল; ব্রততী তখন নিরাশ্রয়—নিরবলম্ব, এক্ষণে ভূমিই তাহার সাধের শয্যা হইল—ধূলি তাহার অঙ্গের শোভন অলঙ্কার হইল। কল্য যাহাতে সুন্দর মরকত শোভা—সোহাগ-সৌন্দর্য্য, প্রীতি-প্রেমের পবিত্র প্রভা দেখিলে, আজি তাহাতে আর সে শোভা নাই—আজি সকলই শূন্যময়। কালি যে ভবিষ্যতের সুখ আশয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল—আজি ভবিষ্যতের স্মৃতি তাহার হৃদয়কে শত শত বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতেছে। কালি যে আহ্লাদে উৎফুল্লা—গৌরবে স্ফীতা—সহায় যুতা—দশজনের মধ্যে একজন ছিল; আজি সে বিষাদভরা—এই অনন্ত পৃথিবীর অনন্ত মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়াও সকল লোক হইতেই নির্লিপ্ত। গত কল্য যাহার পৃথিবী শুদ্ধ লোক সহায় ছিল, অদ্য তাহার কেহই নাই; কল্য পৃথিবী যাহাকে সমুদায় সম্পত্তি দান করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, অদ্য সেই পৃথিবী তাহাকে সকল দ্রব্য দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে; এমন অকস্মাৎ আমল পরিবর্ত্তন কখন দেখিয়াছ কি? দেখিয়া না থাক হিন্দু অন্তঃপুরে যাইয়া দেখ; আর ইচ্ছা হয় একবিন্দু অশ্রুজল ফেল। পৃথিবীতে বঙ্গীয়া বিধবা রমণী ভিন্ন আর কেহই এত শীঘ্র পরিবর্ত্তনের অধীন নহেন। কল্য যে রমণী দিব্যাম্বরে পরিশোভিত—মনোহর বস্ত্র নিচয় অলঙ্কৃতা হইয়া লোকের নয়নে বিজুলী খেলিতেছিল, মধুর অধরে মধুর হাসি হাসিয়া সকলকে মোহিত করিতেছিল, সে বদন, সে ভূষণ, সে মধুর হাসি আজি আর নাই, তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গেল, এক্ষণে বসন-ভূষণ তাহার চক্ষের শূল—তাহার অতীত স্মৃতির দাবদাহ; এক্ষণে সকল প্রকার অঙ্গরাগই তাহার বিদ্রূপের কারণ। কালি যাহার হাসিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে, যাহার সম্মুখে সে বিজুলী-ছটা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই আনন্দিত হইয়াছে; আজি সেই হাসি হাসিলে তাহার সর্ব্বনাশ; সে হাসি জন্মের তরে হৃদয় মধ্যে লীন হইল। চিরহাস্যময়ীর হাসি যদি কখন অধর প্রান্তে দেখা দিল, তবে আর রক্ষা নাই; গৃহের অন্যান্য ভাগ্যবতী পরিজনবর্গ তাহার প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিল—তাহাকে নানারূপে লাঞ্ছনা দিল। কল্য যাহার কিছুই

করিতে বারণ ছিল না, কল্য যাহার ঊর্ণনাভতন্তুসদৃশ কেশরাশি—বিজুলী ছটা নিন্দিত হেমকান্তি, নীলাম্বরের মনোহর শোভা, অলঙ্কার রাশির প্রদীপ্ত বিভায় গৃহ আলোকিত হইত—গৃহ চত্বর যাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইত—আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত, আজি সেই গৃহ তাহার কারাগার স্বরূপ; সেই কবরী, সেই হেমকান্তি, সেই নীলাম্বর, সেই অলঙ্কার আজি তাহার বিপদের কারণ। যাহার লাবণ্যলীলা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য জগৎ সচেষ্টিত ছিল, অদ্য তাহাকে দেখিলে যাহাতে সকলেরই মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত সকলেই চেষ্টান্বিত। হতভাগিনী বিধবা বঙ্গাঙ্গনার শান্তির স্থল আর কোথাও নাই—আহা বলিতে আর কেহই নাই; যেন এই পাপ পৃথিবী তাহাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত সতত মুক্তহস্ত। কল্য যাহার সকল কার্য্যেই প্রবৃত্তি ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, উৎসাহ ছিল, স্ফূর্ত্তি ছিল, অদ্য তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছুই নাই, করিলে তাহা সকলের নিকট মহাপাপ বলিয়া গণ্য। তাহার আহারে তৃপ্তি নাই, তৃষ্ণায় শান্তি নাই। এই যে নিদাঘীয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে সমুদায় জীবজন্তু সুশীতল জলপানে হৃদয় সুশীতল করিতেছে, ইচ্ছা হইতেছে আবার পান করিতেছে, এই যে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব শীতল জলে শান্তি না পাইয়া হিমশিলা কুল্পী সেবনেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, এমন এই ভয়ানক উৎকণ্ঠার সময় ঐ দেখ শীর্ণকায়া, কোঠরস্থিত চক্ষু, জীবন্মৃতা হতভাগিনী বঙ্গীয়া বিধবা ললনা তিথিমাহাত্ম্যে তৃষ্ণায় বিকলাঙ্গী হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে, সম্মুখে বিস্তৃত জলরাশি থাকিতেও তাহার একটী গণ্ডূষ পান করিবার অধিকার নাই, করিলে ইহকালে গৃহবাস নরকভোগ, পরকালের ত কথাই নাই।

যদি ভাগ্যবলে তাহার একটী পুত্রসন্তান থাকে তাহা হইলে তাহার একটু শান্তিস্থল, মাতার শান্তির স্থল বটে, কিন্তু পুত্র বড় হইয়াত মাতার দুঃখমোচনে তত সচেষ্ট হয় না। বিধবার সন্তান প্রায়ই মূর্খ হইয়া পড়ে; কেননা মাতার ইচ্ছা পুত্র মূর্খ হইয়াই বাঁচিয়া থাকুক, উহার মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেই জননীর মহাসুখ। বিধবা জননী পুত্রকে কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে দেন না, পাছে পুত্রের কোন অঙ্গে বেদনা হয়; পুত্র জড়

পিণ্ডবৎ বসিয়া থাকিবে আর জননী যেমন করিয়াই হউক তাহার আহারীয় সংগ্রহ করিবে, তাহাতে জননীর ক্লেশ নাই, বিরক্তি নাই, ইচ্ছা সন্তান নিশ্চেষ্ট হইয়াই বাঁচিয়া থাকুক, কষ্ট করিয়া কি হইবে? তাই বিধবার সন্তান প্রায়ই নিশ্চেষ্ট, অলস, ক্রীয়াহীন, গতিহীন হইয়া পড়ে; শেষে এমন অসাড় হইয়া দাঁড়ায় যে তাহাকে বা তাহার জননীকে অন্য কেহ পদদলিত করিলেও তাহার আর প্রতিবিধান করিতে পারে না, প্রতিবিধান করিবার সামর্থ থাকিলেও প্রবৃত্তি থাকে না। তখন অপর কর্ত্তৃক অত্যাচারে তাহার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না; তৎকালে পরের পদলেহন তাহার শ্লাঘার বিষয়, অত্যাচারীর কাকুবাদ তাহার তৃপ্তির স্থল। তখন যতই কেন অত্যাচার তাহার উপর আপতিত হউক না সকলেই তাহার হৃদয় সমান প্রশান্ত, মনে দিনেকের তরেও আত্মগ্লানির উদয় হয় না।

জরাজীর্ণ ভারত মাতাও এই বিধবা বঙ্গাঙ্গনার ন্যায় হতভাগিনী; ইহার সন্তানগুলিও সেইরূপ হতভাগ্য। ভারতের এমন একদিন ছিল যখন ইহাকে দর্শন করিবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ লোক মহাসুখে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইত—ভারত কাহিনী আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিত—ভারত প্রসূত দ্রব্য মহাযত্নে সাদরে উচ্চমুখে গ্রহণ করিত, ভারতকে দেবতা ভাবিয়া সহস্র লোক সহস্র বদনে অর্চ্চনা করিত—ভারত দর্শনের আশা মনোমধ্যে উদিত হইলে স্বর্গ দর্শন সুখ অনুভব করিত। যে স্থানের মৃত্তিকা সুবর্ণ—পর্ব্বত মালা সুবর্ণ, স্রোতবতী সুবর্ণ স্রোত ধারণ করিয়া আহ্লাদে স্ফীত হয়—সেই হিরণ্ময়ী ভারত দর্শন জন্য পৃথিবী লালায়িত হইত।

ইহার এমনও দিন গিয়াছে যখন কোন যবন সাহস করিয়া ইহার সীমান্তেও আসিতে সাহস করিত না—যখন ইহার হিরণ্য প্রভা দেখিয়া দূর হইতেই ইহাকে মহাসম্ভ্রমে পূজা করিত—সেই স্থান হইতেই ভারত দর্শন ঘটিল মনে করিয়া আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিত, ধন্য বলিয়া মানিত; আপনার দেশে প্রত্যাগমন করিয়া শতমুখে তাহার সহস্রগুণ কীর্ত্তন করিত। ইহার এমনও একদিন ছিল, যখন গান্ধার হইতে ব্রহ্ম—হিমালয় হইতে কুমারীকায় নিজের বিজয় বৈজয়ন্তী পত পত শব্দে উড্ডীন হইয়া সকলকেই সন্তপ্ত করিত, যখন মহাসমুদ্র মহা গৌরবে ভারত প্রেরিত

পোতরাজী বক্ষে ধারণ করিয়া আহ্লাদে স্ফীত হইত ;—যখন ভারত সন্তান নির্ভীকান্তকরণে সদর্পে শ্বেত পক্ষ উড্ডীন করতঃ সমুদ্র বক্ষের উপর পদাঙ্কিত করিযা সিংহল সুমাত্রা-যবদ্বীপে আপনাদের উপনিবেশ সংস্থাপন ও নানাবিধ দ্রব্যের বিনিময় করিত ;—যখন তাঁহাদের যশঃ সৌরভ, চরিত্র গৌরব দিক দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইযা সীমান্তে যাইযা বিলীন হইত—তাঁহাদের বিজয় বার্ত্তা কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইত।

এক সময় ভারতের এমনও সময ছিল যখন তাহার একটী সন্তানের গাত্রে হস্ত স্পৃষ্ট করিলে সকলেরই হৃদয় জর্জ্জরিত হইত, সকলেই সম-বেদনায় ব্যথিত হইত, সকলেই তৎপ্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রাণপণে ছুটিত। তৎকালে জননী সন্তানকে ডাকিলে সন্তানগণের শব্দে সমগ্র পৃথিবী বিকম্পিত হইত, তখন কুসন্তান কেহ ছিলনা, সকলেই জননীর অভাব মোচন জন্য সমান যত্নবান ছিল, মাতার অর্চ্চনার প্রীতির জন্য সকলেই সমান বদ্ধ পরিকর ছিল। কেহ বেদ গানে, কেহ শাস্ত্রালোচনে, কেহ দর্শন বিলোড়নে, কেহ সাহিত্য সমালোচনে, কেহ বিজ্ঞান প্রতিস্ফুরণে, কেহ কাব্য মালা গ্রন্থনে, কেহ দস্যুভয় নিবারণে, কেহ সমাজ সংরক্ষণে, কেহ দেহ সংস্করণে, কেহবা অলঙ্কার গঠনে তাঁহাকে সদতই প্রসন্ন রাখিত। সুতরাং চিরপ্রসন্নময়ীর লাবণ্য-লীলায কখন কালিমা চিহ্ন স্পর্শও করিতে পারে নাই। কখন মুহুর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে অশান্তির উদয হয নাই। তাঁহার মনোহর লাবণ্যছটা দৈনন্দিন পরিবর্দ্ধিতই হইতেছিল। তাঁহার রূপ-গুণ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছিল। ভারত সন্তান যখন জগন্মাতাকে এইরূপে সমুদায সুখে সুখী করেন, যখন তাঁহাকে জগতের অধিশ্বরী করেন, যখন সকলেই প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিয়া জননীর সেবায় সন্নিবেশিত চিত্ত ; তখন পূর্ণ জোয়ারে ভাটা পড়িবার সূত্রপাত হইল। সন্তানগণের এতাধিক পরিশ্রম দেখিযা জগদ্ধাত্রীর করুণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, জননী কুক্ষণে সন্তানগণকে পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কুক্ষণে বলিলেন "বৎসগণ! আর তোমাদের অভাব কি? যাহা যাহা প্রযোজনীয তৎসমুদায়ই তোমরা আমার ভাণ্ডারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছ, আর কেন মস্তকের

ঘর্ম্ম পাদদেশে নিক্ষিপ্ত কর, পরিশ্রম করিতে ক্লান্ত হও; আমার যাহা আছে তাহা তোমাদেরই; তোমরা ইহাই সুখে উপভোগ কর; কখন কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।" সন্তানগণ মাতার এই সস্নেহ বচনে বিগলিত হইলেন; তখন একবার সকলে মিলিয়া ভাণ্ডার অন্বেষণ করিলেন, দেখিলেন তথায় কিছুরই অভাব নাই, সকলই প্রচুর; হায়! সকলেই মাতার সেই করুণ বচনে সম্মত হইল, সেই দুর্দ্দিন হইতেই জননীর সোনার অঙ্গ কলঙ্কিত হইবার সূত্রপাত হইল, সেই কুক্ষণ হইতেই সুবর্ণ বিনিন্দিত কমনীয় কান্তি মলিন হইতে আরম্ভ হইল; ভাণ্ডারস্থিত অতুলনীয় রত্নরাজী ক্ষয়িত হইতে আরম্ভ হইল। ভারত সন্তান সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে সকল মহামূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই সকল একে একে বিনষ্ট হইবার সূত্রপাত হইল।

ভারতসন্তান এতদিন প্রভূত পরিশ্রম করিয়া সুস্থ শরীরে অপার আনন্দে দিন কাটাইতেছিল, এক্ষণে সেই পরিশ্রম লব্ধ দ্রব্য উপভোগ করিবার সুযোগ বুঝিল। ভোগ্য বস্তুর প্রতি এতদিন কিছুমাত্র আস্থা ছিলনা, এক্ষণে সেই ইচ্ছা বলবতী হইল, এতদিন ভারত সন্তান বিলাস রসের আস্বাদ পান নাই, এক্ষণে তাহা পাইলেন; পাইয়া আর ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন। বিলাস এই সময়ে বারবিলাসীর ন্যায় নানাপ্রকার রঙ্গ ভঙ্গী দেখাইয়া, সকলের মন মোহিয়া, সকলকে পাপপঙ্কে ডুবাইবার, অধঃপতনের অধঃস্থলে পাঠাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইল; ভারত সন্তান ঘুমের ঘোরে নেশার ভোরে কাল ভুজঙ্গিনীর এই কাল দংশন বুঝিতে পারিলেন না; তাহার প্রত্যেক রঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য সঙ্গীতে হাব ভাব প্রদর্শনে, বাহুপ্রসারণে ত্রিদিব সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন বিলাস আপনার বিষময় ক্ষমতা এতাদৃশ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তৎসহচরী "অলস" আর স্থির থাকিতে পারিল না; সেও বিলাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনার ক্ষমতা প্রচার করিতে অগ্রসর হইল; লোকে বিলাসের দাস হইয়াছেন, সুতরাং তৎসহচরী সকলেরই প্রিয় হইল; লোকে আলস্যের পদে আত্ম সমর্পণ করিলেন। এই দুই রাক্ষসীর বিষম সংঘর্ষণে ভারত সন্তানের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তৎসমুদারই

বিনষ্ট হইল। এই দুইযের সেবা সুশ্রূষায ভারতমাতার সমুদায রত্ন নিঃশেষিত হইল, তখন তাঁহার সেই একদা পৃথিবী বিজয়ী প্রভৃত পরিশ্রমী জননীসেবা তৎপর সুপুত্রগণ অলস অবস নিশ্চেষ্ট ও অসাঢ় হইয়া পড়িযাছেন। যাহারা মাতার সামান্য মাত্র অঙ্গহীনতা দর্শন কবিলে মহা আস্ফালনে তৎপুরণে দ্বিগ্বলয প্রতিধ্বনিত কবিতেন, এক্ষণে সেই মাতাব সমুদায অলঙ্কাব সমুদায শোভা তিরোহিত হইতেছে দেখিযা মনে তিলেকের তরেও অশান্তি উদয হইল না; আবাব উদয হওযা দূরে থাকুক, জননীর তখনও যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা পবস্পবে লইবার জন্য আপনা আপনি বিবাদ বিসম্বাদ, সেই জন্যই ভ্রাতায ভ্রাতায বিবোধ, যে একতা মহামন্ত্রে তাঁহারা একদা দীক্ষিত ছিলেন, সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁহাবা বিস্মৃত হইলেন। সুতরাং মাতা এই সমযে জীবন্মৃতা; তাঁহাব তখন নড়িবার শক্তি নাই—কথা কহিবাব সমর্থ নাই। এমন আসন্ন মৃত্যুকালেও তিনি পুত্রগণকে সমান যত্নে পালন করিতে ক্রটি কবেন নাই। এই সমযে তিনি নাবীগরীমা স্বামী ধনে বঞ্চিতা হইযাছেন, তাই বিধবাব সন্তানগণ যাহাতে উদবপূর্ণ কবিযা জীবিত বহে মাতাব তাহাই একমাত্র ইচ্ছা, ও যত্ন; সন্তানের প্রতি বিধবা মাতার মাযা অধিক, যত্ন অধিক, এই জন্যই ভাবতমাতা আব সন্তানগণকে কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে দেন না, পাছে কাহারও কোন অঙ্গে বেদনা লাগে। পোতাবোহনে সাগববক্ষে যাইতে দেন না, পাছে অন্ধেব নযন পুত্রগণ জলমগ্ন হয। মাতা সন্তানকে কোন কঠিন বিদ্যানুশীলনা কবিতে দেন না, ইচ্ছা সন্তানগণ মূর্খ হইযাই বাঁচিযা থাকুক। বঙ্গীযা বিধবা মাতাব ন্যায সন্তানের প্রতি ভারতমাতাব এইরূপ ভাব বলিযাই ভারত সন্তান অধঃপাতের অধঃস্থানে গিযা পড়িযাছেন; উঠিতে ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, অধ্যবসায নাই। তবে বাঙ্গালী বিধবা মাতা কি পুত্রেব উন্নতি কামনা করেন না, পুত্র বিখ্যাত লোক হইয়া জননীর মুখোজ্জ্বল কবেন এরূপ ইচ্ছা কি তাঁহার নাই; তাহা নহে; তাঁহাব ইচ্ছা আছে, কিন্তু অনেক দুঃখে তিনি নানা কথা বলেন। ভাবতমাতাও তদ্রূপ; তিনি কি সন্তানের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আশা দেখিতে চাহেন না, তাহা কখনই নহে;

ভারত সন্তান! তোমরা পূর্ব্বে যে ভাবে মাতৃ অর্চ্চনা করিতে, একবার সেই ভাবে, সেই একতান মনপ্রাণে জাতিভেদ ভুলিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হও, দেখিবে মাতা কখনই তাহা হইলে আব বিরত হইতে আজ্ঞা করিবেন না; এক্ষণে শোক সন্তপ্তা মাতা যাহা বলেন তাহাতে মন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি মনোদুঃখে আব আপন শবীরে অঙ্গরাগ করিতে চাহেন না; কিন্তু তাঁহাকে ধূলি ধূসবিত অবস্থায় বক্ষা করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে, অতএব ভারত সন্তান একবার হিমালয হইতে কুমারিকা, পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্ম মিলিযা একপ্রাণে, একমনে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে অগ্রসর হও, এই রুক্ষকেশা, শ্রীহীনা, মলিনা, দীনাব সেই অমল হেমবিনিন্দিত কান্তি ফিবিযা আনিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হও; তিনি দাসী পদে থাকিয়া আর অঙ্গরাগ কবিতে চাহেন না, তাঁহাকে আবার পৃথিবীব অধিশ্বরী করিতে সচেষ্ট হও, দেখিবে কোন প্রকাব অলঙ্কারেই তাঁহাব অপ্রবৃত্তি নাই; না হইলে দাসী হইয়া অলঙ্কাব আশা কেবল বিড়ম্বনা, লোক গঞ্জনা ও লজ্জার কাবণ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

উদ্ভ্রান্ত চিন্তা।

এই সুখ দুঃখময় সংসারে চিন্তাশূন্য কে? ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, গৃহী, উদাসীন, পাপী, পুণ্যাত্মা, দুর্ব্বল, বলিষ্ঠ—সকলেই কোন না কোন চিন্তায় চিন্তিত। তবে সকলের চিন্তার উদ্দেশ্য সমান নহে; সময়ভেদে, অবস্থাভেদে, পাত্রভেদে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের চিন্তা। অতুল বিভবশালী রাজ্যেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্য রক্ষার্থ, রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ, বিজীগিষা চরিতার্থ করণার্থ, আ-সমুদ্র ক্ষিতি-পতি হইবার বাসনা পূরণার্থ অহর্নিশ চিন্তায় মগ্ন—আবাব পরভাগ্যোপজীবী তৃণাদপি ক্ষুদ্রতর ভিক্ষুঃ অরুণোদয হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত একমুষ্টি উদরান্নের

উপায় চিন্তায় কাতর; গৃহস্থাশ্রমী, বিষয়-মদাসক্ত, বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত কামুক রিপু-চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মনা—আবার সংসার বিদ্বেষী উদাসীন, বিষয়-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়াও, ভবপারের চিন্তায় অনুক্ষণ চিন্তিত। তাই বলি, এ সংসারে আসিয়া বিভীষিকাময়ী চিন্তা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই;—চিন্তার প্রভাবে, সুখ আশার মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে, কাহারও হৃদয় প্রফুল্লতার স্নিগ্ধ শৈত্যে দ্রবীভূত, আবার সেই চিন্তার দৌরাত্মে, বিষাদময়ী নৈরাশ্যের প্রবল তাড়নে, কাহারও হৃদয় দারুণ কালিমাময়, কাহারও বা হৃদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী একেবারে আধার চ্যুত।

এ সংসারে তবে সকলেই চিন্তাকুল; সুতরাং আমিও চিন্তার দাস, চিন্তার দুর্ণিবার তাড়নে অহর্নিশ কাতর। আমার চিন্তার আদি নাই, অন্ত নাই, কারণ নাই, কার্য্য নাই, বাধা নাই, বিরাম নাই—অথচ চিন্তা, কেবল চিন্তা, চিন্তা ভিন্ন আর আমার অন্য কোন কথা নাই। আমি না গৃহী, না উদাসীন, না পণ্ডিত, না নিরক্ষর মূর্খ, না ধনী, না একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতর, না প্রেমিক, না অপ্রেমী, না নাস্তিক, না সনাতন ধর্ম্মলোলুপ, না রুগ্ন, না সুস্থ, না পাষণ্ড, না দয়াবান,—আমি এক কিম্ভূত কিমাকার। তবে আমার কিসের চিন্তা?—আমি বড় পরশ্রীকাতর, দুটী চক্ষুঃ পাড়িয়া লোকের ভাল দেখিতে পারি না, কি উপায়ে আপনি অন্যের মত হইব আমার সর্ব্বদা এই চিন্তা। এই উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তায় (আমি পাগল! অন্তরের কথা প্রকাশ করিলেই লোকে পাগল বলে।) আমি জ্ঞান-হীন, তনু-ক্ষীণ, দীন মলিন বেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই, কখন বা একমনে, উদাস-প্রাণে, শূন্য কণ্ঠে গলাবাজী করি, কখন বা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করি, আবার চিন্তায় কাতর হইয়া নিস্পন্দ ভাবে নীরবে দর-দর-বেগে অশ্রুপাত করি। আমার চিন্তার কথা শুনে কে? আমার দুঃখে, আমার চিন্তায়, সহানুভূতি প্রকাশ করে কে? আমি লোকের ভাল দেখিতে পারি না, লোকে আমার ভাল করিবে কেন? আমার চিন্তার কেহ সাথী নহে, আমি আপন চিন্তাতে আপনিই বিভোর। অনেকে হয় ত, আমার মত স্বার্থ-চিন্তায় অন্ধ, কিন্তু তাহাদের মন সমাজোপযোগী কুটিল, তাহাদের মনের স্থিরতা আছে, তাহারা মনের ভাব মনে রাখিতে পারেন; কিন্তু আমি

পাগল! আমি তাহা পারি না, আমি অন্তরের কথা বলিয়া ফেলি, আমি কেবল বুঝি, "বলিলে লাঘব হয় মনের বেদন।" তাই আজি প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিতেছি, লোকে না শুনে না শুনুক, ঘৃণা করে করুক, আমার তাহাতে কি? আমি নিজে যাহাতে ভাল থাকি আমার তাহাই ভাল, আমি স্বার্থসিদ্ধিই ভাল বুঝি।

আমার কোন্ চিন্তাটীর কথা অগ্রে বলিব? আমার ত সকল বিষয়েরই চিন্তা, আমি ত সকল বিষয়ের জন্যই কাতর, আমার ত চিন্তার বস্তুগত তারতম্য দেখিতে পাই না, তবে কোন্ চিন্তা অগ্রে চিন্তা করিব? যাহা মনে আসে তাহাই বলি।

আমি আমার নিজের নহি। আমি আপন ইচ্ছায় খাইতে পারি না, আপন ইচ্ছায় শুইতে পারি না, আপন ইচ্ছায় মনের গতি পরিচালিত করিতে পারি না; আমি সকল বিষয়েই পরের অধীন। যাহার জীবন সীমাবদ্ধ, যাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, সে যদি সেই সীমার মধ্যে অন্তরের ভাব শিথিল করিয়া, চিন্তা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য না করিয়া, আপন ইচ্ছায় তাহা ভাসাইয়া দিতে না পারিল, তবে তাহার জীবনে ফল কি? তাহার ইহসংসারে জীবনধারণেরই বা প্রয়োজন কি? অন্যে তাহা পারে, আমি তাহা পারি না, আমার এই চিন্তা। আমি আপন রুচিতে খাইব, দুর্ভেদ্য সমাজ-বন্ধনের ভয়ে তাহা পারি না, আপন রুচিতে বেশভূষা, অঙ্গ-শোভা, করিব, দুর্নিবার নিন্দাভয়ে, গুরুপরিজনের তিরস্কার ভয়ে, সে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারি না। আবার আমি খাইই বা কি, থাকিই বা কোথা, পরিধানই বা করি কি? আমার আছে কি? আমার সকলই ছিল, কাল-চক্রের ঘূর্ণা গতিতে এখন কিছুই নাই। হিমাচলের গগণস্পর্শী চূড়া হইতে কুমারিকার অতলস্পর্শী প্রদেশ পর্য্যন্ত আমার ছিল, এখন অন্যের হইয়াছে, আমি আর এখন স্ব-ইচ্ছায় বঙ্গের প্রমোদ-উদ্যানে (ইহসংসারের নন্দনকাননে!) একবার পাদচারণ করিতে পারি না, আমারই লোক (এখন পরের হইয়াছে) আমাকে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্র উপহার দেয়; আমি পথে প্রাণ খুলিয়া দুটা গান গাহিতে পারি না, পবিত্র কীর্ত্তি শান্তিরক্ষকেরা আমাকে শান্তি ভঙ্গ-দোষে দোষী

করিয়া তাহাদিগের অববোধস্থ করে। একি সামান্য দুঃখ, একি সামান্য চিন্তার কারণ ?

আবাব আমাব আহাবেব চিন্তা। আমাব এই বহু শস্য-প্রসবিনী ভারতভূমিব অন্ন খায় কে ? পোড়া কপালেব দোষে (পাশ্চাত্য সভ্যতা কুশল পণ্ডিতেরা হযত আমাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়া ঘৃণা কবিবেন, করেন, করুন; আমি কিন্তু "অদৃষ্ট ছাড়া পথ" দেখি না!) আমাব এখন কিছুই নাই, সামান্য উদব-পূর্ত্তিব জন্য গৌবাঙ্গ-সেবা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না। সময়েব দোষে (লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলে সকলই ঘটে।) আমার রুচিবও এখন পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিলাস-সুখ প্রিয়তা বর্দ্ধিতা হইয়াছে, অঙ্গ-পারিপাট্যেব উপব তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছে, ভোগ স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, দৈহিক পরিশ্রমেব দ্বাবা স্বকীয় অভাব পূবণ কবিতে পাবি না, সামান্য গৃহাবশ্যকীয় দ্রব্যেব জন্যও অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। আবাব পবিশ্রম কবিয়াই বা কি কবিব ? আমাব পবিশ্রমেব ফল আমি ভোগ কবিতে পাই না, আমাব ভ্রাতা-ভগ্নী পায় না, আমাব বন্ধু-বান্ধব পায় না, কোথাকাব কে আসিয়া আমাব প্রস্তুতান্ন আত্মসাৎ কবে, আব আমাকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া দূর হইতে অট্টহাসি হাসে। আমি প্রকৃতই নির্ব্বোধ, তাহাব এই যথেচ্ছাচাবেব প্রতিকার না কবিয়া নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ, নির্বাক্ দাঁড়াইয়া থাকি আর কেবল শূন্য চিন্তায় অন্তব উদ্বেলিত করি।

আবাব একি ? আমাব সাহিত্য, আমাব দর্শন, আমাব বিজ্ঞান বিস্মৃতির অন্ধ-কূপে নিহিত হইয়াছে, আব আমি পবেব শাস্ত্র লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত কবিতেছি। কালিদাস, ভবভূতি, আমাব পব হইয়াছে, অ্যাডিসন, সেক্ষপিয়রেব সহিত আমাব এখন নিকট সম্বন্ধ; মনু বিশ্বামিত্রেব নাম কবিতে ঘৃণা বোধ হয়, দান্তে, কোম্‌ৎ আমার এখন যপ-মন্ত্র; খনা, গার্গীকে দূবে নিক্ষেপ করিয়া বিবি হিমেন্স, বিবি ব্রাউনিংএব আমি এখন পূজা করি; ইংলণ্ডেব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রদেশেব ক্ষুদ্র পল্লীব নাম আমার জিহ্বাগ্রে, কিন্তু কলিকাতাব দক্ষিণে কোন্ গ্রাম ভাবিয়া আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকাব দেখি; ইংলণ্ডেব কোন ষ্টুয়ার্ট নৃপতিব চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম আমি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতে পাবি, কিন্তু আমাব প্রপিতামহের

নাম স্মৃতিপথের এক পার্শ্বেও খুঁজিয়া পাই না। তাই বলি, আমার আপনার বলিতে এখন কিছুই নাই, আমি পরকেই আপন করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইব মনে করি, পোড়া বিধি বাম হইয়া আমাকে সে সুখেও বঞ্চিত করে। কৌমারেই মাতৃভূমির মায়া-জাল কাটিযা, অপার বারিধি পার হইযা, কত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমি পরের দেশে, পরের সঙ্গে, পরের শাস্ত্র শিখিতে যাই, অতি দুঃসাধ্য ব্রতে ব্রতী হই; এই ভগ্ন হৃদয়ও যোড়া লাগাইয়া, কত যত্ন, কত উদ্যম, কত অধ্যবসায় আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে মৃদু মন্থর গতিতে বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে আমার বিদেশী ভ্রাতাদের সমকক্ষ হই, কখন বা তাঁহাদের অগ্রগন্য হই; কিন্তু দেশে ফিরিয়া, আমারই আপন মাতৃভূমিতে আসিযা, আমি আর তাঁহাদের চক্ষে সেরূপ থাকি না, আমি যেন ভিন্ন কলেবর ধারণ করি, আমার বিদ্য-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা, স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য, রূপ-গুণ যেন সাগরগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসি। তখন তাঁহারা আমাকে স্বাযত্ব শাসনে অকর্ম্মন্য দেখেন, তাঁহাদের দোষ গুণ আমার দ্বারা পরীক্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন, আমাকে নিন্দুক মিথ্যাবাদী প্রমান করিবার জন্য অকাট্য (!) যুক্তি বাহির করেন, অধিক কি, আমার মাতা ভগ্নীকেও (কথা মুখে আনিতেও পাপ স্পর্শে) অজস্র গালি দিতে কুণ্ঠিত হন না। দেশের রাজা, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী আমাকে সন্তান ভাবিযা, স্নেহ করিযা, যদি কোন কার্য্য-ভার সমর্পণ করেন, নিরপেক্ষ ভাবে যদি আমাকে বিদেশী ভ্রাতাদের সহিত সমাসনে বসাইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের তাহা সহ্য হয না, গগনভেদী তারস্বরে (তাঁহাদিগের কল্পনা প্রসূত) আমার দোষ-কীর্ত্তন করেন, এমন কি, অতি পূজ্য শাসন দণ্ডাধিনাযক রাজাকেও অকর্ম্মণ্য বিবেকহীন বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ভাই পাঠক! শুনিবে কি? এই ভাবনাতেই আমি কাতর, এই চিন্তাতেই আমি পাগল; অন্যের এই অন্যায় দম্ভ, অন্যায মাৎসর্য্য, এই ঘৃণোদ্দীপক নিন্দাবাদ আমার চক্ষুঃশূল।

কিন্তু কেবল ইহাই নহে, আমার আরও চিন্তার কারণ আছে। আমার আপন ভাই বন্ধুরাই যখন আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, আমার সহিত সমান যত্নে, সমান অধ্যবসায়ে, কার্য্যে যোগ দেন না, তখন

আর পরকে দোষ দিয়া কি করিব? জাতীয় জীবনই [illegible] সুসংস্কারের মূল ভিত্তি ;—যদি প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, অন্তরে অন্তর মিশাইয়া, জাতি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, পরস্পর ঘৃণা হিংসা পরিহার করিয়া, এক হইয়া সকলে কার্য্য করিতে না পারিলাম, তবে আর আমাদের শুভচিহ্ন কোথা, আমাদের উন্নতির আশা কোথা, আমাদিগের বিজেতৃ-বিজিতের মধ্যে সাম্য সংস্থাপনের পথ কোথা? "তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নৈর্ব্ধ্যন্তে মত্তদন্তিন"—এই ভৈরবী গাথার সার মর্ম্ম যতদিন না আমার সহোদরগণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, "স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও"—এই মূলমন্ত্র যতদিন সকলে মিলিয়া সমস্বরে টোড়ী ভৈরবীতে * পঞ্চমে চড়াইয়া না গাযিতেছেন, ততদিন আমার উন্নতির পথ ঘোর কণ্টকাকীর্ণ, আমার ভোগবাসনা আকাশ-কুসুম, আমার সুখাশা জলবুদ্বুদ মাত্র! একতাই উন্নতির সোপান, একতায় দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করা যায়, অপার জলনিধি পার হওয়া যায়, অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়; একতা গুণেই বিদেশী ভ্রাতাদের আমাদিগের উপর অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, একতার অপচয়েই লঙ্কাসমরে দুর্জ্জয় রাক্ষসকুলের সমূলে নিধন। আমরা এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিলে কি স্বার্থান্ধ বিদেশী ভ্রাতারা তাঁহাদিগের ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার করিতে পারিতেন?—ধর্ম্মকে সাক্ষ্য করিয়া, ন্যায়পথে বিচরণ করিয়া আমাদিগের নৈতিক জীবনের উন্নতি করিব, আমাদিগের স্নেহময় রাজা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছায় আমাদিগকে যে স্বত্ব দান করিবেন, অবাধে তাহা উপভোগ করিব, তাঁহার নিকট আমাদিগের দুঃখের কাহিনী গাহিব, আমাদিগের অভাব জ্ঞাপন করিব,—আমাদিগের একতা থাকিলে কে তাহাতে বাধা দিতে পারে, কে তাহার পথ তমসাচ্ছন্ন বিভীষিকাময় করিতে পারে? কিন্তু,

* আমার সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা বা ব্যুৎপত্তি নাই। কিসে কি রাগিণী লাগাইতে হয় জানি না। তবে টোড়ী ভৈরবী আমি শুনিতে বড় ভালবাসি, আর আমি যাহা ভাল বাসি, আমার ধারণা, জগতের সকলেই তাহা ভালবাসে। আমি পাগল!

পেঁচো।

আমাদিগের এ অমূল্য একতা নাই, আমার সহোদরগণ ইহা বুঝিয়াও বুঝেন না, আমার ন্যায় শূন্যকণ্ঠে বাগ্‌জাল বিস্তার করেন, কোন সুফল প্রসব করেন না, আমার এই প্রধান চিন্তা।

পেঁচো।

সম্বন্ধ কত দিন।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই সম্বন্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে হয়। কোথা হইতে কত সম্বন্ধ সমুপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে কত দিন স্থায়ী তাহার মীমাংসা করা অনায়াস সাধ্য নহে। বস্তুতঃ সম্বন্ধের সহিত মানবের অনেক হৃদয়গত ভাবের ঘনিষ্ঠতা আছে। সম্বন্ধেই ভালবাসা, হাস্য, পরিহাস, গাম্ভির্য্য ও স্নেহ। যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তোমার ভালবাসাও নাই। সম্বন্ধ না থাকিলে ভালবাসা জন্মিবার সম্ভাবনা অতি কম।

যে সম্বন্ধ আমাদের জীবনের এত অধিক কার্য্য সম্পাদন করে, যে সম্বন্ধ না থাকিলে সুখ নাই, তখন সে সম্বন্ধ কতদিন স্থায়ী? কাহার মতে সম্বন্ধ জীবনাবধি। পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন সম্বন্ধও থাকিবে। কেহ প্রাণত্যাগ করিলে প্রথমত গৃহ শোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, পরিশেষে কালেতে সে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্বন্ধ যে কতদিন, তখন কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না?

যদি সম্বন্ধ জীবনা বধি হইল, তবে সংসার নিষ্ঠুর। যদি সংসার নিষ্ঠুর হইল, তবে কি নর মাত্রেই নিষ্ঠুর নহে? যখন মৃত ব্যক্তির জন্য অধিক দিন কাঁদিতে হয় না, তাহাকে কাল ক্রমে বিস্মৃতির নীরে ভাসাইতে হয়, তখন কি সংসার নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্থল নহে? এখনও কি বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে সুখ আছে? এখন ও কি মায়ার ছলনে ভুলিয়া পৃথিবী সুখের আস্পদ ভাবিতে হইবে? ধিক্ সংসারে। ধিক্ মানব হৃদয়ে!

কিন্তু সম্বন্ধ কি প্রকৃতই জীবনাবধি? কখনই নহে। যখন একটি গৃহ

পালিত কুকুর বা পক্ষী মৃত হইলে হৃদয় কাঁদে, যখন একটি প্রিয়বৃক্ষ ভঙ্গ হইলে বা হারাইলে হৃদয় ব্যাথা পায়, তখন কি এই মানব জীবনের সম্বন্ধ জীবনা বধি? না আমরা এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না। জগৎ সংসারে সমস্ত একে বারে বিলুপ্ত হয় না, সকল জীব একেবারে বিনষ্ট হইবেনা, যত দিন পর্য্যন্ত আমার পরিচিত একটি প্রাণিও জীবিত থাকিবে ততদিন সম্বন্ধ ফুরাইবে না। যখন স্মৃতি পথে সুদূর সমাগত ব্যক্তির ছায়া উদিত হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস নিপতিত হয়, মৃতব্যক্তির মূর্ত্তি হৃদয়-পটে আবির্ভূত হইলে হৃদয় বিকল হয় তখনও কি বলিতে হইবে যে সম্বন্ধ জীবনা বধি? তবে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে, যে যখন মরিবে তাহার সেই মৃত্যুর সময় হইতেই অপর ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহার যে ভালবাসা, স্নেহ বা সৌহার্দ্দ ছিল তাহা সমস্ত ফুরাইবে। কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গের ফুরাইবে না। তাহারা যত দিন এই ধরণীধামে থাকিবে ততদিন তাহাদের সেই মৃতব্যক্তির ছবি হৃদয়ে জাগরূহ রহিবে।

যাহার সহিত তোমার কোন কালে সম্বন্ধ নাই বা অতি অল্পমাত্র আছে, তিনি তোমায় বিস্মৃত হইবেন বলিয়া তুমি সম্বন্ধ জীবনাবধি একথা বলিতে পারনা। আপনার হৃদয়ের ধন কে কোথা ভুলিয়া যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে আমি মরিলে আমার আত্মীয়বর্গের সহিত আমার সম্বন্ধ ফুরাইবে। যদি সম্বন্ধ জীবনা বধির অর্থ এই টুকু হয় তাহা হইলে অন্ততঃ তহা স্বীকার করা যায়। নতুবা আমি মৃত হইলে আমার প্রকৃত আত্মীয়ের হৃদয় হইতে যে আমি বিচ্যুত হইব তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। আমিও ত কাহার না কাহার আত্মীয়, আমারও ত আত্মীয়েরমৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কই আমিত সে ছবি ভুলিতে পারিনাই! কত দিনে যে ভুলিতে পারিব তাহাও জানি না, বোধহয় এ জীবনে আর ভুলা হইবে না। সে মূর্ত্তি ভুলিব? যদি ভুলিব ত প্রীতি সহকারে কাহার আরাধনা করিব? কাহার ধ্যান করিব? কাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া প্রাণ জুড়াইব? বিরহে যাতনা আছে, কিন্তু চির বিরহে যাতনা নাই, একথা স্বীকার করিবনা। এবং মানব সম্বন্ধও যে জীবনাবধি তাহাও স্বীকার করিব না।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

একদা বাসন্তীয় দিবাবসান সময়ে যখন অস্তমিত দিনকরের হেমাভ রৌদ্র হিমাকরের তুঙ্গ শৃঙ্গবৎ দামোদর তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের শিখর দেশ প্রদীপ্ত করিতেছিল, যৎকালে সুশীতল, পরিমল সঙ্কুল মারুত হিল্লোল নদীর হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল করিতে ছিল; যখন প্রশান্ত দামোদর হৃদয় অতি ক্ষুদ্র বীচিমালার সঞ্চালনে প্রতিস্ফূরিত হইতে ছিল; যখন দামোদরের অনন্ত বিস্তৃত অম্বু রাশির উপরে ব্যবসায়ীবৃন্দের বৃহৎ বৃহৎ তরণী শ্বেত পক্ষ উড্ডীন করিয়া অতি উর্দ্ধগামী শ্রেণীবদ্ধ মরালের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, যখন বিহায়সগামী বিহঙ্গগণের বিনোদ কলরবে দিগ্বিদিক্ পরিপূরিত হইতেছিল, যখন সমীরণ সঞ্চালিত নদী তীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগণের শন্ শন্ শব্দ আর অনন্ত প্রবহমান দামোদরের কুল কুল নিনাদ শ্রুত হইতেছিল; তখন আমি প্রাসাদোপরি গমন করিয়া প্রকৃতি দেবীর রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল মনে পরমেশ্বরের প্রতি অজস্র ধন্যবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। দামোদরের বিশাল বক্ষে নৃত্যকারী তরণীচয় বিচরণে জলোচ্ছ্বাসে যেমন অম্বুরাশি উচ্ছলিত হইতেছিল, সেইরূপ আমার এই হৃদয় স্রোতে নানা চিন্তা-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম সকলই রমণীয়। নিম্নদেশে কৃষকপত্নী, পরিচারিকা সকলেই প্রদীপ জ্বালিতে ব্যস্ত; এখানে একটী জ্বলিতেছে, ওখানে একটি, সেখানে একটি, এই একটি একটি করিয়া সর্ব্বত্রেই জ্বলিতে লাগিল, প্রদীপে গ্রাম পূর্ণ হইল; একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহা হইতে আর একটি জ্বালান হইল, সেটি তাহার অনুরূপই হইল, কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় না, তৈল সংযোগে যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ ঐ প্রকারই জ্বলিবে, পরে স্তিমিত, অবশেষে নির্ব্বাণ।

যদি কেহ প্রদীপ প্রদীপ্ত করিয়া গৃহ আলোকিত করিবার নিমিত্ত দণ্ডে রক্ষা না করিয়া কোন আবরণী দ্বারা আবরণ করিয়ারাখে, তাহা হইলে

তাহার আবশ্যকতা কিছুই লক্ষিত হয় না ; প্রদীপ আর রশ্মি প্রয়োগ করিয়া গৃহস্থিত বস্তু সকলকে আলোকিত করিতে পারে না, তাহার রশ্মিতে গৃহস্থ আর কোন কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম নন। প্রদীপ আবরণীর মধ্যে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিলেও জগতস্থ আর কাহারও নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, এমন প্রদীপ থাকিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই, ইহার কোন গুণই লক্ষিত হয় না ; তবে ইহার এই ক্ষমতা আছে, ইহা হইতে অন্য একটি প্রদীপ সমুদ্ভূত হইতে পারে। এই গৃহ তখন আমার চক্ষে সংসার বলিয়া অনুমিত হইল, প্রদীপ মনুষ্য। এই মনুষ্য প্রদীপ অপর একটি প্রদীপ হইতে সমুদ্ভূত, যত দিন এই প্রদীপে জীবন তৈল সংযুক্ত থাকিবে, ততদিন ইহা সতেজেই জ্বলিতে থাকিবে, জীবন-তৈল শেষ হইয়া আসিলেই প্রদীপ স্তিমিত, অবশেষে নির্ব্বাণ।

যদি কোন প্রদীপ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞানালোক প্রাপ্ত না হইয়া অজ্ঞান রূপ আবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত হন, তাহা হইলে তাহার আর কোন গুণই লক্ষিত হয় না, কেবল তিনি পুত্র সম্পাদনেই সমর্থ, তাঁহা হইতে জগতের আর হিতানুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই।

প্রদীপ জ্বলিলে নির্ব্বাণ হইতেই হইবে, মনুষ্যও তাহাই ; আজি হউক, কালি হউক—দশ দিন পরেই হউক, মরিতেই হইবে ; কয় দিনের জন্য সংসার ? কয় দিনের জন্যই বা জীবন ? জল বুদ্বুদের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই লীন হইতে পারে, কিসের জন্য অহঙ্কার ; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে অহঙ্কার শোভা পায় না। তুমি অধিক বিলাসী ; এই বসন্ত ঋতু সমাগমে পাদপ নিচয় নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া তোমার নয়ন মন পুলকিত করিতেছে, মৃদু মন্দ সঞ্চালিত সমীরণ হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে বাসন্তী কুসুমের নিকট হইতে সৌরভ অপহরণ করিয়া তোমাকে আমোদিত করিতেছে, এই জন্যই কি অহঙ্কার করিতেছ ? ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি পাত কর—দেখ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে, সুধাকরের শীতল কিরণ প্রণয়িণীর প্রিয় সম্ভাষণের ন্যায় মন প্রাণ শীতল করিতেছে ; ধরণীর শোভার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখ, পৃথিবীর শোভা কত ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এ শোভা চিরকাল সমভাব। পৃথিবীর

শোভা বিকৃত হয়, ধরাতলের অপূর্ব্ব-ভূষণ স্বরূপ তোমার নয়ন মনানন্দ-প্রদায়িনী প্রস্ফুটিত সৌগন্ধ বিশিষ্ট কুসুম গুলি শুষ্ক হইয়া যায়, নক্ষত্র গুলি সেই প্রকারই জ্বলিতেছে, সুধাকর সেইরূপই হৃদয় সুশীতল করিতেছে; দেখ দেখি তোমার সুখ কত অল্পক্ষণ স্থায়ী, কত সামান্য, কত নিকৃষ্ট তবে আর অহঙ্কার কেন? তুমি সকলের প্রভু হইয়াছ, সকলে তোমাকে ভয় করে, তুমি যাহা কর তাহাই হয়, তুমি বল পূর্ব্বক এক জনকে পদ তলে দলিত করিয়াছ, সে প্রতিবিধান করিতে সমর্থ নয়; এই জন্যই কি অহঙ্কার করিতেছ? কর—কিন্তু আজি যেন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমি সকলের প্রভু ভাবিয়া, সকোপে এক জনকে পদতলে দলিত করিলে, হয়ত কালি এমন দিন আসিতে পারে, যে, ভেকে তোমাকে পদাঘাত করিয়া গেলেও তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে না; তবে অহঙ্কার কেন? তুমি ধনী—সকলে তোমার নিকট ধনে বশীভূত—সকলেই বাধ্য—তোমার চাটুকর, এই জন্যই অহঙ্কার করিতেছ? এ অহঙ্কার কত দিনের জন্য—ধন কত দিন থাকে—নিঃশেষ হইলেই তোমার ধন বশীভূত—তোমার বাধ্য—তোমার চাটুকার বর্গ একে একে পলায়ন করিবে; তুমি জীবন ধারণের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে গেলেও, তাহারা তোমার দিকে আর দৃষ্টিপাত করিবে না; তবে কিসের জন্য অহঙ্কার? তুমি সকল অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর, রমণীয় কোমলতা পরিপূর্ণ, তাহাতেই অহঙ্কার করিতেছ—তাহাতেই অন্য সকলকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ—দেখ দেখি সম্মুখে প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুলটি কেমন সুন্দর—কেমন রমণীয়—কেমন সৌগন্ধ বিশিষ্ট—ইহার সৌন্দর্য্যের সহিত তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা কর দেখি—তোমার সৌন্দর্য্য কত সামান্য—কত অকিঞ্চিৎ কর—তবে আর অহঙ্কার কেন? কিসের জন্য অহঙ্কার—কয় দিনের জন্য অহঙ্কার—তাই বলি, এ সংসারে অহঙ্কার ভাল দেখায় না; যেমন আসিয়াছ অমনি চলিয়া যাওয়াই ভাল, কিন্তু তাও বলি এই সময়ের মধ্যে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইতে যত্ন কর—কখন করিয়াছ কি? ধন মান যশ সুখ্যাতি পাইবার নিমিত্ত যত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, এমন কি প্রকৃত সুখ পাইবার জন্য একদিনও প্রয়াস পাইয়াছিলে—প্রকৃত সুখ কিসে হয় এক দিনও ভাবিলে না, বিমল সুখের পরিবর্ত্তে অসার আমোদ

ক্রয় করিলে; ধিক! তোমার আমোদে—ধিক্ তোমার কার্য্যে—ধিক্ তোমার জীবনে!—

মনুষ্য জীবন কি অসার; এই সকল চিন্তা আমার মনমধ্যে উদিত হইলে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; চিন্তাস্রোত অধিকতর প্রবল হইল; রাত্রিও অধিক হইয়া আসিল; আমি ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া মৃদুপদ সঞ্চারে গৃহস্থিত এক কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তথায় এক শয্যা সংরচিত ছিল—আমি তাহাতে শয়ন করিলাম, উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিলেই—এতক্ষণ চিন্তা সখির সহিত কেলী বশতঃই হউক বা রাত্রির আধিক্য প্রযুক্তই হউক—আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল; আমি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু সুচারু রূপে নিদ্রা হইল না; স্বপ্ন সহচরী আমাকে নিদ্রাদেবীর বিমলাঙ্কে সুযুক্ত দেখিয়া ঈর্ষা বশতঃ নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, তাঁহার এমনি মোহিনী শক্তি যে, একবার ভুবন মোহিনী রূপে কাহাকেও প্রলোভন প্রদর্শন করিলে, তাহাকে নিশ্চয়ই তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে; আমিও তাহাই হইলাম, প্রথমতঃ মনে নানা বিধ তরঙ্গ উঠিল—চক্ষে নানা অদৃশ্য দর্শন দেখিলাম, পরিশেষে স্বপ্ন সহচরীর সহিত অতুলানন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে, সম্মুখে নানাবিধ সুন্দর ও সৌগন্ধযুক্ত পুষ্পরাজি পরিপূরিত—মরকৎ সদৃশ তৃণাচ্ছাদিত—ফল ফুল শোভিত-রঙ্গভূমির মনোহর দৃশ্যপটের ন্যায় স্তরে স্তরে পাদপরাজি সমলঙ্কৃত—বিচ্ছিন্ন উপল খণ্ড দ্বারা আবৃত—নানা শস্য রঞ্জিত—বহুল বেগবতী স্রোতস্বতী চিত্রিত—বিচিত্র বিহঙ্গম দ্বারা স্তুত একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিলাম। প্রান্তরটির উত্তর দিকে ভীষণ দর্শন—অভ্রভেদী—অটল অচল পর্ব্বতমালা; তাহার শিখির দেশে শ্বেতবর্ণ রমণীয় মুকুট শোভা পাইতেছে, পর্ব্বতের কোথাও মনোহর নিকুঞ্জকানন—কোথাও সুশীতল সমীরণ সঞ্চালিত ব্রততী-কুল, কোথাও নব পল্লবিত সহকার তরু, কোথাও মনোহর কুসুম স্তবক, কোন স্থানে সুন্দর বিহঙ্গমগণ বিচরণ করিতেছে—কোথাও ভ্রমরকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে গুঞ্জরণ করিতেছে; কোথাও দলবদ্ধ কুরঙ্গিণী স্বীয় চাঞ্চল্য প্রকাশকরিতেছে আবার কোথাও বা তিমির সদৃশ গম্ভীর গহ্বর হইতে কুল কুল নিনাদ করতঃ স্রোতস্বতী নির্গত হইতেছে। ইহার শিখর দেশ সন্নিকটে চিরঘন বিরাজ-

মান; ঘনরাজি তথা হইতে চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, ঘন শব্দ পবনের সহিত অতুলানন্দে ক্রীড়া করিতেছে; পর্ব্বতটি যে ভাবে দণ্ডায়মান আছে তাহা অলঙ্ঘ্য—দুর্গম দুর্গ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। প্রান্তরটির দক্ষিণে সুনীল বারিধি, পর্ব্বতাকৃতি ভীষণ তরঙ্গমালা দ্বারা আপ্লুত; পূর্ব্বদিকে অতি উচ্চ গিরিমালা প্রকৃতি সুন্দরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে, পশ্চিমে দুই একটি গিরিশৃঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না, আর সর্ব্বত্রই সে বিশাল প্রান্তর, আমি সেই প্রান্তর মধ্য দিয়া গমন করিতেছি, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই প্রকৃতি দেবীর রমণীয়তা সন্দর্শনে আমার হৃদয়, সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল, ততই নানাবিধ নূতন নূতন সুন্দর পদার্থ আমার নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল; আমি বরাবর চলিলাম, প্রায় প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময়ে তথায় একটি অদ্ভুত রমনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম, তাঁহাকে সন্দর্শনেই আমার হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত হইল: তিনি কে জানিবার নিমিত্ত আমার লালসা জন্মিল, ঐকান্তিক অগ্রহসহকারে আমি অগ্রসর হইলাম,—দেখিলাম তিনি একটি যথার্থ রমণীরত্ন, একটি পুরুষের অঙ্কে শায়িতা; রমণীটি দেখিতে অতীব সুন্দরী, কিন্তু যে সকল বিলাসবতী আমাদের গৃহ স্বরূপ বিলাস কাননকে সমুজ্জ্বল করেন, তাঁহাদিগের মত নন, অধরে তাম্বুল-রাগ নাই—কুরঙ্গিনী সদৃশ নয়নে উজ্জ্বল কজ্জল রেখা নাই—চরণতলে অলক্তকের চিহ্ন মাত্র নাই, কোনরূপ কৃত্রিম অলঙ্কার তাঁহার অনুপম দেহের লাবন্য বর্দ্ধিত করে নাই; তিনি স্বাভাবিক সুন্দরী; অলঙ্কারের প্রদীপ্ত বিভায় অকৃত্রিম সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় না: রমণীর রূপই অলঙ্কার—গুণই অলঙ্কার; অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য: বাস্তবিক রমণটি এইরূপ সুন্দরী। কিন্তু তাঁহাকে এদেশীয় বলিয়া বোধ হইল না; যেন বিদেশীয়; চরণে অলক্তকের পরিবর্ত্তে জুতা, অধরে তাম্বুল রাগের চিহ্ন মাত্র নাই, তথাপি কেমন মনোহর—যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ দল তাঁহার অধর প্রান্তে সতত বিরাজ করিতেছে; অধিক কি রমণীটি পরমা সুন্দরী; তবে যে তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই তাহা নহে; তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহেন, তাঁহার নিটোল কপোল দেশে মসি চিহ্ন; স্থানে স্থানে ঘন মসীর রেখা; ইহাতেই তাহাকে

কথঞ্চিৎ মলিন দেখাইতেছে, যাহা হউক তিনি যে পুরুষাঙ্কে শায়িতা আছেন্ তাহাকে এদেশীয় বলিয়া অনুভূত হইল; কিন্তু প্রথম সন্দর্শনেই তাহাকে চিনিবার উপায় নাই, কেননা তাঁহার বসন ভূষণ, হাব ভাব, কথা-বার্ত্তা সমুদায়ই বিদেশীয়, যাহা হউক তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে আমার মনে ভয়ের আবির্ভাব হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আর রহিল না। আমি অগ্রসর হইলাম—দেখিলাম সেই অপূর্ব্ব কান্তি স্ত্রীলোকটির পদতল সন্নিহিত আর একটি ব্যক্তি; ইহাকে প্রথম দর্শনে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না; কেননা তিনি অতিশয় কৃশ ও তাঁহার পদতলস্থিত ভূমির উপর ধূলি শয্যায় বিলুণ্ঠিত, ইহাকে দর্শন করিয়া আমার মনে যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল; দুঃখের কারণ, দেখিয়াই বোধ হইল, ইনি পূর্ব্বে রূপ গুণ সম্পন্ন অতিশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, বিস্ময়ের কারণ ইনি ভয়ানক চীৎকারে দিগ্বলয় প্রতিধ্বনিত করিলেও সেই বলিষ্ঠ পুরুষের মনে কিঞ্চিৎমাত্রও করুণার উদয় হইতেছে না। ভূপতিত পুরুষ পূর্ব্বে বিশেষ শ্রী সম্পন্ন ছিলেন—কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আর কিছুই নাই; কোন ব্যাধি হইয়াছে কি না দেখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহার কোন কিছুই পরিলক্ষিত হইল না, তখন মানসিক পীড়াই তাহার এরূপ হইবার কারণ বলিয়া জানিতে পারিলাম; যাহা হউক যাহাতেই হউক তিনি অতিশয় কৃশ ও মলিন; তাঁহার নয়ন প্রান্ত দিয়া অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে থাকিয়া থাকিয়া এক একটী দীর্ঘশ্বাস প্রসূত হইতেছে। তিনি কখন কখন অতি উচ্চস্বরে রোদন করিতেছেন আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাঁহার স্বর বিকৃত হইতেছে—অমনি চুপ করিতেছেন। আমি তাঁহার ক্রন্দনের কারণ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু প্রথমোক্ত সুন্দর বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি, তাঁহার এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণে বলিতেছেন "চুপ কর্ বেটা! এখান হতে দূর হ; যদি থাকৃতে চাস, তবে যা বলি তা শোন্।" তখন সেই কৃশব্যক্তিটি আরও তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাঁহার এবম্বিধ কাতোরক্তিতে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তাঁহার দুঃখের কারণ অবগত হইবার জন্য তাহা ব্যাকুলিত হইল; কিন্তু সেই বলিষ্ঠের মন পাষাণ সদৃশ; নড়িতেছে না—টলিতেছে না—একই ভাব। সেই স্থানে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সাহায্য প্রাপ-

নাথ চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম, কিন্তু সেইরূপ সহস্র সহস্র, জীবিত মৃতপ্রাণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না তখন আমি নিজেই বদ্ধ পরিকর হইয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইলাম; কিন্তু না; সেই দুর্ব্বৃত্ত নর পিশাচ, রোষকষায়িত লোচনে আমার প্রতি চাহিল—বলিল "রে মূর্খ! আপনার বিপদ জন্য সমুদ্যত হইয়াছিস্।" তাঁহার বাক্যে আমার একটু ভয় হইল—আমি সরিয়া আসিলাম দেখিলাম সেই সুন্দরী রমণীটি আমাকে তাঁহার উদ্ধারার্থ ইঙ্গিত করিতেছেন; কিন্তু আমার আর সাহস হইল না, আমি পিছিয়া আসিলাম ইহা দেখিয়া সুন্দরীর বদন মলিন ভাব ধারণ করিল, তিনি অতি বিমর্ষভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তখন আমি তাঁহার মলিনতার কারণ বুঝিলাম; তিনি ঐ ক্লেশের কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই যে তাঁহার দুঃখ তাহা বুঝিলাম। কিন্তু তিনি কে, এই ক্লেশই বা কে এবং তাঁহার কপোলদেশে মসী-চিহ্নই বা কেন এ সকল কিছুই বুঝিলাম না এবং বুঝিলাম না বলিয়াই তাহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম; হইয়াই তাহারই অতি নিকটে অপর একটি পলিতাঙ্গী শুক্ল কেশা দীনা হীনা ক্ষীণা মলিনা বৃদ্ধা দেখিতে পাইলাম। কিশোরী অবস্থায় তাঁহার যে অতিশয় লাবণ্য ছিল, তাহা দেখিলেই স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারা যায় এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সচরাচর নারীজাতীর সম্ভবে না, তিনি যতই কেন শ্রীহীনা হউন না, দেবী সুলভ সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে বিভূষিত ও সুসুন্দরী করিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিও সর্ব্বদা অশ্রুবারী বিসর্জ্জন করিতেছেন—তিনিও ধূলিশয্যায় শয়ান আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয়, দুঃখস্রোতে একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, আমিও যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হাহাকার রবে কাঁদিয়া উঠিলাম; তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল; আমি তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলাম; নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে যেই প্রথমোক্ত রমণী রত্নটি আমার দিকে করুননেত্রে চাহিলেন, আমি সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আপনি কে? তিনি অতি মৃদু অথচ সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন "আমাকে দেখিয়া বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছেন আমি

বিদেশীয়, কিন্তু বিদেশীয় হইলেও এই আমার জন্মস্থান, আমি প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মা কর্ণের কন্যা; আমার নাম চিরস্থায়ী।” তাঁহার প্রত্যুত্তরে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহার অমল কমল বিনিন্দিত নিটোল কপোলদেশে মসীচিহ্নের এবং তাঁহার সতত ম্রিয়মাণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি সেইরূপ অমৃতবর্ষী স্বরে বলিলেন “এই সকল শুনিতে আপনার যদি ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন; পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি মহামতী কর্ণের আদরের কন্যা; যাহার ক্রোড়ে আমাকে শায়িতা দেখিয়াছেন তিনি আমার স্বামী, আর ঐ যে পদতলন্যস্ত কৃশব্যক্তি উনি বঙ্গীয় কৃষক। আমার স্বামী এই কৃষকের, মঙ্গল কি শ্রী দেখিতে ইচ্ছা করেন না, কৃষক একটু উঠিতে চেষ্টা করিলেই আমার স্বামী উহার গলদেশ আমাকে পদদ্বারা মর্দ্দন করিতে বলেন; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক—উহা যে মহাপাপ, তাহা আমি বেশ জানি সুতরাং তাহাতে কাতর এবং ঐ জন্য মর্ম্মপীড়ায় অহরহ জর্জ্জরিত। কিন্তু এ দিকে স্বামী বাক্য অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন কখন আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, হায়! কেন আমি জন্মিলাম; জন্মিলাম ত একবারে মরিলাম না কেন? হায় পিতঃ! যদি আমাকে জীবিতই করিলেন তবে আমার সমুদয় দুঃখের কারণ নিবারণ করিলেন না কেন? আপনার পরমবন্ধু মহামতির কথা শুনিলেন না কেন? শুনিলেত আর আমাকে এমন করিয়া চিরদিন কাঁদিতে হইত না; না পিতঃ! সামান্য একটু বুঝিবার ত্রুটি জন্য আমাকে আজীবন কাঁদাইলেন? আর কতদিন কাঁদিতে হইবে, ভগবান জানেন। আমার পিতারই বা দোষ কি? তিনি যাহা করিয়া ছিলেন তাহা অমৃতেরই জন্য, কিন্তু আমার স্বামীর দোষে সেইত অমৃতভাণ্ডে হলাহল উত্থিত হইল। ইহাতে কখন গরল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আমার জন্মদাতার বিশ্বাস ছিল না, তাই পরিণাম দর্শী লোকের কথায় তাঁহার অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হইল না, তিনি আপন জামাতাকে সদগুণ সম্পন্ন বলিয়া অন্ধবিশ্বাস করিলেন, তিনি যে অপাত্রে আপন কন্যাদান করিয়াছেন তাহা বুঝিলেন না, অপরে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তিনি আপনার বিশ্বাস ছাড়িতে পারিলেন

না, তাহাতেই এই গরল উত্থিত হইয়াছে; হায়। যদি তাঁহার পরামর্শ শুনিতে তাহা হইলে আর অহরহ আমাকে নয়নাসারে বক্ষস্থল ভাসাইতে হইত না। এক্ষণে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তাঁহার স্থানীয় মহামতি দীপন সেই ভ্রমটি লক্ষ্য করিয়াছেন—লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু না, পরম্ প্রকৃতিক আমার স্বামী ঐ দেখুন তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত; আবার আমার স্বামীর উপযুক্ত পরিচালক। এই দেখুন তাহাতে ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার বংশধরেরাই ইহার সমুদায় ফলভোগ করেন; তাহার পরিচালক নীচবংশ হইতে উচ্চস্থানে সমাসীন হইয়াছেন; তিনি আপনার জাতির উন্নতি কামনা করিতেছেন, সুতরাং সেইরূপেই আমার স্বামীকে চালাইতেছেন, পরিচালক যে নাম গ্রহণ করিয়া শপথ পূর্ব্বক কার্য্য চালাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন দুঃখের বিষয় তিনি তাহা করিতে পারিতেছেন না, একে আমার স্বামী এই পরিবর্ত্তনের সুখময় ফল দেখিতে পাইতেছেন না— তাহাতে আবার তাহার মন্ত্রী তাহাকে আরও কুপরামর্শ প্রদান করিতেছেন, সুতরাং মহামতির কার্য্য তাঁহাদের নিকট অবৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, আমার স্বামী ক্লেশের উদ্ধার করিতে চাহেন না—তাঁহাকে আরও পীড়ন করিতে চাহেন। বিষম বাসনায় উন্মত্ত হইয়া চিরকাল অত্যাচার করিয়া তাঁহার পুরবস্থ নষ্ট হইয়াছে তাই তিনি আজি ইহার অমৃতময় ফল দেখিতে পারিতেছেন না, আমি দেখাইতে চেষ্টা করিলেও তিনি দেখিবেন না, আমার কথা শুনিবেন না। পীড়িত ব্যক্তিকে পীড়ন করাই তাঁহার স্বভাব, সুতরাং আমার কথা শুনিবেন কেন? যাহার জন্য তিনি এই ধনে ধনী হইয়াছেন—যাহার জন্য তিনি ভূস্বামী আখ্যা পাইয়াছেন, এক্ষণে ক্রূরকর্ম্মা হইয়া—কুমন্ত্রীর সহিত বাস করিয়া তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? তাই ভাল কথাও এক্ষণে তাঁহার নিকট কষায় বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার স্বামীর পরিণাম দর্শন নাই, তাই এত আর্ত্তনাদ—আবেদন, আমি ভাল কথা বলিতে গিয়া তাঁহার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, হায়!! যে আমি তাঁহাকে এত সুফল দিয়াছি ও দিতেছি সেই আমি কখন তাঁহার অপকার করিতে পারি না:—যিনি পরোপকারার্থই সৃজিত হইয়াছেন—যিনি তাহাতে আজীবন অনুপ্রাণিত, তাহা হইতে কখনই অপকার সম্ভবে না, ইহা

তিনিবুঝিতে পারিতেছেন না, এইটিই আমার দুঃখ। যাহা হউক আমার পিতৃস্থানীয় মহাত্মা রিপণ আমার মলিন ভাব অপনোদন করিতে সচেষ্টিত হইয়াছেন; ঈশ্বর তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করুন; আমাকে আর কখন কাঁদিতে হইবে না।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন "আর এই যে মসীবৎ কলঙ্ক রেখা দেখিতেছেন, ইহা প্রকৃতই মসী বিন্দু, কিন্তু মসী রেখা জলে বিধৌত হয়, ইহা কখন যাইবার নহে, আমার পিতা আমাকে যখন জন্মদান করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "তুমি চিরকাল অটুট থাকিবে—যখন তোমার রূপ বিনষ্ট হইবে না; তুমি অমৃতের ভাণ্ডার হইবে, কখনই তোমার অমৃত বিস্বাদ হইবে না, যত দান করিবে ততই ইহার মধুরতা বৰ্দ্ধিত হইবে' কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে; সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে; এতদিনে অবিচলিত রূপে পথকর স্থাপিত হইয়াছে; হইয়া আমার পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং আমার কপালে গাঢ় মসী, কিন্তু পথকর যাইবার নয়; আমার কলঙ্ক ও রেখা যাইবার নয়, প্রত্যুত দৈনন্দিন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমায় অনুদিন বিকৃত করিবে, হায়! এতদিনে আমার মান সম্ভ্রম সকলই লোপ পাইতে চলিল, আমার পিতৃ গৌরব নষ্ট হইল, হায়! কেন আমি জন্মিলাম!!!" এই বলিয়া রমণী রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলাম, আমারও চক্ষু দিয়া অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহাকে আর অধিক ব্যথিত করিতে আমার ইচ্ছা হইল না, আমি সেই বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইলাম, তিনি কে? তাঁহার দুঃখের কারণ কি, জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিলে তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসিলাম, তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন বলিলেন "বৎস! আমাকে তোমরা অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছ, না হইলে আর চিনিতেও পারিতেছ না কেন? পূর্ব্বে তোমরা আমাকে যে ভাবে দেখিতে এখন আর তাহা দেখ না, তখন যে ভাবে ডাকিতে এখন আর সে ভাবে ডাকনা, এখন আমাকে দেখিয়াও দেখনা, সুতরাং চিনিবে কেন? আমি তোমাদের একদা পূজ্য, অধুনা শ্রীহীনা জননী,—আমাকে"—এই বলিয়া কি বলিতে

যাইতেছিলেন এমন সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কোথায় সেই প্রান্তর, কোথায় সেই রমণী-দ্বয় ? কেহই নাই। আমি সেই সজ্জিত শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছি, তখন রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে ; প্রাতঃ সমীরণ গবাক্ষ দিয়া আসিয়া আমার মন প্রাণ শীতল করিতেছিল ; আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

কেন মিছে ভালবাসি ?

১

তরুণ অরুণ শোভা বিশ্বজন মনোলোভা
শ্যামল পাদপ পরে কিবা শোভা পায়,
শ্যামল নদীর জলে রবি কিবা কুতূহলে,
ধীরে ধীরে নেচে নেচে ধীরে ভেসে যায়।
আমি তো অবোধ মত দেখি তাই অবিরত
কিন্তু কি দেখার আশা কভু মিটে মনে ?
অমনি অরুণ আভা দ্বিগুণ ছড়ায়ে প্রভা
নাশি সেই শোভা হৃদি কাঁপায় নয়নে।

২

ভুলি যদি সে শোভায় অমনি তখন
তপন মধুর হাসি উজলিয়া দশ দিশি
অস্তাচল চূড়ে ধীরে করেন গমন,
বিহঙ্গ কাকলি করি নাচে ধীরে শাখাপরি
ফুটে ধীরে তরুশীরে প্রসূন রতন,

মেঘে চারু শশী আভা হাসি দেখা দেয় বিভা
অমনি মোহিত হয় সে রূপে নয়ন,
কিন্তু সেও চলে যায় প্রকৃতি পুরুষে ধায়
আমি সুধু কেঁদে মরি পাগল মতন।

৩

মিছে প্রেম মিছে আশা মিছে আশা ভালবাসা
সবই শূন্য ধরা মাঝে স্বপন মতন :
এই আশা এই নাই ধন্য আশা বলি তাই
তবু আমি ভালবাসি সেই দরশন !

৪

আসে নিশি আসে দিন গ্রহ তারা দিন দিন
আসে যায় পুনঃ ফিরে নিয়ম যেমন
সংসারেতে দেখি তাই তেমন নিয়ম নাই
তবু ছাই একি দায় মজে তায় মন।

৫

প্রণয়ে বিরহ আসে, নিরাশা প্রণয় আশে
বন্ধু রে বিষাদ যুট কপালে লিখন,
এই প্রেম এই ছায়া এই সব এই কায়া
দূর ছাই প্রণয়ের অলিক স্বপন।
বুঝেনা প্রেমিক জন কভু প্রণয়ীর মন
আপন মনের স্রোতে ভাসায় জীবন,
হৃদয়েতে আশা যাগে মনমত অনুরাগে
বুঝে কি সহসা কেহ পরের মনন ?
অমনি দূরেতে যায় প্রেম সুখ আশা ধায়
কেন প্রেম কেন তবে আশার ছলন ?

৬

তাই বলি প্রকৃতি লো বুঝেছি মনেতে,
চঞ্চল হৃদয় তব চঞ্চল এ সব ভব
কেন না চঞ্চল মন হবে জীবনেতে।
সকলি চঞ্চল যদি আমি কেন নিরবধি
করি মনে অচঞ্চল জগত করিতে।

৭

মনে ভাবিলাম যাহা ভাল বাসি কেন তাহা—
অমানিশা কাশে শশী হইবে উদিত,
হৃদয়েতে অনুক্ষণ জাগিবেরে সেই ধন
মোহিবে মানস প্রাণ পুলকিবে চিত।

৮

কিন্তু বলি ধিক্ সব ধিক জন্ম ধিক্ ভব
ধিক্ ধিক্ বলি আমি জীবন আমার,
সকলি ঘুচিয়া যায় সকলি ফিরিয়া ধায়
কেন না বলিব তবে জীবন অসার ?

৯

আসে যায় ফিরে চায় জানি মিছে আশা ধায়,
তবু কেন মিছে আশে হইরে উল্লাসি,
মিছে কেন ভেবে মরি চঞ্চল প্রণয় স্মরি,
স্বপনে সঁপিয়া প্রাণ কেন ভালবাসি ?

———

কমলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

———oo———

সিদ্ধান্ত।

সুদিন, দুর্দ্দিন কখন কাহার জন্য চিরকাল তরে আইসে না, সুতরাং কমলার সে ভয়ঙ্কর দিনও একদিন সুদিন করিয়া অতীত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রামে ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে, সকলে রামধনকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছে। রামধন বুঝিলেন কমলা গর্ভবতী নহে, শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলার গর্ভ হয় নাই, কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না।

ঈশ্বরেচ্ছায় কমলার ব্যাধি কমিতে লাগিল, গর্ভলক্ষণের ন্যায় যে সকল বাহ্যিক চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা তিরোধান হইল। রামধন সকলকে বলিলেন "দেখ কমলার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে" লোকে উপহাস করিয়া কহিল "হারাণী বৈদ্য থাকিতে পীড়া আরগ্যের ভাবনা কি?" রামধনের মস্তক হেঁট হইল, সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া কত বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, কেহবা বলিল "এই সময় পুলিসে সংবাদ দাও" ইত্যাদি।

রামধনকে কেহ আর হুঁকা দেয় না, কেহ নিমন্ত্রণ করে না। রামধন প্রতিবৎসর মহামায়ার পূজা করিতেন, এ বৎসর সমস্ত আয়োজন হইল। কিন্তু পুরহিত পূজা করিল না, ক্রমে নাপিত ধোপা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল, রামধন অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যাম-মোহিনীকে মনের কথা বলিলেন, শ্যামমোহিনী কমলার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে রামধন কমলাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা কমলা, তোমার জন্য আমার মুখ দেখান ভার, সমাজ চক্রে পড়ে আমায় এক ঘরে হ'তে হচ্চে, আর সহ্য হয় না। মা তুমি অন্য কোথাও বাস করোগে, আমি মাসে মাসে তোমার ভরণপোষণের জন্য সমস্ত খরচ পত্র দিব।"

তখন কমলার সেই কমল বদন শুকাইল। কমলা রামধনের চরণপ্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। বলিল "বাবা তোমার পায় ধরে বল্‌ছি আমায় ত্যাগ করোনা, এ সংসারে আমার আর কেউ নাই, আমার দাঁড়াবার স্থান নাই, আমায় নিরাপরাধে এরূপ ঘোরতর শাস্তি দিও না। কোথায় কোন বিপদে পতিত হ'লে তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাব, সহায়তা পাব, না নিরাপদে তুমি পিতা হয়ে আমায় ত্যাগ করিতে উদ্যত! বাবা আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা দিচ্চ।"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুজলে হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রামধন। কি করব মা, লোকগঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না।

কমলা। বাবা তোমার যদি এই বিচার হয় তবে আমি কোথায় যাব। আমার যে কোথায় যাবার স্থান নাই তা কি তুমি জাননা?

রামধন। সে জন্য তোমাকে চিন্তা কর্‌তে হবেনা, আমি তার উপায় করে দেব।

কমলা। আমি যে তোমাদের না দেখে এক দণ্ড থাক্‌তে পারি না, আমি তা হ'লে কি করে বাঁচ্‌ব বাবা?

রামধন। দিন কতক কষ্ট করতে হবে মা।

তখন অনাথিনী কমলা মনে মনে বলিল "জগদীশ্বর! তুমি না দয়াময়, অবলা অসহায়া বালিকার প্রতি তোমার এত অত্যাচার? প্যারীকে মনে মনে পবিত্ররূপে ভালবাসিতাম তাহার কি এই প্রতিফল।" কমলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, জ্ঞান অপনোদন হইল। শ্যামমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই মর্ম্মভেদি চীৎকার শুনিয়া গ্রামস্থ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলার প্রিয়সখি হরিদাসীও আসিল, হরিদাসী কমলার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া সরোদনে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——oo——

রমণীর প্রাণ।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর কমলার চৈতন্য হইল। কমলা চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিল হরিদাসীর ক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে। কমলা অনেক ক্ষণ হরিদাসীর মুখ প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, কমলাও কাঁদিল।

হরিদাসী কমলার চক্ষু মুছাইয়া কহিল "কাঁদ কেন সই?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। কমলার বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র ক্রন্দনই তাহার মনের ভাব সম্যক প্রকারে প্রকাশ করিল। সেই দীন নয়নের সকরুণ ক্রন্দনে কমলা যে ভাব প্রকাশ করিল, সে ভাব সহস্র বাক্যেও প্রকাশ পায়না।

হরিদাসী বলিল "ভয় কি সই, তুমি আমার বাটীতে থাকিবে চল।"

কমলা অনিমেষ নয়নে হরিদাসীর বদন প্রতি চাহিল, কোন কথা কহিল না।

রামধন ও শ্যামমোহিনী হরিদাসীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন কমলা আপাততঃ হরিদাসীর বাটীতে থাকুক, পরে এ হলস্থূল কিছু কমিলে আবার বাটিতে আনিব।। এই পরামর্শই স্থির হইল, কমলা হরিদাসীর গৃহে গেল। কমলা সহসা সৌভাগ্যের ক্ষণিক বিকাশে যে সুখী হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের ভ্রুকুটী সহজ নহে, বঙ্গের মূঢ় সমাজের কঠোর চক্ষে বালিকার করুণ উচ্ছ্বাসে জল আইসে না। বিধবার আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ করেনা। সুতরাং উহার হৃদয় গলিল না। গ্রামস্থ লোকের চক্ষু টাটাইল, তাহারা অনাথিনী কমলার সুখে মর্ম্মভেদী দুঃখ পাইল। ক্রমে কুচক্রের বিভিষিকাময় পাশ সৃষ্ট হইল। তাহারা হরিদাসীর মাতাকে বলিল "হয় তোমারা কমলাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, নতুবা আমরা তোমায় একঘরে করিব। হরিদাসীর

মাতা বিষম বিপদগ্রস্থ হইলেন, ভাবিলেন "যাহাকে তাহার পিতা মাতা স্বগৃহে রাখিতে পারিল না, তাহাকে আমি রাখি কেন।"

হরিদাসীকে বলিলেন "কমলাকে আপন পথ দেখিতে বল, আমরা তাহাকে গৃহে রাখিয়া দোষের ভাগী হই কেন?"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মত হইল না, অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, বলিল "সইকে আমি ফেলিতে পারিব না, যদ্যপি সইকে গৃহে না রাখ তাহা হইলে আমিও গৃহে থাকিব না, সইএর যে দশা আমারও সেই দশা হইবে।"

কমলা এই কথা শুনিয়া হরিদাসীকে বলিল "ভাই আমার জন্য কেন তুমি লোক গঞ্জনা সহ্য কর। ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ, মনুষ্য তাহার কি করিতে পারে?"

হরিদাসী তাহা শুনিল না, কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কমলাও কাঁদিল। দুজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, একটী কোমল হৃদয়ের আঘাত আর একটীতে প্রতিঘাত হইল, একটী তরঙ্গ আর একটীতে সজোরে আসিয়া মিলিত হইল, দুইটীই উছলিল।

আমরা বলি হরিদাসি তোমার হৃদয়েই বন্ধুত্বের বিমল জ্যোতিঃ ছিল, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার সৌহার্দ্দ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—oo—

আশার শেষ।

হরিদাসী কমলাকে স্বগৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, গ্রামস্থ লোকে তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, সুতরাং মাতৃগঞ্জনায় হরিদাসীর সংকল্প পূর্ণ হইল না। আমাদের দুঃখিনী কমলা বাতাহত তরণীর ন্যায় অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছিল, অনুকূল স্রোতে কিয়ৎক্ষণ জন্য কূল পাইয়াছিল, আবার প্রতিকূল স্রোতে তরি

ভাসিল, সে আশ্রয় শূন্য হইল। একমাত্র আশ্রয় স্থান হরিদাসীর বাটী, তাহাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল,—আশা গগনে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটী ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহাও ডুবিল।

যাহাই হউক হরিদাসী কমলাকে যদিও আপন গৃহ হইতে অনন্যোপায় হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, তথাপি একবারে ত্যাগ করিল না, হরিদাসীর পিতার দূরসম্পর্কীয়া জনৈক বৃদ্ধা গ্রামের প্রান্ত সীমায় একটী সামান্য বাটীতে বাস করিতেন। হরিদাসী কমলাকে সেই বৃদ্ধার আশ্রয়ে রাখিতে স্থির করিল। কমলা অগত্যা তথায় বাস করিতে গেল, হরিদাসীর একটী বিশ্বাসী বৃদ্ধা পরিচারিকা কমলার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল, হরিদাসী সর্ব্বদা কমলার নিকট যাইত, কত প্রকার সুমধুর বাক্যে আশা দিত। কত প্রকারে সান্ত্বনা করিত।

কমলার নিরাশ হৃদয়ে আবার একটু আশার উদ্রেক হইল। গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে কমলার ইচ্ছা ছিল না, যেখানে আজন্ম কাল বাস করিতেছে সে স্থানের মায়া পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে। গ্রামস্থ অনেক স্ত্রীলোক তথায় যাইয়া কমলাকে সান্ত্বনা করে। কমলা তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন কত সুখানুভব করে। তাহাদেরই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃকই যে অবলা সরলা নিরপরাধিনী কমলার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা সে তখন বিস্মৃত হয়। এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও গ্রামে বাস করিতে পাইল, পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে পরিচিতা রমণীগণকে দেখিতে পাইবে, তাই এখন কমলার আনন্দ ও আশা কিন্তু যখন সমাজের কুচক্র মনে হয়, যখন তাহাদের অত্যাচার তাহার মনে পড়ে তখন আবার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বিদেশে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহবাসে কি করিয়া বাস করিতে হয়, তাহা সে জানিত না, কখন যে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে তাহা ত স্বপ্নেও ভাবে নাই। স্বদেশের, স্বগ্রামের লোক, যাহাদের সহিত শৈশবাবধি কত সহানুভূতি তাহারাই যখন এত অত্যাচার করিতে উদ্যত, তখন বিদেশে অপরিচিত লোক যে কত অত্যাচারই করিবে, তাহা স্মরণ করিয়াও কমলার প্রাণ চমকিয়া উঠে।

কমলা যখনই একাকিনী থাকিত, তখনই আকুল নয়নে কাঁদিত। পাপীর জন্য হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, যে পাপীকে অবিরত দেখিয়াও হৃদয়

পরিতৃপ্ত হইত না, আজি আর সে প্যারীর সাক্ষাৎ নাই, আর কখন সাক্ষাৎ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কমলা এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াও যখন প্যারীর বদন মাধুরী হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিত, তখন সে এই ক্রুর জড়জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, সমাজের নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া যাইত। তখন তাহার হৃদয়ের দারুণ বেগ প্রশমিত হইয়া শান্তি ও সন্তোষের আলয় হইত।

কমলা প্যারীকে এক প্রাণে ভালবাসিত, সে ভালবাসার বিমল জ্যোতিঃ কমলার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, এবং যতই প্যারীর প্রণয়মূর্ত্তি হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল, ততই প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

কমলা এত ভালবাসিয়াও প্যারীকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, মনে মনে ভালবাসিত, প্রাণে প্রাণে পূজা করিত, একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত, তথাপি প্যারীকে আপন সতীত্ব সমর্পণ করিতে পারিল না, ধর্ম্ম ভয়ের প্রবল স্রোতে ভালবাসা ভাসিয়া গেল ভারত! তুমি এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ, তোমার জীবনের সমস্ত সুখের কথা সুখের দিন বিস্মৃত হইয়াছ। এ দুঃখের দিনে, এ জীবন্ত অবসাদের দিনে, তোমার আর শ্লাঘা বা দম্ভ করিবার কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বর দয়া করিয়া একটীমাত্র রত্ন রাখিয়াছেন, তাহা ভারতীয় রমণীগণের সতীত্ব। ভারত! হতভাগ্য ভারত! তোমার কাপুরুষ সন্তানগণ তোমার শুভ্রবদনে কালিমা অর্পণ করিয়াছে কিন্তু তোমার কন্যাগণ এখনও তোমার উজ্জ্বল মুখে কালিমা প্রদান করে নাই। এখনও তাহাদের সতীত্ব রত্ন তোমায় দেশপূজ্য করিতেছে। রমণীগণ! ধন্য তোমাদের অধ্যবসায়, ধন্য তোমাদের যত্ন, ধন্য তোমাদের ধর্ম্মভয়! তোমরাই বাঙ্গালির দুঃখপূর্ণ সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী।

পাঁচুর পাগ্‌লামী।

বা

সংসার তত্ত্ব।

—— ০ ——

পঞ্চানন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহারা চারি ভ্রাতা—পঞ্চানন সর্ব্ব কনিষ্ঠ, পাঁচবৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, একে চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, তায় মা-মরা ছেলে, এজন্য পাঁচুর পিতা ও অপরাপর ভ্রাতারা পাঁচুকে বড় আদর করিতেন। আজি কালিকার আদরে ছেলেরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের আদর পাইয়া যেমন বখাটে হইয়া লেখা পড়ার পথে কণ্টক আরোপ করে, পাঁচু সে রকম ছিলেন না। পাঁচুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কোন গবর্ণমেণ্ট আপিসে ২০০ শত টাকা বেতনে কেরানীগিরি করিতেন, মধ্যমটী আসিষ্টাণ্ট সার্জন, তৃতীয়টী এঞ্জিনিয়ারি কলেজের পাশ পাইয়া ওভারশিয়ারী করিতেন, আর পাঁচু হিন্দুস্কুলে পড়িতেন। তিনি উপর্য্যুপরি তিনবারে গণিতে অপারগতায় এণ্টেন্স পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার জন্য ডভেটন কলেজের এক্স ষ্টুডেণ্ট হইয়া পাঁচবৎসর তথায় ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। পাঁচু স্কুলে যাইতেন, লেখা পড়া করিতেন, বড় একটা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন না। আমোদ প্রমোদে তাঁহার বড় প্রবৃত্তি ছিল না। পাঁচু চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন, এজন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে সচিন্তিত দেখা যাইত। ডভেটন কালেজ ছাড়িয়া পাঁচু কিছুদিন বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করেন, ইহাতে পাঁচুর আরও চিন্তার প্রাবল্য হইল। এই দেখিয়া তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহাকে বিবাহ করিতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, তিনি তাহাতে মত দিলেন না। এইরূপে পাঁচুর সম্মুখ দিয়া পঁচিশ বৎসর চলিয়া গেল। পাঁচু আপন মনে কি চিন্তা করেন কেহই জানিত না। তিনি আপন পাঠনালয়ে বসিয়া চিন্তা করিতেন। বাল্যাবধি

তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না, এইটী আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার বন্ধু বান্ধব বলিতেন তাঁহার কেবলমাত্র প্রিয় পাঠ্য আইজাক নিউটন, ডারউইন সার ষ্টুয়ার্ট মিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিই ছিল। তাঁহার খাওয়া পরার অভাব ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহারও অভাব ছিল না। সংসারে অর্থ থাকিলে কিছুরই অভাব থাকে না, পাঁচুর তাহাতে কোন ক্রটী ছিল না; তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাহাকে একটী পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী লইয়া সাধাসাধি করিলেন তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। সে চাকরী স্বীকার করিলে তিনি ভবিষ্যতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পর্য্যন্ত পাইতে পারিতেন। পাঁচুর সংসারে পিতা, তিন সহোদর, সহোদরগণের পুত্র কন্যা। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, অভাবের মধ্যে সংসারে পাঁচুর মা ছিলেন না। সেই জন্যই কি পাঁচু এত চিন্তা পরায়ণ, তাই বা কেমন করিয়া বলিব? পাঁচবৎসর বয়সের সময় যখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয় তখন তাহার সেই মাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছিল। মাতৃস্নেহ কেমন সামগ্রী তাহা তিনি ভাল করিয়া জানিতেও পারিয়া ছিলেন না। বোধ হয় এতদিনে তাহার জননীর স্মৃতি তাহার মনসপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আর যদি তাহাই থাকে তাহা হইলে এ সংসারে কয়জনের এতাধিক চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে। আমরা তাহাও শুনিয়াছি যে মাতৃবিয়োগ বিধুরতা জন্য যে তাঁহার চিত্তের এরূপ বিকৃত গতি হইয়াছিল তাহাও নহে। এ সংসারের প্রয়োজন সাধনীয় তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য যাহাতে সুখী হইতে পারে পাঁচুর সে সব ছিল, কিন্তু তথাপি কে জানে কি যেন তার ছিল না, যেন কি একটা তাহার অভাব ছিল, পৃথিবীর কোন জিনিষেই যেন তাহা পূরণ হইবার নহে,— অথবা সে জিনিষ এই পৃথিবীতে, এই অনিত্য, ভঙ্গুর পঞ্চভূতময়ী পৃথিবীতে নাই——থাকিলেও তাহা যেন মিলিবার নহে—। মিলিলেও কিরূপে মিলিবে তাহা তিনি জানিতেন না—এই জন্যই এত চিন্তা। এই রঙ্গময়ী এই মরণ ধর্ম্ম-শীল মানবের লীলাস্থলী পৃথিবীতে নির্ধনের ধনের অভাব, অপুত্রকের পুত্রের অভাব, রোগীর স্বাস্থ্যের অভাব, জরার যৌবনাভাব, সকলেরই এক একটী অভাব আছে, সকলেই আপন মনে আপনাপন অভা-

জানিয়া সেই সেই অভাব পরিপূরণের জন্য পাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঁচু আপনি মনের অভাব জানিতে পারেন নাই। এই তাহার মনঃদুঃখ! এই তাহার চিন্তার প্রধান কারণ। পৃথিবীর লোক সকলেই সংসার কার্য্যে ব্যস্ত, সংসারিক সুখলাভ লালসায় সকলেই অন্ধ। তাহাদিগের মনে এরূপ অভাব নাই—এরূপ চিন্তা নাই, কাজেই তাহারা সুখী কিন্তু পাঁচু মনে করিতেন "পৃথিবী দুঃখের বিহার ভূমি, দুঃখ রাশির মধ্যে থাকিয়া দুঃখের অগাধ জলে ডুবিয়া, দুঃখের ফাঁসি গলায় পরিয়াও মানব যেন পরমাহ্লাদিত এ সংসারের সার কি, এই জগৎ সংসারের উদ্দেশ্য কি, মানব জন্মটা কিজন্য ইত্যাদি এবং এই জগতের অনশ্বরত্ব, এই ভৌতিকক্ষণ ভঙ্গুর দেহের অন্তঃসার হীন গৌরব, মানুষের যাহা আপনার নহে তাহার জন্য এত টানাটানি এত অহঙ্কার, এত অভিমান কেন—আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী আমার ঘর আমার বাড়ী, সকল দ্রব্যে, সকল কাজে, সকল কর্ম্মে "আমার" এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কথা কেন। মানব, এত অশিসুখের বল, দুঃখের বল শোভার অনন্ত ভাণ্ডার, অথবা কদর্য্যতার রাশি যাহাই বল এত সংসারে তুমি কে, তোমার কি? খাইতে শুইতে পাঁচুর অন্য চিন্তা ছিল না। জনসন সাহেবের রাসেলাস রাজার পুত্র ছিলেন, তাহার এরূপ চিন্তা শোভা পাইত তিনি কৃত্রিম পক্ষ রচনা করিয়া আকাশ পথে পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের আজি কালিকার কয়েকটী ধন বানের কৃতিমান পুত্র বিনা পক্ষে আকাশ পথে উড়িতে গিয়া উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছেন। এখনও কেহ কেহ সময় পাইলে উড়িবার চেষ্টা করিতে ছাড়েন না। সেকথা দূরে যাউক, বড়মানুষ, রাজা রাজড়ার ঘরে ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দিউন, তাহারা অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তাহাদিগের সহিত গৃহস্থ ঘরের ছেলে পাঁচুর তুলনা করা যাইতে পারে না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া যায়। পাঁচু নগরে থাকিয়া সাধারণ লোক চরিত্র দেখিতে পান না, সাধারণের সহিত মিলিতে পারেন না, মনুষ্য সমাজে গতিবিধি না করিলে মনুষ্য চরিত্র ভাল করিয়া অভ্যাস না করিলে সংসারের আভ্যন্তরিণ ব্যপারের মধ্যে কিরূপে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইবেন?—এজন্য কিছু দিন তাহার সংসার তত্ত্বের অনুধাবন করা আবশ্যক হইল। এজন্য

প্রথমতঃ তিনি অবকাশ কালে নগরের নিকটবর্ত্তী পল্লীর কৃষক সমাজে বেড়াইতে যাইতেন, তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পাঁচুর যে উদ্দেশ্য তাহা কিন্তু সফল হইলনা, মনুষ্য চরিত্র জানিতে হইলে, সংসার চিনিতে হইলে সমাজের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, আপনাকে সমাজের একজন মনে করিয়া তুলিতে হয়, সংক্ষেপতঃ একজন ভুক্তভোগী হইতে হয় নচেৎ কিছুই হইবার নহে। পাঁচুর মনে যাহা হইবে, তাহা করিতেই হইবে, তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে হইবে, কিসে কি আছে তাহা বুঝিতে হইবে।

আষাঢ় মাস কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, সূর্য্যদেব সকাল হইতে চৌদ্দ ঘণ্টা আকাশে, বেলা আর ফুরায় না, দারুণ গ্রীষ্ম, সহরে তিষ্ঠানো ভার। পাঁচু সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে বেড়াইতে বাহির হইলেন। পল্লীগ্রামে ধান্যের ক্ষেত্র, প্রান্তরে কৃষকদিগের কোলাহল এবং কার্য্য ব্যস্ততা দেখিতে দেখিতে পাঁচু এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া সহর ছাড়িয়া দুই তিন ক্রোশ চলিয়া গেলেন সন্ধ্যা হইল, এক কৃষকের বাটীতে রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকাল হইতে আষাঢ় মাসের আকাশ ঘন ঘনাচ্ছন্ন, মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, কৃষকের শত ছিদ্র সামান্য কুটীর বৃষ্টির জলে ভাসিয়া গেল দাঁড়াইবার স্থান নাই। কৃষক আপন পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত ভদ্রলোকের সন্তান পাঁচুকে দেখিয়া কৃষক আরও কুণ্ঠিত, আপনাদের কষ্ট-অপেক্ষা পাঁচুর কষ্ট কৃষকের অধিকতর মর্ম্ম ভেদ করিল। পাঁচু সেই আষাঢ়ের অভদ্রা করিয়ায় কৃষকের বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কৃষক পাঁচুকে আশ্রয় দিতে নাপারিয়া মর্ম্মাহত হইল, মনের দুঃখ "ভগবান" এই শব্দটা মাত্র বলিল পাঁচুকে কিছু বলিতে সাহসী হইল না। পাঁচু কৃষকের দুঃখ বুঝিলেন কৃষককে বলিলেন দুঃখিত হইওনা প্রত্যাগমন কালে তোমার এখানে হইয়া যাইব। পাঁচু কৃষকের নিকট বিদায় লইয়া আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে চলিলেন কোথায় যাইতেছেন, কার কাছে যাইতেছেন; কি জন্য যাইতেছেন, তিনি ভিন্ন সে কথা কেহ বলিতে পারে না। বেলা দুই প্রহর হইল, আকাশ একটু বিশ্রাম লইলে, আকাশের

কোল হইতে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ সরিয়া গেল। প্রকৃতি হাসিল, নীল আকাশে সোনার সূর্য্য উদয় হইল, পাখীসকল কুলায় ছাড়িয়া আকাশে উঠিল; গাছ পালা যেন একটু শান্তি পাইল, বাতাস ধীরে বহিতে লাগিল। মাঠ জলে থৈ থৈ করিতে লাগিল। তাহার ধারে ধারে বক পংক্তি বসিয়া গেল। ভেক ডাকিতে লাগিল—গৃহস্থের বালক বালিকারা ঘরের বাহির হইল, কৃষকেরা কোদাল কাঁধে মাঠে চলিল। পাঁচু একখানি গ্রামে প্রবেশ করিলেন, গ্রামে প্রবেশ করিয়াই তিনি বুঝিলেন গ্রামটী ভদ্রলোকের নিবাস ভূমি, জিজ্ঞাসায় জানিলেন গ্রামে একটী স্কুল, একটী পোষ্টাপিশ একটি ডাক্তারখানা এবং বাজার আছে। পথ ঘাটও মন্দ নয়; সাধারণের সুখগম বটে। কোথাও কোথাও দুই একটী ঝাউ গাছ আছে, বেলা প্রায় ১টা—পল্লী গ্রামের স্কুল রবিবার ও বারমাসে তের পার্ব্বণ ছাড়া সেক্রেটরীর পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, ঝড়বৃষ্টির দিনে বিশ্রামলাভ করিয়া থাকে, পণ্ডিত মহাশয় আজি স্কুলে গিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রগণের অনুপস্থিতি নিবন্ধন সকাল সকাল স্কুল বন্ধ করিয়া বাসায় যাইতেছিলেন পাঁচুর সহিত পথে দেখা হইল। আজন্ম যাহার দিবা দশটার অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত আজি সেই পাঁচু বেলা একটা পর্য্যন্ত মুখে জল দেন নাই, ক্ষীণ স্বরে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, এখানে কোন ভদ্রলোকের বাটিতে দুটি প্রস্তুত অন্ন পাইতে পারি?" পণ্ডিত মহাশয় পাঁচুর আকার ইঙ্গিতে ভদ্রলোক বলিয়া চিনিতে পারিলেন, যত্ন করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। বাসা একটি ব্রাহ্মণের বাটিতে, পাঁচু পৌঁছিবামাত্র প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন পাইয়া আহার করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যে বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন সেটি ব্রাহ্মণের বাড়ী তাহা উপরেই বলা হইয়াছে। তিনি জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু বাটির কর্ত্তা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পণ্ডিত মহাশয়কে যে আপন পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, পাঁচু তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারেই তাহা টের পাইলেন। বাটিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ভিন্ন পাঁচু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আহারাদির পর তিনি আপনার উদ্দেশ্য বিষয়িনী নানা চিন্তায় মগ্ন, পণ্ডিত মহাশয় পাঁচুর সহিত অনেক প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, পাঁচু

পাঁচটার পর একটার উত্তর দিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয় পাঁচুকে বেশ ঠাহরাইতে পারিলেন না। তিনি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়কে যে বড় চিন্তিত দেখছি?" তিনবারের পর পাঁচু উত্তর দিলেন "আজ্ঞা না, এমন কিছু চিন্তা করি নাই।" তাহার পর দুই চারি-কথা হয়, পাঁচু একটার ববাব দেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইলে তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আহার করিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাহিব বাটিতে শয়ন করিলেন। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনাহারে পাঁচুর দেহ একবারে অবসন্ন হইয়াছিল, শয়নমাত্র পৃথিবীর নিদ্রা আসিয়া তাঁহাব চক্ষে জুটিল, তিনি অঘোরে ঘুমাইলেন। রাত্রি শেষ—আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ঘুচে নাই—মানুষের সাড়া শব্দ নাই—পাখী ডাকে নাই—কেবল বায়ুর মৃদুবহনে শরীরে একটু শীতানুভব হইতেছিল। শেষ রাত্রির বায়ু-বহনি—তাহাতেই যতদূর বুঝা যাইতেছিল যে রাত্রি শেষ হইয়াছে, নতুবা উষার আব কোন চিহ্ন দেখা গিয়াছিল না। এমন সময় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আপন বৃদ্ধা পত্নীসহ পাঁচু বৈটকখানায় যে মশারির ভিতব শয়ন করিয়াছিল, সেই মশারি তুলিয়া দেখে পাঁচু একা নিদ্রা যাইতেছে—পণ্ডিত নাই; ব্রাহ্মণেব মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; ঘরে অষ্টাদশবর্ষ বর্ষিয়া বিধবা কন্যা শশীমুখী নাই, আর বৈটকখানায় পণ্ডিত নাই? বাটীতে পণ্ডিত তাহার পুত্রের ন্যায় থাকিতেন: ব্রাহ্মণের শশীমুখী ভিন্ন অন্য অপত্য ছিল না। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন শশীমুখী পণ্ডিতের সহিত পলায়ন করিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন পাঁচুকে জাগ্রত না করিয়া আপন বাটির মধ্যে গিয়া দেখে শশীমুখীর হাতে যে টাকা কড়ি অলঙ্কারাদি ছিল তাহার কিছুই নাই। ব্রহ্মোত্তর জমীর যে দলিল পত্র ছিল তাহাও নাই। ব্রাহ্মণ ঘোর বিপদে পড়িল; গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোককে সেই ভোরের সময়ই গিয়া জানাইল। সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত হইল। শশীমুখী ও পণ্ডিতের অনুসন্ধান জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল, সকলেই পাঁচুকে পণ্ডিতের সাহায্যকারী স্থির করিল। যিনি স্কুলের সেক্রেটরী তিনিই সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—গ্রাম তাঁহারই আজ্ঞায় পরিচালিত। তিনি যাহা বলেন, সকলেই তাহা বেদবাক্য জ্ঞান করে।

সেক্রেটরীবাবু প্রতিবাসী চারি পাঁচ জন। ভদ্রলোকসহ ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পাঁচু জাগ্রত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের অন্বেষণ করিতেছেন। সেক্রেটরীবাবু বৈটকখানায় বসিলেন, বাবুর সমভিব্যবহারীরা সকলেই তাঁহার প্রিয়ভাষী অনুচর, পরস্পরে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "বাবুর কি অনুসন্ধিৎসুতা, কি তীক্ষ্ণ বিবেচনা যেন ঐশী শক্তি,—কথা পড়িলেই বুঝিতে পারেন। সেক্রেটরী বাবু তামাকুর ধূমে চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করিয়া গম্ভীরভাবে পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ঠাকুর, তোমাকে ব্রাহ্মণের ছেলে দেখিতেছি, এ দুর্বুদ্ধি কেন হইল, যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন ব্রাহ্মণের উপায় কি বল দেখি।" পাঁচু স্বভাবতই চিন্তাশীল, তিনি ত ব্রাহ্মণের কথা কিছুই পূর্ব্বে জানিতেন না, সেক্রেটরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণের কি হইয়াছে ?" সেক্রেটরী তখন একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন "আপনা হইতেই সমস্ত হইয়াছে আপনি কিছু জানেন না ?" পাঁচু তখন বলিলেন "যখন জানি না বলিতেছি তখন আপনাদের সে কথাটা বলায় দোষ কি ?". সেক্রেটরীর সমস্ত কথা শুনিয়া পাঁচু আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইলেন, একটুক্ষণ স্থির থাকিয়াই পাঁচুর মনে কেমন একটু কৌতূহল জন্মিল, পৃথিবী দেখিবার জন্যই তাঁহার পল্লীগ্রামে এত কষ্ট স্বীকার। তিনি সত্য কথা বলিয়া সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। বুদ্ধিমান সেক্রেটরী ও তাঁহার অনুচরগণ সেকথা শুনিল না। পরিশেষে একজন অনুচর পাঁচুকে গোপনে ডাকিয়া বলিল "মহাশয়কে দেখিতেছি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনি আপনার বিপদ কেন খুঁজিয়া আনেন, আমাদের বাবুর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলুন।" পাঁচু উত্তর করিল "কি বন্দোবস্ত ?" অনুচর বলিল, "বাবু বড় লোক উনি কি নিজে কিছু বলিবেন, আমাদের বারইয়ারী ও স্কুলের সাহায্য বলিয়া উনি কিছু কিছু লইয়া থাকেন, তাই কিছু দিয়ে কেন আপনি চলিয়া যাউন না" পাচু জিজ্ঞাসিলেন "কি আন্দাজ দিতে হইবে।" অনুচর কহিল "সেটা আমি জানিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া সেক্রেটরীর কাণে কাণে সে পরামর্শ করিয়া আসিয়া বলিল "পঁচিশটী টাকা চাই।" পাচু তখন মহাবিপদে পড়িলেন বলিলেন, "২৫ টাকা ত সঙ্গে নাই।"

তখন অনুচর কহিল "তবে আপনার মহা বিপদ, থানা পুলিশ সকলই বাবুর বশীভূত, এখনই আপনাকে পুলিশের হাতে দিলে দু একশর কমে পরিত্রাণ পাইবেন না।" পাঁচু বলিলেন "পুলিশ কি সত্যাসত্য দেখিবে না?" সেক্রেটরী মহাশয়ের অনুচর বলিল "তা কি তাহারা দেখিবে বাবু-তাহাদিগকে যা বলিবেন তাই করিবে।" পাঁচুর মনে দুঃখ হইল অনুচরকে বলিলেন "আমার সঙ্গে আড়াইটী মাত্র টাকা আছে, আমায় পথ খরচ দিয়া আপনারা সমস্ত লউন।" অনুচর গিয়া সেক্রেটরী বাবুকে বলিল সেক্রেটরী বাবুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাঁচুকে বৈটক খানায় লইয়া গিয়া তাঁহার বস্ত্র তল্লাস করিয়া কেবলমাত্র আড়াইটী টাকা পাইয়া তাহাই লইয়া তাঁহাকে বলিল "পালাও ঠাকুর একথা কাহাকেও বলিও না।" পাঁচু দোহাই দস্তুর পাড়িলেন একটি পয়সাও তিনি পথ খরচের জন্য পাইলেন না। পাঁচু বাড়ী ফিরিলেন, ব্রাহ্মণের যাহা হইবার হইল। পাঁচুর পাগ্লামী যে তিনি বিনা পরিচয়ে পল্লী গ্রামে একপে বেড়াইতে যান।

কিবা দেখিনু নয়নে।

:

১

আহা মরি কিবা রূপ দেখিনু নয়নে,
এলায়ে পড়েছে বেণী, দুই গণ্ডে দুই শ্রেণী,
অলকা চুম্বিছে অংশু নাচিয়া সঘনে।
সে চারু নয়ন তায়, হাসি হাসি শোভা পায়,
আহা ওই মনোহর কমল বদনে,
কি রূপ দেখিনু প্রিয়ে আজিকে নয়নে।

২

দেখেছি সরসে শোভা কুমুদিনী পরে,
নাচিয়া নাচিয়া কত, ভ্রমিতেছে অবিরত,
মধুকর মধু আশে পাগল অন্তরে—
সরসী সলিল ধ'রে, কৌমুদী সোহাগ করে,
লুকায় অন্তরে, পুন নাচে স্থির ভরে,
নাহি ধরে সেই শোভা এখন অন্তরে।

৩

দেখিয়াছি কাদম্বিনী রম কলেবরে
সোণার বিজলী ছটা, নয়নের ঘোরঘটা,
নাচিছে ময়ূরীকত—পুলক অন্তরে,
দেখেছি তরুর কোলে, সোণার মঞ্জরি দোলে
সোণার বরণ ভানু সোণামাখা করে,
সে শোভা না মানে আর হৃদয় ভিতরে।

৪

ইচ্ছা করে ওইরূপ হেরি নিরন্তর,
ওই আলুথালু বেশ ওই অবচিত কেশ
ওই হাসিভরা মুখ যিনি শশধর,
ওই নয়নের শোভা, চিরন্তন মনোলোভা,
ও চারু বয়ান শোভা চির মনোহর,
কিন্তু বিধি তব বড় কঠিন অন্তর।

৫

কঠিন অন্তর নয়? কি বলিব দ্রবে,
নয়নে পলক কেন, সাধিতেছে বাদ হেন?
বিচ্ছেদ বিরহ কেন বিরাজিছে ভবে?
প্রতিহিংসা প্রতিদান, স্বার্থসিদ্ধি আত্মদান,
পলকে পরাণ কেন কাঁদাইছে তবে,
হা বিধি তোমার বিধি কেন হেন ভবে?

৬

কমলে কণ্টক কেন, কলঙ্ক চাঁদেতে,
কুসুমে কুসুমে হেন, কীটের বসতী কেন,
হাসিলে দামিনী বজ্র গরজে দম্ভেতে,
হাসিলে গগনে শশী, তুলি কাল মেঘরাশি,
আবরে কেন বা তারে হায় আচম্বিতে,
কে জানে কি ভাব সদা আছে তব চিতে।

৭

আছে কি এমন দেশ যেখানে প্রণয়ে
বিচ্ছেদ তাড়না নাই, ছুটে আমি সেথা যাই,
যেখানে মনের সুখে বুকেতে রাখিয়ে,
অনিমেষে প্রাণ ভরে, হৃদয় সান্ত্বনা করে,
নিরখি প্রাণের ধন হৃদয় ভরিয়ে,
যেখানে না দেয় বাধা কেহ বাদী হয়ে।

৮

নাহিক রজনী কিম্বা ক্ষুধার তাড়না,
না ধরে নিদ্রার ধার সুধু প্রাণ প্রতিমার
নিরখি বদন চারু, মিটায় কামনা,
দুই দেহ এক হয়ে, থাকে সদা মিশাইয়ে,
থাকে যদি হেন স্থান, আমারে বলনা,
ছুটে গিয়ে তথা যত মিটাই বাসনা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ঘটোৎকচ বধ কাব্য (প্রথম খণ্ড।) শ্রীশশিভূষণ মজুমদার বিরচিত। কলিকাতা কুমুদবন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত।

বাঙ্গলা ভাষার যত কিছু অভাব থাকুক না, কবিতার অভাব নাই, স্কুলের ছাত্র বর্ণপরিচয়ের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই এক দুই তিন চারি করিয়া চোদ্দ গুনিয়া পয়ারে প্রপিতামহের পিণ্ডদান করে। সেই সমস্ত ছারপোকা প্রসবিনীসদৃশ লেখনীর কবিতাছটায় আমাদের কর্ণ বধির প্রায়, সেই পুতিগন্ধের উগ্রতার নাসিকা বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অরুচি জন্মিয়াছে। যাহাই হউক অদ্য সেই সমস্ত অবর্জ্জনা স্তূপমধ্যে একখানি উপাদেয় বস্তু সন্দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। শশিভূষণ বাবু কবিতা-কাননে নববিহারী নহেন, ইনি আরও দুই একবার দেখা দিয়াছেন। বিগত বর্ষের আদরণীতে আমরা ইঁহার প্রণীত একখানি পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছি, অদ্য আবার আর একখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা গ্রন্থকারের পূর্ব্বগ্রন্থে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছিলাম, এখানিতে তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। ইহার কবিতাগুলি বেশ সরলভাষায়, সরল কথায়, সরল ছন্দে লিখিত।

ঘটোৎকচ কে? এবং ঘটোৎকচ বধকাব্যই বা কি? তাহা পাঠককে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। আমরা কাব্যসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। কাব্যখানি পাঁচ সর্গে সমাপ্ত, প্রথমসর্গের দৃশ্য কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণ।—গ্রন্থকার চিরাযত প্রথানুবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থারম্ভে সরোজবাসিনীর আরাধনা করিয়াছেন, সেটী মন্দ হয় নাই, লেখক স্থান বিশেষে লিখিয়াছেন, ———

"সংকল্প করেছি দৃঢ়, বাসনা অন্তরে—
অযশ দুর্ম্মদ যক্ষে অবহেলি বলে,
বসিব অমরাসনে, কবিকুল সহ।—
দাসের বাসনা পূর্ণ কর দয়াবতি!"

আমরা আশা করি গ্রন্থকারের কাব্যের প্রতি আস্থা ও যত্ন থাকিলে তাঁহার দম্ভোক্তি নিষ্ফল হইবে না। এই সর্গে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ এবং অবশেষে পাণ্ডবদিগের শিবিরে প্রস্থান পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। শেষ কবিতাটী এইরূপ,—

গর্জ্জিল কৌরব দল, লাজে অধোমুখে,
ধীরে ধীরে পাণ্ডবীর সৈনিকমণ্ডল
(নিবিড় জলদে ডুবে নক্ষত্র যেমন)
দুর্জ্জয় শিবির মধ্যে, পশিল নীরবে।"

দ্বিতীয় সর্গে (পাণ্ডব শিবিরাভ্যন্তরিক মন্ত্র ভবন।) গ্রন্থকার সর্গ প্রারম্ভেই সন্ধ্যা বর্ণন করিয়াছেন, বর্ণনা অতি মধুর হইয়াছে—স্থানাভাব হেতু আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ এ বর্ণনায় কতকটী নূতনত্ব আছে ইহাতে বিরহিণীর খেদ নাই, মাল্যবচনা নাই, প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসের মধুর আশা নাই—ইহা সরল সুমিষ্ট প্রকৃতির-অক্ষয় রাজ্যের সামান্য ছায়া, কল্পনার মৃদুস্ফোটন—কিন্তু নবীন।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে কাম্যকানন, ঘটোৎকচ রাজধানী বর্ণন,—বর্ণনা মন্দ হয় নাই।

চতুর্থ সর্গে হিড়িম্বার নিকট ঘটোৎকচের কুরু যুদ্ধে যাইবার বিদায় গ্রহণ। হিড়িম্বা কর্তৃক ঘটোৎকচকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ ও স্বীয় হৃদয়ের দুশ্চিন্তার কথা বেশ সুমিষ্ট হইয়াছে, ঘটোৎকচের ও মাতার প্রতি প্রবোধ বাক্য বেশ হইয়াছে কিন্তু আমরা একটী স্থানের নিন্দা করিলাম। যুদ্ধার্থে বিষাদিনী মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে—

" প্রণয় পীযূষ ধ্বংশ রমণী বচনে "
" নারীর বচনে ভ্রাতা ভ্রাতায় বিরোধ
হইতেছে অহর্নিশ, হায়। যথা আশীবিষ
কুটিলা রমণীবৃন্দ সুখের আশ্রমে
সোদরে ভীষণ ছায়া রমণী বিক্রমে ? "

ইত্যাদি রুচি বিরুদ্ধ—আমরা কোন ক্রমেই এ সকলের অনুমোদন

করিতে পারি না। ঘটোৎকচের অন্য কোন ভাবে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে আমরা সমধিক প্রীত হইতাম এবং গ্রন্থকারকে সমধিক প্রশংসা করিতাম।

পঞ্চম সর্গে অন্তঃপুরবর্ত্তী কেলী ভবনে সরমা সখীগণ পরিব্যাপ্ত হইয়া আসীনা। এ সর্গটি অতি সুন্দর, আমরা বলি পুস্তকের উৎকৃষ্ট অংশ। পাঠকের অবগতির জন্য একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"হে প্রাণ বল্লভ।
বলিতে হবেনা আর (কহিলা যুবতী)
শুনেছি সঙ্গিনী মুখে—না নিবারি তোমা
যাইতে সমরাঙ্গনে, বীরবর তুমি
যাও রণে, রণ প্রিয় কেশরিণী কভু
নিবারে কি কেশরীরে—মাতঙ্গ নিনাদ
শ্রবণি উল্লাসে সদা রোষে মৃগপতি?
কিন্তু বলি প্রাণসখে।—এই কি সাক্ষাতে
বলো নাথ। "প্রিয়তমে ও বিধুবদন
না হেরিলে ক্ষণকাল, গভীর বিষাদে—
মানস কমল ডুবে বিরহ সলিলে?"
এই কি সে প্রণয় বাক্যের পরিচয়?
কি দোষে এ দাসী দোষী ও পদ রাজীবে?
দোষী যদি—বর প্রাণ। অম্লান অন্তরে
সহিব কৃপাণাঘাত। কিন্তু এ যাতনা
মরমের এ যাতনা না পারি সহিতে।

যাহা হউক আমরা উপসংহারে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি, কাব্য খানির দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অনেক অধিক,—ইহা অল্প প্রশংসা নহে। এ কাব্য খানি একখানি সুপাঠ্য কাব্য-গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। শশিভূষণ বাবুকে কাব্যোদ্যান হইতে নূতন নূতন কুসুম চয়ণ করিয়া আপনার কল্পনার পুষ্পাধার সজ্জিত করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

আর কেন !

————০০————

ওহে পতিত দন্ত, গলিত মাংস, শুভ্র-কেশধারী বৃদ্ধ, এখনও যে তোমার সংসার প্রচারের নিবৃত্তি নাই, এখনও যে তুমি মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ঠিকে চাপকানে অঙ্গ ঢাকিয়া পেনশন মঞ্জুরের জন্য, পাছে দশটা বাজিয়া যায় এই ভয়ে ছুটা ছুটী করিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলে ছুটিতেছ——আর দেরি নাই এখনই পাড়ি মারিবে, এখনই যে তোমার বহুযত্নের, বহুকালের যৌবন ধনটী হেলায় হারাইবে, আচ্ছা মহাশয়, আপনিত, বর্ত্তমানের লোক, বাল্যকাল হইতে আজি প্রায় সত্তর আশি বৎসর হইল এই কর্ম্মভূমির কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, বলুন দেখি এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি শান্তির সুখময় ভাব দেখিয়া আত্মার সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ! দেখিতেছেন ত এই সব মর্ত্ত্যলোকে আপনার সাক্ষাতেই প্রতি দিন কত শত, সহস্র, লক্ষ লক্ষ জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছু দিন লীলা খেলা করিয়া প্রস্থান করিতেছে, তাহাদিগের থাকিতেছে কি ? আপনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, আপনাপেক্ষা সংসারের সহিত আমার কিছু অধিক কালের পরিচয় নহে, কিন্তু আপনিই বলুন দেখি আপনার আমার ইহ জগতে কি থাকিবে ? যদি ভাল করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ চাহিয়া না দেখেন তবে নিশ্চয় বলিবেন কেন ?—আপনার পুত্র পৌত্রগণ থাকিবে, তাহারা আপনার নাম বজায় রাখিবে, তাহারাই আপনার ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি, তাহারাই আপনার কীর্ত্তিস্তম্ভ, তাহাদিগের জন্যই আপনি শীতনাই গ্রীষ্মনাই, বর্ষানাই হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, অতএব সংসারই আপনার একমাত্র জ্ঞান, এক মাত্র ধ্যান, আপনি বহুদিন হইতে সংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একমনে এক ধ্যানে সেই মূল মন্ত্র জপ করিতেছেন, তাহাতেই আপনি বাল্য যৌবন, প্রৌঢ় তিনকাল কাটাইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, এখনও আপনার হাহাকার ঘুচিতেছে না——এখনও আপনি “যথাসিদ্ধি” মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন না।

সাধ্য মন্ত্রের সাধনা করিয়া এত দীর্ঘকাল মধ্যে করিলেন কি। আপনার সাধনার সিদ্ধি হইল কই? যখন আপনি এই অতি সাধের, অতি আরাধনার ধন এই সংসার মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন হইতে আজি কত বৎসর গেল কিন্তু "যথা পূর্ব্বং, তথা পরই" রহিয়া গেল। আবার এই কথার উত্তরে আপনি হয়ত রাগত হইয়া বলিবেন "ছোঁড়া বড় অর্ব্বাচীন, কোন বোধ নাই, কেন—আমি একলমে যে চাকরী করিয়া বুড়াইতে চলিলাম, আবার পুত্রগণকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি তাহারা যোগ্য হইয়া দশটাকা উপার্জ্জন করিতেছে, আমি কত সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ করিয়াছি, কত ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি, আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, সংসারে আসিয়া আমি যাহা করিয়াছি, কে এমন করিতে পারিয়াছে। সত্য আপনি সহস্র সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন, আপনার সংসার পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূতে জাজ্জ্বল্যমান, সংসারের সকল সুখে আপনি সুখী, সত্য বটে আপনার সুখৈশ্বর্য্য অনেকের বাঞ্ছনীয়" আপনি এই সংসারে একজন কৃতিমান পুরুষ, সংসারে আসিয়া যাহা করিতে হয় আপনি তাহা করিয়াছেন, অনেকে আপনার মত কাজ করিতে পারে নাই। আমি অর্দ্ধবয়স্ক ছোঁড়া হইয়া তথাপি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হইল কই? যদি বলেন ইহ জীবনে, যখন সংসারই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহ সংসারে আপনার যাহা সাধ্য তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইয়াছে। তাহাহইলে আমি, এই অর্দ্ধবয়সের ছোঁড়া 'আপনাকে গোটাকত কথা বলিব: যদি রাগ না করেন, আর রাগ করিলেই বা আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি, আমি বলিতে ছাড়িব না যে আপনি একটী ভবের পশু—এই জাতীয় পশুর মনুষ্যের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসাদি ইন্দ্রিয় আছে, মনুষ্যের ন্যায় জিহ্বা, কণ্ঠনালী; ও বাগিন্দ্রিয় আছে, মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া দুই পায়ে ভর দিয়া চলে, মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু মনুষ্য নহে। এই জাতীয় পশু ও সাধারণ পশুতে প্রভেদ এই যে ইহারা মাঠে চরে না, ঘাস খায় না, যদিও খায় কাঁচা খায় না, সিদ্ধ করিয়া খায়, বৃক্ষ শাখায় বা ভূগর্ত্তে বাস করে না, অনেকগুলি একত্র হইয়া গৃহে থাকে, রোদ্র শিশির বড়

একটা সহ্য করিতে পারে না, বাড়ার মধ্যে অনেকেই কাপড় পরে। ভাবুকের মতে যদি এই বিশ্বসংসারকে দুনিয়ার মালিকের চিড়িয়াখানা ধরা যায় তাহা হইলে এই শ্রেণীর জীবদিগকে তাঁহার সখের পশু বলিবার কোন আপত্তি বিবেচনা করি না। জীব সাধারণে আহার নিদ্রা মৈথুনাদি যে সকল নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বশীভূত, মনুষ্যেও যদি তাহাই হইবে তবে এ সংসারে পশু পক্ষী ও মনুষ্য কিছুই ভেদ রহিল না। হে বৃদ্ধ, তাই বলিতেছিলাম তুমি তোমার দীক্ষামন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পার নাই, ভব-সংসারের উদ্দেশ্য জ্ঞান তোমার এ পর্যন্ত জন্মে নাই। তুমি হাহাকার করিয়া ছুটা ছুটী করিতে আসিয়াই হাহাকার করিতে করিতে চলিয়া যাইবে। সংসার বনের পশু তুমি বনে থাকিয়া, বনে চরিয়া, বন ছাড়িয়া কোথায় যাইবে, তাহার ঠিকানা থাকিবে না। তোমার পরিচয় দিতে এই সংসারে তোমার পশু জীবনের আর কি থাকিবে। নিত্য নিত্য তোমারই দৃষ্টির উপর কত পশু জন্মিতেছে, দিন কত থাকিয়া, চলিয়া যাইতেছে,—পশুবংশে পশুর পশুত্ব বই আর কিসের পরিচয় দিবে, কি করিলে যে তোমার পশুনাম ইহসংসারে চিরস্থায়ী থাকিবে! বাল্যকালের পর হইতে চারিচালের ভার মাথায় লইয়া শিক্ষা করিয়াছ এক সংসার। সংসারের জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছ, যৌবনে যুবতীর যৌবন লালসা পরিতৃপ্তির জন্য বিব্রত হইয়া কত কি করিয়াছ, মদমত্ত মাতোয়ারার ন্যায় মুহূর্ত্তের তরে পানপাত্র হস্তচ্যুত করিতে ভালবাসিতে না। তোমার সন্তান সন্ততি কয়টী জন্মিবার পরেই তুমি অভিপান দোষে প্রোঢ়ে বিভোল হইয়া পড়িলে, তখন তোমার জ্ঞানমাত্র রহিল না, আশার নিবৃত্তি কিছু-তেই তোমার হইল না, নেশার খেয়ালে সেই যে তোমার এক ঝোঁক ধরিয়াছে সে ঝোঁক ত তোমার গেল না, বরং তাহার বৃদ্ধিই দেখিতেছি। দেখ দেখি তোমার যৌবন প্রোঢ় কাটিয়া গেল এখনও নেশা ছুটিল না—এখন ত দেখি বেতরনেশা—গায়ে সে বল নাই, ক্রমে চলৎশক্তি হারাইতে বসিয়াছ, চক্ষে ঘোলা পড়িয়া আসিতেছে, চক্ষু চাহিয়া দেখিবার সামর্থ যাইতেছে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পার না, তোমাকে মাটী ধরিয়া উঠিতে বসিতে হয়; অতি পানদোষে তোমার মদাত্যয় জুটিল,—হস্ত

পদ কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও সুরার গ্লাশটী পরিত্যাগ করিতেছ না,—এত বিষয় বিভব করিয়াছ, তথাপি ত্রিংশৎ মুদ্রা মাসিক লাভের জন্য দিবা ১০ টায় আহার করিয়া ছুটিতেছ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া রাত্রিকালে ফিরিবে, তাহাতেও কাতর নহ। এত খাটনির পর প্রাতঃকালে যতক্ষণ বাড়ীতে থাক, উড়ে মালীকে সঙ্গে লইয়া নিজহস্তে বাগানের আগাছা উৎপাটন করিতে ক্ষান্ত নও। তাই বলি আর কেন। সংসার সংসার করিয়া বাল্য যৌবন প্রৌঢ় তোমার জীবনের সুগতির কাটাইয়া দিলে, এখনও চৈতন্যোদয় হইল না,—চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, শরীরের মাংস শিথিল হইল, এখনও তোমার সংসারমত্ততা ঘুচিল না,—এখনও তুমি বেলা থাকিতে সারাদিনের কাজ সারিতে পারিলে চিনাবাজারে গিয়া ছোট পৌত্রীর জন্য খেলনা ক্রয় করিয়া লইয়া, বাটী প্রত্যাগত তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া সময় কাটাও। এখনও একবার ভবিষ্যৎ ভাবিলে না—আর কয় দিন। জীবন সন্ধ্যা নিকট। তোমার সংসারের সুখ সূর্য্যের মধুর রশ্মি সংসার ছাড়িয়া গাছের পাতায় উঠিতেছে—সত্য বটে পশ্চিমগগনের মনোজ্ঞতায় এখনও তোমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু একবার পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখ ঘোর অন্ধকার আকাশ ঢাকিয়া আসিতেছে, সময় থাকিতে চাহিয়া দেখ, তুমি এখন নেশায় বিভোর, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত এবং দিগ্‌ভ্রান্ত, তুমি বেচে বসিয়া পোতের সহিত যে খেলনা লইয়া খেলা করিতেছ, তাহাতে তোমার লয় হইতেছে এখনও বুঝি তুমি ভাবিতেছ যে তোমার জীবন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে পুনরুদিত,——বৃদ্ধ, ওহে সংসারের মায়াজালে বিহ্বল বৃদ্ধ ইহ সংসারে যাহা একবার যায় তাহা আর ফিরিয়া আইসে না, নেশা ছাড়িয়া দেখ না একবার—তোমার জীবনসূর্য্য সংসার আকাশের নীচে নামিতেছে, পূর্ব্বদিকের আঁধার আসিয়া তোমার জীবন আলোক এখনই নিবাইবে, ইহ সংসারে তোমার লীলা খেলা ফুরাইয়া আসিতেছে, এখনও তোমার নেশা ছুটিল না, সাদে মধুর ভোজনে সবল মায়ামদের গ্লাশটী এখন দূরে ফেল, বিভু নামের সুতার সরবৎ একটী গ্লাস প্রাণ ভরিয়া পান কর দেখি, এখনই তোমার নেশা ছুটিবে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারিবে, তাহা হইলেই তোমার সাধ্য মন্ত্রের

পাবনা হইবে। আহা ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার সংসার লোভিককে—যে প্রাশে পূরিয়া এখনও তোমাকে মদ দিতেছে। তাহারই বা দোষ দিব কি, দোষ তোমার—সে হাজার দিউক তুমি কেন তাহা দূরে ফেলিয়া আপনাআপনি ঠিক হও না।

সুমতি নাম্নী তোমার ইহজীবনের ধর্ম্মপত্নী সত্বেও তুমি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবে, করিলে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সংসার পরিনীতা কামিনীর সহিত এক প্রাসে মাধ্বমদ পান করিয়া একই মত্ত হইলে যে ধর্ম্ম পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিলে না, তাহাকে চিরবৈধব্য সাগরে নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দেওয়া দূরে থাকুক তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিলে না যে সে আছে বলিয়া ভ্রমেও ভাবিলে না, তাহার সংগমনে জ্ঞান নামে যে সুপুত্র জন্মিবার প্রত্যাশা ছিল, যাহা হইতে তোমার ঐহিক পারত্রিকের ফললাভ হইত, তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া নবপরিণীতার প্রণয়ে মজিয়া চিরকাল কাটাইবে, এখনও তোমার পশু-বৃত্তির পরিতৃপ্তি হইল না,—এখন সামাল সামাল পড়িয়াছে——আর কেন? এখনও তোমার সেই প্রতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নী তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা একবার চক্ষু চাও!!!

প্রথম প্রণয়।

——:০:——

১

শুনিয়াছি ষোড়শীর নূপুর নিক্কণ,
শুনিয়াছি বালমুখে সুধা বরিষণ।
সুখের বসন্ত কালে, বসিয়া তমাল ডালে,
শুনেছি ডাকিতে পিকে অমিয়া পঞ্চমে,
শুনেছি রমণী কণ্ঠ প্রেম আলাপনে।

২

বসিয়া প্রভাত কালে জাহ্নবী সৈকতে,
শুনেছি ভৈরবী গীত নদী পার হ'তে।
সুনীল সরসী জলে, বেষ্টিয়া কমল দলে,
শুনিয়াছি ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কার,
শুনিয়াছি সন্ধ্যাকালে সুতার সেতার।

৩

শুনিয়াছি প্রণয়ীর প্রণয় কাহিনী,
শুনেছি আশার মিষ্ট ভাষা কুহকিনী।
শুনেছি চারণ মুখে, বীর কীর্ত্তি গাথা সুখে,
শুনেছি কালিন্দী তীরে মঞ্জু কুঞ্জ বনে
মোহন মুরলী ধ্বনি উচ্ছ্বলিত মনে।

৪

শুনিয়াছি বন্ধুমুখে প্রণয় সম্ভাষ
শুনিয়াছি যুবতীর মুখ ভরা হাস।
শুনিয়াছি প্রাণ ভরে, সান্ধ্য সমীরণ ভরে,
আন্দোলিত পল্লবের মধুর স্বনন
কিন্তু কিছু শুনি নাই মধুর এমন।

৫

শুনিয়াছি মাতৃমুখে সন্তান সোহাগ,
শুনেছি বীরের নব প্রেম অনুরাগ।
শুনেছি বরিষা কালে, কৃষ্ণ কাদম্বিনী ভালে,
নবীন নীরদ রব ললিত গম্ভীর,
শুনেছি নবীন বীণা নবীন কবির।

৬

ভাদ্র মাসে ভরা গঙ্গা বহে যায় ধীরে,
শুনেছি সুকল ধ্বনি বসে তার তীরে।
বিকাশে রমণী দলে, বারী কক্ষে যায় চলে,
বাজে তাহে ধীরে ধীরে ভাবিজ মঞ্জরী
চরণ দোলন তালে মন মুগ্ধকরী।

৭

সকলি শুনেছি যত শ্রুতি বিমোহন,
একে একে কত তাহা করিব বর্ণন।
কিন্তু কভু নাহি শুনি, এমন মধুর ধ্বনি,
এমন রসাল তান শ্রবণ রঞ্জন,
শিরায় শিরায় যাহা করিছে ভ্রমণ।

৮

কি বলিব সেই কথা কি বলিব আর,
প্রেমের প্রতিমা খানি যখন আমার।
প্রথম মিলন কালে, উদ্যান পাদপ তলে,
রমণী সুলভ লজ্জা বিজড়িত স্বরে—
কাঁদো কাঁদো ভঙ্গী যথা গৌরব করে।

৯

শিবিষ কোমল করে ধরি দুটি হাত,
সম্বোধিলা নতমুখে "প্রিয়তম—নাথ"
বালিকার পরথম সেই প্রেম সম্বোধন,
জাগিছে জাগিবে হৃদে যাবত জীবন—
শয়ন ভ্রমণে মম সুখের স্বপন।

—— ——

কমলা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

———o o o———

প্রবাস।

যখন মনুষ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে, যাহাদের আমরা পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করি, তাঁহারাও আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। সুখের বস্তু সে সময়ে সুখদানে সমর্থ হয় না, সকলই দুঃখময়, জগৎ শূন্যময়, যে দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দুঃখের বিভীষিকাময় ছবি আমাদের হৃদয়কে অবসাদিত করে। সুখ, তখন আমাদের নৈকট্য ত্যাগ করে। দুঃখ, আমাদের অযাচিত সঙ্গী হয়। মন অবিরত দুঃখের ঘটনায় আচ্ছাদিত থাকে কোন প্রকারেই সুখ পায় না। আমাদের দুঃখিনী কমলার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসনেও দুঃখের ভীষণ স্রোতের গতিরোধ হইল না, তাহার দুঃখের আরও বৃদ্ধি হইল। যাঁহারা মহানগরী কলিকাতায় বাস করেন, হয় ত তাঁহারা পল্লিগ্রামের দলাদলীর ভয়ানক কথার বিষয় স্বপনেও জানেন না। অদ্যাপিও পল্লিগ্রাম সমূহ হইতে যে কতবিধ অত্যাচার হইতেছে, ইহা তাঁহারা অবগত নহেন। এখনও এরূপ অনেক পল্লিগ্রাম আছে যে স্থানের লোকেরা মনে করিলে অনায়াসে দলবদ্ধ হইয়া এক জনার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। অভাগিনী কমলার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। পিতা মাতার সহবাস, সেই শৈশব কালের পিত্রালয় যাহা সে অমরাবতী বলিয়া জানিত, তাহা এক্ষণে অনিচ্ছায় সমাজের দৃঢ় শাসনে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। গ্রামের এক প্রান্তভাগে, অতি দুঃখে দিনপাত করিতেছিল, ইহাতেও লোকে বাদ সাধিতে উদ্ভ্রান্ত হইল। গ্রামস্থ প্রতিবাসিনীরা কমলার দুঃখে সহানুভূতি বা দুঃখ প্রকাশ করিতে মধ্যে মধ্যে সে স্থানেও যাইত, সমাজের দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা তাহা ভাল বুঝিল না, এ সমস্ত গুরুতর গর্হিত কার্য্য যাহাতে নিবারিত হয় তাহার

চেষ্টা হইতে লাগিল। আপন আপন পরিবারদিগকে নিষেধ করিতে সাহস হইল না, শেষ স্থির হইল, কমলা যাহাতে গ্রামে থাকিতে না পায়, সে থাকিলেই গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা তাহার নিকট যাইবে, অসতীর সহবাসে অপরার চরিত্র কলঙ্কিত হইবে, ইহাই সমাজের গূঢ় রহস্য। সুতরাং তাহারা একে একে কমলার প্রতি অন্যায় আচরণ আরম্ভ করিল। কমলা দেখিল নিরুপায়, সকলেই তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। অবলা অসহায়া বালিকার আর কে সহায় হইবে? এই অবকাশে বিষাদ তাহার সহিত ঘোরতর সহচারিত্ব স্থাপনা করিল। কমলার পিতা দেখিলেন মহাবিপদ, তখন সমাজবন্ধু রামধন স্থির করিলেন কমলা আপাততঃ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করুক, পরে যে রূপ হয় করা যাইবে। ধন্য রামধন, ধন্য তোমার পিতৃস্নেহ।

অভাগিনী কমলা অনন্যোপায় হইয়া বিদেশে বাস করিতে চলিল। বিশালপুর হইতে পাঁচ সাত ক্রোশ দূর দেবানন্দপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় কমলার এক দূর সম্পর্কীয় মাতামহীর বাস, তাঁহার আর কেহই ছিলনা, সুতরাং কমলা সেই খানেই প্রেরিত হইল।

পিতা মাতা, গ্রাম, বালসখী হরিদাসী ও পরিজনবর্গ ত্যাগ করিতে কমলার যে কত ক্লেশ হইল তাহা সহৃদয় পাঠককে অধিক বলিতে হইবে না, তৎকালে কমলার ক্রন্দন ও বিষাদময়ী মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হয়। আজি রামধনের স্নেহের সর্ব্বস্বধন কোথায় যাইতেছে, তাহার সজল মুখমণ্ডল আর কে মুছাইয়া দিবে? কে তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে? ভারত! তোমার ঊষর বক্ষে কেন নলিনী বিকাশ হয়? অধম নীতি-শূন্য সমাজ, কে তোমাকে বিজ্ঞ বলে? আর সংসারী, যে অবলার যাতনা বুঝেনা কে তাহাকে সংসারাশ্রমে থাকিতে বলে?

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০০—

মনের কথা।

কমলা মাতামহীর গৃহে আশ্রয় পাইল। বৃদ্ধা কমলার মধুমাখা কথায় তাহাকে আপনার দৌহিত্রীর ন্যায় স্নেহ করিলেন, কিন্তু কমলার হৃদয়ে যে ভীষণ অগ্নি দগ্ধ হইতেছিল, তাহা মাতামহীর সামান্য বা অসীম স্নেহ সান্ত্বনা করিতে পারিল না, শুষ্ক তৃণের ন্যায় অনলে তাহা জ্বলিয়া গেল।

কমলার আহারে বিতৃষ্ণা, স্নানে অনিচ্ছা, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, কিছুই ভাল লাগে না। সদাই বিষণ্ণ সদাই বিমর্ষ। কমলার আর সে অপরূপ লাবণ্য নাই, সেই নয়ন বিমোহনকারী স্বর্ণপ্রভা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন চাঁদকে রাহু গ্রাস করিয়াছে। কমলা কেবল নীরবে নির্জ্জনে ক্রন্দন করে, আর হৃদয়-বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে।

প্যারীর বিরহ, পিতামাতার অদর্শন জনিত ক্লেশ কমলার অসহ্য হইল, ননীর হৃদয় গলিতে আরম্ভ হইল। দিনে দিনে কমলার দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে ভাঙ্গা বেড়া অতি যত্নে সামান্য উপকরণে আবদ্ধ ছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে তৃণখণ্ড উপকূলে বাধিয়াছিল, স্রোত মুখে তাহা আবার ভাসিল। কমলা জীর্ণ, শীর্ণ ও ভয়ানক রোগগ্রস্তা হইল।

দিনে দিনে কমলার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বৃদ্ধা মাতামহী কমলার রোগের বৃদ্ধি ও তাহার শারীরিক অবস্থার দৈনিক অবনতি উপলব্ধ করিয়া তাহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিলেন, রামধন ও তাঁহার স্ত্রী যথা সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামধনের হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না, আজি কমলার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ও বিগলিত হইল। এখন আর কমলার উত্থানশক্তি নাই, কথা কহিতে কষ্ট হয়, জ্বর ত্যাগ হয় না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, ডাক্তার দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও সাহস দেন না। রামধন বিমর্ষ ও স্তম্ভিত। শ্যামমোহিনীর নয়ন হইতে জল আর শুষ্ক হয় না।

সন্ধ্যাকাল, গৃহমধ্যে একটী সামান্য দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কমলা পালঙ্কে শায়িতা, তাহার শিয়রদেশে শ্যামমোহিনী আসীনা। কমলা রোগের যাতনায় অধীরা,—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা"

শ্যাম। কেন কমলা?

কমলা কোন কথা কহিল না, শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার দুই গণ্ড বহিয়া বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। বলিলেন "কমলা! কাঁদ কেন মা?"

কমলা পুনরপি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "মা"

শ্যাম। বল কমলা, কি বলিতেছিলে বল।

কমলা। আর ত আমার সময় অল্প।

শ্যাম। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে।

কমলা। আর কেন মা, আমার অবস্থা দেখে কি বুঝ্‌চ না? সে যা হোক এ সময়ে আমার একটী কথা রাখ।

শ্যামমোহিনী সাশ্রুলোচনে বলিলেন "বল্‌"

কমলা মাতার হাতটী ধরিয়া সজলচক্ষে বলিল "মা একবার"—আর কমলার কথা বাহির হইল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী কমলার নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্যারীকে দেখিবে?

কমলা নিরুত্তর।

শ্যাম। আমি এখনি খবর দিচ্চি।

কমলা। কোথায়?

শ্যামমোহিনী শঙ্কটে পড়িলেন, বলিলেন "সে সংবাদ তোমার পিতা জানেন।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আর"

শ্যাম। কি মা।

কমলা। হরি আর ভগবতীকে আন্‌তে পাঠাও।

শ্যামমোহিনী কমলার বৃদ্ধা মাতামহীকে কমলার নিকট বসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ উপায়।

রামধন বহির্ব্বাটীতে বসিয়াছিলেন, শ্যামমোহিনী তাঁহার নিকট গেলেন, রামধন জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা এখন কেমন আছে?"

শ্যামমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সেইরূপ।"

রামধন বিমর্ষ হইলেন, শ্যামমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন "ডাক্তারে কি বলিল?"

রামধন। আশা অতি কম।

শ্যামমোহিনীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সরোদনে বলিলেন "জগদীশ্বর! এ জগতে এ হতভাগিনীর কমলা ব্যতীত আর কেহই নাই। দয়াময়! অন্ধের যষ্টি আমার সেই সর্ব্বস্ব ধনের কি হবে নাথ? আমি যে কেবল কমলার চাঁদমুখ দেখেই বেঁচে আছি। হা দেশাচার, হা সমাজ, তুই আমার কি সর্ব্বনাশ করলি, একজন নিরপরাধী অবলার সকল সুখ নষ্ট করলি। হা ঈশ্বর! আমার এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কি তোমার চরণতল স্পর্শ করবে না? দয়াশূন্য মায়াশূন্য অন্ধ সমাজের কি চেতনা হবে না?"

রামধন বলিলেন "আর কেঁদনা, এখন আর ত উপায় নাই।"

শ্যাম। কেন উপায় নাই, ঈশ্বর করুন, আমার কমলা বাঁচুগ, কেন উপায় হবে না।

রাম। সে কথা বলতে।

শ্যাম। এখন এক কাজ কর, কমলা প্যারীকে দেখতে পাগল হয়েছে, যাতে একবার প্যারীকে দেখ্তে পায় তা কর, নইলে কমলা আমার বাঁচ্বে না।

রাম। উপায়?

শ্যাম। আমি মেয়ে মানুষ আমি কি উপায় স্থির করব, যাতে ভাল হয় তাই কর।

রাম। প্যারী যে কোথায়, তাত জানিনা, বাবা আমার কমলাকে কত ভালবাসত। প্যারী যে কমলার বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে এতদিন জীবিত আছে তাহারই বা স্থির কি?

শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, বলিলেন "তবে উপায়?"

রামধন একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত।"

শ্যাম। দেখ যতদূর ভার, কমলা যে আমার বাঁচ্‌বে সে আশা ত নাই, দেখ যদি এ সময়েও তাকে একটু কটা সুখী কর্‌তে পার।

রামধন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "ও [illegible] ঠাওরাও, আমি কমলার কাছে যাই।"

রাম। আচ্ছা।

শ্যাম। হাঁ আর এক কথা, আমাদের হরিদাস আর ভগবতীকে আন্‌তে লোক পাঠাও।

রাম। সে বেশি কথা নয়।

শ্যামমোহিনী প্রস্থান করিলেন, রামধন বিমর্ষভাবে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন "হায় আমি কি মূর্খ, আমি সমাজের ভয়ে আমার ইহ জন্মের সকল সুখই নষ্ট করিলাম। যদি কমলাই না বাঁচে তবে আমার সংসারে কাজ কি? তখন আমি সমাজ লইয়া কি করিব? হায় মা কমলা, যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি তুমি আরোগ্য হও, তবে আমি আবার তোমার পিতার ন্যায় কার্য্য করিব, তোমার সকল সাধ পুরাইব, তোমাদিগকে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমার জীবন সার্থক করিব, নতুবা এই শেষ। মা কমলা, নিশ্চয় জানিও যে, তোমার শেষ দিনই আমার জীবনের শেষ দিন হইবে, এ দারুণ ব্যথা, এ ভয়ঙ্কর অনুশোচনা আর সহ্য করিব না।"

বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিয়া আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"প্যারী চির দিন "সাধারণী" পাঠ করিতে ভালবাসিত, বোধ হয় এখনও পড়ে, অতএব সাধারণীতেই একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউক, ঈশ্বর করুন আমার এই শেষ সময়ে আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার এ সামান্য আশা ফলবতী হয়।"

বৃদ্ধ তাহাই করিলেন, সাধারণীতে এই বিজ্ঞাপনটী পাঠাইলেন :—

"পা—আমার অনুরোধ রাখ, ক—লা মৃতপ্রায়, তোমায় দেখিতে পাগল, দেবনন্দপুরে ক—র মাতামহীর আলয়ে আসিবে।

শ্রীরা—ন"

হরিদাসী।

হরিদাসীর শ্বশুরালয় চুঁচুড়া। এখন হরিদাসী স্বামী ভবনে। দিবা প্রায় সার্দ্ধ নয় ঘটিকা—পূর্ণ যৌবনা স্বামীপ্রেমমুগ্ধা হরিদাসী দ্বিতলের বাতায়ন পথ দিয়া ভাগিরথীর তরঙ্গ ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমত সময়ে দাসী আসিয়া সেই চারুকরকমলে "সাধারণী" সমর্পণ করিল।

হরিদাসী সাধারণী পাঠ করিতে ভালবাসিত, সুতরাং পত্রিকাখানি হস্তগত হইবামাত্র ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পাঠ করিয়া রামধন প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটী তাহার নয়নপথে পতিত হইল। হরিদাসীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, শরীর অবসন্ন ও কণ্টকিত হইল। হরিদাসী বিজ্ঞাপনটী একবার দুইবার তিনবার পড়িল, তথাপি যেন চক্ষের ভ্রম ঘুচে না। ক্রমে সেই ইন্দিবর নয়নদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, বলিল "ঈশ্বর! দয়াময়! কমলার কি সকল যন্ত্রণার শেষ এই ভয়ঙ্কর উপায়ে করিতেই স্থির করিয়াছেন? কমলা! প্রাণাধিকা প্রিয়সখী কমলা! আর কি তোমার সেই সুচারু বদনকমল দেখিব না? আর কি সেই মনোহর বদনের সুধাময়ী বাক্যনিস্রাব কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না?"

হরিদাসী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। সেই কমল নয়নযুগল অশ্রুবিমিশ্রনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যধারণ করিল। এমত সময়ে ভগবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণয়িনীর চক্ষে জল দেখিয়া যদিও তাঁহার হৃদয় বিকল

হইল বটে, তথাপি সে সময়েও তিনি তরুণী প্রণয়িনীর সরোজনয়নে, নীরের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। বলিলেন "কি হয়েছে হরি?"

হরিদাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সেই বিজ্ঞাপনটী দেখাইল।

ভগবতী স্থিরনেত্রে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন "উপায়?"

হরিদাসী। উপায় ঈশ্বর।

ভগবতী। দেবানন্দপুর এখান হইতে অধিকদূর নয়, আমি কমলাকে একবার দেখে আসি।

হরিদাসী। শুধু তুমি নয়, আমিও যাব।

ভগবতী। উত্তম।

হরিদাসী। দেখ ভাই, বিজ্ঞাপনটী প'ড়ে অবধি মন যে কতদূর অস্থির হয়েছে তা বল্‌বার নয়। আমি এই মাত্র গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন তাহা বিষতুল্য বোধ হচ্চে। তোমার সহাস্য বদন দেখ্‌লে আমি জগতের স্থায়িত্ব বিস্মৃত হই, কিন্তু এখন সে বদনও আমায় তত মুগ্ধ কচ্চে না। তোমার অভাবে যেমন কুসুমের সৌরভ মনে ধরিত না, আতর গোলাপ অঙ্গ দগ্ধ করিত, মনুষ্যের মধুর সঙ্গীতে মন ভুলিত না। অনন্ত নীলিমা সম্পন্ন আকাশ পানে চাহিতাম, প্রকৃতি যেন হো হো শব্দে আমায় দেখিয়া হাসিত, সে হাসি আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে প্রতি কোরে প্রতিশব্দিত হইত। একদৃষ্টে একমনে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, মনে হইত আমি যদি তারা হইতাম, তাহা হইলে তুমি যেখানেই থাক, তোমায় দেখিতে পাইতাম। যখন বসন্তের মৃদু অনিল আমার অঙ্গে রঙ্গ সহকারে ক্রীড়া করিত, তখন মনে হইত আমি কেন মলয় সমীরণ হইলাম না, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় সৌরভরাশি বুকে লইয়া বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতাম, তোমার শ্রীঅঙ্গে সেই শীতল সৌরভ ঢালিয়া দিতাম, তোমার চঞ্চল নিদ্রা প্রগাঢ় করিতাম। তোমার মিলনে আমার সে সমস্ত আশা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু আজি আমার কমলার জন্য কে

জানে কেন সেই পূর্ব্বরূপ ভাব সকল ধীরে ধীরে হৃদয় পথে পুনর্ব্বার উদিত হইল। মনে হইতেছে যদি গগনের পাখি হইতাম, তাহা হইলে ছুটিয়া গিয়া কমলাকে দেখিয়া আসিতাম। যদি আকাশের সূর্য্য হইতাম তাহা হইলে কমলার সেই সরলতাময়ী বদন মাধুরী আমার নয়নপথে পতিত হইত, দেখিয়া আমার হৃদয় তৃপ্ত হইত।

ভগবতী কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় হরিদাসীর সরল সুন্দর প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবতীর অক্ষয় প্রণয়-প্রীতি সাগরের গভীরতার কথা হৃদয়পটে উদিত হইল, মনে মনে বলিল, ইহার কাছে পুরুষের ভালবাসা ছাই। যুবতীর সুললিত বাক্য সুধাপানে ভগবতীর হৃদয় হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কমলার ছবি অপসৃত হইল, বিমুগ্ধ হৃদয়ে কত যত্ন কত আদর, কত সোহাগে, উদ্ভ্রান্ত চিত্ত, অবশ হৃদয়ে প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে সুশীতল চুম্বনে হরিদাসীর মন ভুলাইল।

তখন প্রেমময়ী হরিদাসী কমলা ভুলিল, জগতের অস্তিত্ব ভুলিল, শিশির-সিক্ত গোলাপের উপর প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি সম্পাতের ন্যায় যুবতীর সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, সে হাসিতে যেন প্রেমাক্ষরে কত ভাব, কত কথা স্পষ্টরূপে লেখা ছিল—ভগবতী মনে মনে বলিল—আর কেন, মোহিনীর মোহন হাসিতে ডুবিয়া মরিতে হয় না?

এমত সময়ে দাসী আসিয়া হরিদাসীর হস্তে একখানি পত্র দিল, হরিদাসী শশব্যস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল পত্রখানি এইরূপ,—

মা হরিদাসী।

কমলার আসন্নকাল উপস্থিত। আমার স্নেহময়ী কমলা হয়ত এইবার সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনন্তনাথের অনন্তাশ্রয়ে যাইবে। চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না, কিন্তু এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর! কমলার একান্ত ইচ্ছা যে এ অন্তিম সময় তুমি ও প্যারী আসিয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর—তোমায় বিশেষ অনুরোধ বৃথা। আমরা আপাততঃ দেবানন্দপুরে আছি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরামধন শর্ম্মা।

হরিদাসী সজলচক্ষে বলিল "ভগবতি। আর কেন বিলম্ব কর, শেষ কি কমলাকে দেখিতেও পাইব না!"

ভগবতী "আমি এখনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিল।

আশার সফলতা।

ভালবাসার যে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা যিনি সরল মনে ভাল বাসিয়াছেন তিনিই জানেন। সেই ভালবাসার মোহিনী মায়ায় হরিদাসীর মন কমলার প্রতি একান্ত আসক্ত। মানব মন শোক, দুঃখ, তাপ সকলই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যখন প্রণয়ীর দর্শন লালসায় উদ্বিগ্ন হয়, তখন তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না, প্রিয়জন মিলন ব্যতীত তাহার সন্তোষ কিছুতেই হয় না। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার, বসন্তের হৃদয়হারী মধুময় কুসুম সৌরভআপ্লুত সমীরণ, কুসুমের বিমলানন্দ-প্রদ সুগন্ধি, নির্ম্মল নৈশাকাশের মনোহর সুন্দর শোভা, নিখর জাহ্নবীর নিথর ভাব, অধিক কি পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্য যদ্যপি একত্রিত করা যায় তথাপি সে তাপিত হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই যে এক অভাব তাহা সেই ইষ্ট ভিন্ন অপর কিছুতেই পূরণ হয় না।

সরল প্রাণা হরিদাসী কমলা বিহনে জগত সংসার অন্ধকার দেখিতেছিল, সেই কোমল স্বর্গতুল্যহৃদয়ে একমাত্র কমলার ছবি অধিকার করিয়াছিল। হরিদাসী কমলাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছিল। ভগবতী ও হরিদাসী দিবা প্রায় সার্দ্ধ তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইলে দেবানন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যখন কমলার মাতামহীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন কমলা নির্জ্জীববৎ শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। হরিদাসী ও ভগবতীকে দেখিয়া

কমলার প্রভাহীন বদন কমল যেন অল্প প্রভাসম্পন্ন হইল। কমলা সাহ্লাদে হরিদাসীর হস্তধারণ করিল। হরিদাসী বিস্ময়ান্বিত নয়নে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কমলার শয্যাপার্শ্বে শ্যামমোহিনী উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি ভগবতীকে দেখিয়া সরিয়া গেলেন। ভগবতী বলিল "কেমন আছ কমলা?"

কমলা একটীমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না, চক্ষে জল আসিল। ভগবতী দেখিলেন অবস্থা অতিশয় মন্দ—চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বহির্বাটীতে রামধনের নিকট গমন করিলেন।

তখন হরিদাসী বলিল "কেমন আছ সই?"

কমলা। আর কেমন আছি, এখন গেলেই হয়।

হরিদাসী। বালাই, ও কথা কি বলিতে আছে।

ঘন মেঘরাশিতে ক্ষণিক চপলা বিকাশের ন্যায় কমলার নিষ্প্রভ বদনে ঈষৎ হাসি প্রতিভাত হইল, বলিল "সই, আমার বালাই।"

হরিদাসী। কেন তুমি কি? বালাই বলিতে বাধা কি?

কমলা জড়িতস্বরে কহিল "আমি সংসারের কণ্টক—প্রকৃত বালাই।"

হরিদাসী। তুমি সংসারের অমূল্য রত্ন, তোমার মূল্য কে বুঝিবে?

কমলা। সে যা হোক্ সই, আমার আর বাঁচ্বার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তোমায় দেখে প্রাণ শীতল হ'ল, আর এক ইচ্ছা আছে—কিন্তু তা ঈশ্বর সফল কর্‌বেন না।

হরিদাসী। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, প্যারী আসিবে বই কি।

কমলার চক্ষে জল আসিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তিনি কি আর এ সংবাদ পাবেন?"

হরিদাসী। কেন পাবে না, সাধারণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

কমলার হৃদয় যেন বসিয়া গেল, বলিল "বিজ্ঞাপন। লোক পাঠান হয় নাই?"

হরিদাসী। প্যারী কোথায় আছে তাহাত কেহ জানে না।

কমলা। ঈশ্বর আবার আমায় সুখে মর্‌তে দেবেন এও কি তাঁর শাস্ত্রে আছে? সই, প্যারীকে আবার আমি দেখিতে পাব, এও কি তুমি বিশ্বাস কর?

কথা কহিতে কহিতে কমলার মুখভাব যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। হরিদাসীর ভয় হইল, বলিল "সই কথা কহিও না, পীড়ার বৃদ্ধি হইবে।"

কমলা। না সই, প্যারীর কথা কহিলে আমার বোধ হয় যেন শরীর হইতে সকল রোগ শোক দূর হইয়াছে!

এমত সময়ে সহসা তথায় শ্যামমোহিনী আসিলেন। কমলার কথা থামিল। তিনি অনিমেষলোচনে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা মিটিল।

কমলার রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর কমলার জীবনের আশা নাই। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া কমলার ধমনীর গতিরোধ হইতেছে,—মৃত্যুর সকল চিহ্ন উপস্থিত।—পিপাসা বড় বলবতী। চক্ষু শ্রীহীন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিকৃত। সোনার কমল যেন নিদাঘ রৌদ্রে বিশুষ্ক। শ্যামমোহিনী বিকল হৃদয়ে কমলার শিয়রদেশে উপবিষ্টা, চক্ষু বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ঘন ঘন হৃদয় বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

কমলা শয্যায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। শ্যামমোহিনী কমলাকে বীজন করিতেছেন। কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা—"

শ্যামমোহিনী সভীত স্বরে বলিলেন "কেন মা?"

কমলা। মা—

শ্যাম। কমলা?

কমলা। মা—কি হ'ল

শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলা প্যারীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন " ভয় কি মা ।"

কমলা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আবার মোহাভিভূত হইল। শ্যামমোহিনী বীজন করিতে করিতে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমত সময়ে রামধন ও হরিদাসী প্যারিকে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামধনের বিজ্ঞাপন দেওয়া সফল হইল।

শ্যামমোহিনীর বদন প্রান্তে আনন্দের অপূর্ব্ব চিহ্ন বিকাশ পাইল। কিন্তু শ্যামমোহিনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, অথবা আনন্দ প্রকাশের ইহা সময়ও নহে।

শ্যামমোহিনী প্যারীকে বলিলেন " এস বাবা এস, বস।"

প্যারী অবাক্ হইয়া কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার পুনর্ব্বার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সেই দ্যুতিহীন বদন ঈষৎ প্রতিভাসম্পন্ন হইল। সেই জ্যোতিহীন নয়ন পুনর্ব্বার অল্প জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইল। নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপ যেন ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিল, কমলা চাহিয়া দেখিল।

কমলা প্যারীকে দেখিল, কিন্তু প্রকৃত প্যারী বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। বিস্ফারিত লোচনে প্যারীর দিকে আবার চাহিল, পুনর্ব্বার কমলা নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য রোগ, শোক, যন্ত্রনা বিস্মৃত হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "মাণি, কেন মা কমলা, অমন কচ্চ কেন ?"

কমলা আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, নয়নযুগল হইতে সবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। প্যারী ধীরে কমলার বামহস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন " চুপ কর কাঁদিও না।"

কমলা প্যারীর হস্ত ধারণ করিয়া আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন কমলার হৃদয়গত যাতনা আর সেস্থানে থাকিতে অক্ষম বক্ষবিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে উদ্যত।

এই সময়ে শ্যামমোহিনী সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, রামধনও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একমাত্র হরিদাসী কমলার পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিল,—তখন কমলা বলিল "জীবন সর্বস্বধন, প্রাণেশ্বর, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু আজ আমার বড় আনন্দ। আজ তোমার সেই মুখ, যে মুখ, আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান, সেই মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব।"

কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, প্যারী ভীত হইয়া বলিলেন "কমলা।"

কমলা চক্ষু সঙ্কোচ করিয়া কহিল "অ্যাঁ।"

কমলার মস্তক ঢলিয়া পড়িল, বলিল "জল।"

প্যারী কমলার মুখে জল দিলেন, ক্ষণেক পরে কমলা আবার বলিতে লাগিল "এ জীবনে যন্ত্রণার সীমা ছিল না, বুঝি ঈশ্বর এতদিনে তাহার শেষ করিলেন। প্যারী, আমি যাই, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর সতীত্বের মহিমা থাকে, তবে জন্মান্তরে তুমি আমার হইবে।" কমলা প্যারীর হস্তদ্বয় বক্ষে ধারণ করিল।

প্যারী। ওকি কথা কমলা।

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল "কি কথা ভাই, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কি বাঁচিতে সাধ হয়, তুমি কি বাঁচিতে বল?"

প্যারী কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা বলিল "প্যারি আর কেঁদ না—উঃ। জল।" প্যারী জল দিলেন, কমলা জলপান করিয়া আবার বলিল "ঈশ্বরের নিকট অকপট চিত্তে অন্তিমকালে এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় সুখে রাখেন। আর বলি, দয়াময়! আমার ন্যায় যেন কোন রমণী ক্লেশ ভোগ না করে। যেন নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অন্ধ সমাজের জ্ঞান হয়, অবলা নিধনের পাপ বুঝে—জল—"

প্যারী আবার জল দিলেন, কমলা জল গলাধঃকরণ করিতে পারিল না। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, প্যারী ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিল "কমলা!" কমলার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিল। প্যারী কমলার সেই তপনতাপ পরিশুষ্ক মৃণালসম দক্ষিণকর ললাটে রক্ষিত করিয়া, আবার ডাকিল "কমলা!" কমলার নেত্র ঊর্দ্ধদিকাশ্রয় করিল। প্যারী কমলার বক্ষে হস্ত দিলেন,

দেখিলেন, বক্ষ স্পন্দহীন। নাসিকা মূলে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস নাই। দেখিতে দেখিতে কে যেন সেই সোণার অঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিল। প্যারী চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামমোহিনী "মা কমলা কি করিলি মা, এ দুঃখিনীকে ফেলে কোথা গেলি মা" বলিয়া আছাড়িয়া ভূমিতলে নিপতিতা হইয়া সংজ্ঞা ভ্রষ্টা হইলেন। প্রেয়ময়ী হরিদাসী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। রামধন স্তম্ভিতের ন্যায় স্থিরভাবে দাণ্ডায়মান রহিলেন। প্যারী সোৎসুক নয়নে বিকল হৃদয়ে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মনে করিলেন, কমলার হয়ত মোহ হইয়াছে, এখনি তাহা তিরোহিত হইবে। কিন্তু প্যারীর সে আশা পুরিল না, কমলা জন্মের মত সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। সেই কনকলতা জন্মের মত শুষ্ক হইল। প্যারীর আশালতা দলিত হইল। রামধন ও শ্যামমোহিনীর ইহজীবনের একটী মাত্র স্নেহাধার জন্মের মত তাঁহাদের স্নেহপাশ উচ্ছেদ করিল। কমলা সমাজের হুহুঙ্কার ও অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। দয়াময়! তুমি অবলার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে কি? কমলার সজল নয়ন তুমি দয়া করিয়া মুছাইবে কি? যে সন্তপ্ত হৃদয় পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন কেহই সান্ত্বনা করিতে পারে নাই, শান্তিময়! তোমার অতুল দয়া বিনা আর কিছুতেই তাহা শান্তিলাভ করিতে পারে না। তোমা বিনা আর কে অবলার নয়নজল মুছাইয়া দিবে, ভারতের চির নিপীড়িতা পরিলাঞ্ছিতা অবলা বিধবাগণের দুঃখে আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে?

সমাপ্ত।

প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতাই মনুষ্যের প্রকৃত পুরুষার্থ ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যদি এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সকল জীব-প্রধান মানবের অবস্থা আজি কি হইত কে বলিতে পারে? প্রতিযোগীতারূপ বীজ সকল মনুষ্য অন্তরেই নিহিত আছে বলিয়া আজি মানব পৃথিবীর অধীশ্বর, আজি তাহার প্রতাপের নিকট কেহই তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, প্রতিযোগিতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে উন্নতি কামনা সকল মনুষ্যেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে সংযোজিত আছে বলিয়াই আজি তাহার এতাদৃশ অমানুষিক কার্য্যকলাপ—একরূপ অলৌকিক কীর্ত্তিমালা—এমন অত্যদ্ভুত শিল্পচাতুরী পরিলক্ষিত হয়। যদি ইহা মনুষ্য অন্তরে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তাগমেও মনুষ্যে ও বন্যপশুতে কোন প্রভেদ থাকিত কিনা সন্দেহ স্থল ও তাহা হইলে আজিও মানবকুল নিরীহ মৃগকুলের ন্যায় ভয় চকিত চিত্তে, বন হইতে বনান্তরে—স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত কিনা কে বলিতে পারে? কিম্বা দুর্দ্দান্ত, হিংস্র শ্বাপদগণের বিকট দশনে নিষ্পেষিত হইয়া তাহাদের লোলজিহ্বার কিয়ৎ শান্তি প্রদান করতঃ এতদিন ধরণীতল হইতে আপনাদের নাম বিলুপ্ত করিত কিনা তাহাই বা কে বলিবে? যদি এই প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি মানব-হৃদয় অধিকার করিতে না পারিত তাহা হইলে মনুবংশের নাম পর্য্যন্তও আজি থাকিত না, মনুষ্য ভোগ্য এই অমৃত প্রসবী ধরাধাম তাহা হইলে এতদিনে সম্পূর্ণরূপে পশু ভোগ্য হইত, দুর্দ্দান্ত সিংহ ব্যাঘ্র ইহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিত, কিন্তু কাহার ভাগ্যে এই অমৃতভোগ ঘটিত তাহার নিশ্চয়তা কি? সিংহ ব্যাঘ্র, দ্বীপি, ভল্লুক সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অনুপ্রাণিত; যদি প্রতিযোগিতাই না থাকিত, তাহা হইলে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব কাহার উপর ন্যস্ত হইত এ কথা কে বলিবে? প্রতিযোগিতার জন্যই যে বৃহৎ অরণ্যে পশুরাজ বাস করে তথায় অপরাপর ইতর প্রাণী তিষ্ঠিতে পারে না।

এই প্রতিযোগিতার জন্যই একজন অন্যজনকে ভয় করে; না হইলে ভয়ের কারণ কি? যদি ইহা কোন জীবেরই অন্তরে জাগরুক না থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে বাসকরা সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য হইত, কে বলিবে? তাহা হইলে আমার বিবেচনায় মনুষ্য কখনই বাস করিতে সমর্থ হইত না; কিন্তু যদিও বাস করিতে পারিত, তবে তাহারা ইতর প্রাণী হইতে কোন অংশেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না,—বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে বেড়াইয়া বেড়াইত—আহারের নিমিত্ত তাহাদেরই ন্যায় অরণ্যের স্বচ্ছন্দজাত ফল-মূল আহরণ করিত, এক কথায় মনুষ্য তাহা হইলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিত না, ও তাহার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইত না, মনুষ্যকুল এতদিন নির্ম্মূল হইত। সেই জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা এই বীজ সকলজন্তুরেই বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন, প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি এই জন্যই সকল প্রাণী-হৃদয়ে সমভাবে একসূত্রে রাজত্ব করিতেছে। এই প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ, ইহা কেহ বলিয়া দেয় না—এ বিষয়ে কেহ শিক্ষা প্রদান করেনা, ইহা আপনা হইতেই প্রাণী হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে স্থান প্রাপ্ত হয়, স্থান পাইয়া ইহা প্রথমে অলক্ষিত ভাবেই মানব হৃদয়ে কার্য্য করিতে থাকে, ক্রমে ইহার প্রসর যত বৃদ্ধি হয়, ইহার কার্য্য করী ক্ষমতা, ততই প্রাণীকে ইহার চরিতার্থ সাধনে প্রোৎসাহিত করে; যাহারই প্ররোচনায় মানব নানাবিধ দুঃসাধ্যকার্য্য ক্রমে সুসাধ্য করিয়া আপনার সুখের পথ প্রশস্ত করিয়া লয়, সুখেচ্ছা মনুষ্য হৃদয়ে—মনুষ্য কন সকল প্রাণী-হৃদয়ে সমান বলবতী,—সকলেই সুখ প্রাপনার্থ নানাদিকে প্রধাবিত, সুখ কামনা বিরহিত প্রাণী এই সব জগতে সুদুর্লভ, যে যেমন, সে সেই রূপেই সুখ পাইবার নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুখ পাইতে হইলেই প্রতিযোগিতা চাই, সুখের সহিত প্রতিযোগিতা জড়িত আছে, একের অভাবে অন্যের প্রত্যবায়, একের আগমনে অন্যের অভিমান।

মনুষ্য উন্নতি প্রিয়জাতি, তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই উন্নতি কামনা রূপ-বীজ নিহিত আছে, কিন্তু উন্নতির প্রধান সহায় প্রতিযোগিতা ও বর্দ্ধনা কাঙ্ক্ষা। এই দুই যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবকুল কখনই উন্নতির অত্যুচ্চ তোরণে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইত না। পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে, অদ্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত সময় পর্য্যন্ত, যদি মনুষ্য হৃদয়ে প্রতি

যোগিতা ও বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা না থাকিত, তাহা হইলে আজিও মানুষে ও বন মানুষে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হইত না, তাহা হইলে কোথায় থাকিত সুষমা-হর্ম্ম্য রাজির বাহার শোভা, আর কোথায় থাকিত পুষ্পিত প্রমোদ কাননের পবিত্র প্রভা? কিছুই না, মনুষ্যগণ তাহা হইলে বনে বনে বনচরের ন্যায় বনবাস করিত—তাহাদেরই ন্যায় আহার অর্জ্জন সমুদায়ই সম্পাদিত হইত। সকল ইতর প্রাণির আপনাপন প্রয়োজন মত অস্ত্র আছে, সিংহ ও ব্যাঘ্রের নখর ও দশন,—গণ্ডারের খড়্গ, মহিষ হরিণের শৃঙ্গ এমন কি সামান্য পতঙ্গটী পর্য্যন্ত নিজ নিজ অস্ত্রে সুসজ্জিত, মনুষ্যের কিছুই নাই, ইহার অস্ত্রের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি আছে, এবং বুদ্ধির অনুজ্ঞা মত অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা আছে; সেই বুদ্ধিই প্রতিযোগিতা কামনা ও বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। মনুষ্যের আদিম সমাজে—যখন তাঁহারা পশুর ও বৃক্ষের ফল মূল আহরণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন তখন প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাঁহারা কখনই জীবিত থাকিতে পারিতেন না, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াই তাঁহারা মৃগ শিশুকে তাহার জননীর নিকট হইতে আনিয়া উদর পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন। এই প্রতিযোগিতা ও বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা বশতই তাঁহারা ইতর প্রাণী হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য বনসীমার বহির্ভূত কোন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ এই দুই প্রবৃত্তির প্ররোচনাতেই তাঁহারা অপর প্রাণি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রতিযোগিতাতেই মানব সমাজের সৃষ্টি,—মানব জগতের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অন্তে প্রতিযোগিতা, মানবজাতি অনবরত উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, কিন্তু মনুষ্য সর্ব্ব সময়ে আপন জ্ঞানে এই প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিতে পারে না, অথবা তিনি তৎকর্ত্তৃকই সতত পরিচালিত। "আমি মন্দ বুঝি না, বা আমার ধারণা মন্দ নহে" একথা সকলেই আড়ম্বরে বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিযোগিতাই যে এই কথার মূল তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। যে যাহা বলে বলুন, কিন্তু আমি যাহা মনে ধারণা করিয়াছি আমি তাহা কখন ছাড়িতে পারিব না। মনুষ্যের এবম্বিধ ইচ্ছাই তাহার সকল উন্নতির মূল। পিতার ইচ্ছা পুত্র বড় হউক, আমা হইতে পণ্ডিত বুদ্ধিমান বা সকল বিষয়েই

তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া পরাস্ত হইলেন। তাই ঐ দেশ রাজার ছিন্ন মস্তক আজি প্রজার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত, মহাবীর জর্জ ওয়াসিংটন প্রজা সাধারণের বলের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাপরাক্রমশালী ব্রিটিস সিংহের বিকট মুখ ব্যাদনের সময়েও, তাঁহার লোলজিহ্বায় হস্ত প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ব্রিটীষ সিংহ তখন আপনার গৌরবেই গর্ব্বান্বিত—আপনার শক্তিতেই বিশ্বসিত, তাই তখন প্রজা শক্তির পরিমাণ করিবার ইচ্ছা হয় নাই, তাই এই দেশ ব্রিটীষ সিংহ এতাদৃশ লাঞ্ছিত—বিধ্বস্ত অপমানিত পীড়িত হইয়াও, লম্বদেহী লম্বপদী বীরবৃন্দের স্বাধীনতা আকার করত আটলাণ্টিক পার হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমুদ্যত। মহর্ষি গারিবল্ডী ইটালীর আভ্যন্তরীণ বল প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই অনেক দিনের পর জননী ইটালী ভূমি সবলা সাজিয়া উঠিল। এইরূপ পৃথিবীর যে কোন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করনা, তাহাতেই এই প্রতিযোগিতার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, প্রতিযোগিতা শূন্য কোন মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে কখন সংসাধিত হয় নাই। বুদ্ধদেব যে মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাও সেই প্রতিযোগিতা, তিনি জ্ঞানমাত্র লইয়া ব্রাহ্মণগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে—সাধারণ লোকের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যিশুখৃষ্ট এই প্রতিযোগিতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই সেডিউসিস্ ও ফারিসিস্ গণকে এক শাসনের অধীনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব এই মহামন্ত্রের বশীভূত হইয়াই তান্ত্রিকগণের অনাচারের অসারতা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, লুথার যে ধর্ম্মসংস্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহারও মূলে পোপের প্রতিযোগিতা এই জন্যই তিনি পোপ প্রেরিত আদেশ (Papal Bull) দগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ পৃথিবীর যে কোন হিতকর কার্য্য দেখিবে তৎসমুদায়েরই মূলে এই মহামন্ত্র। ইংরেজ রাজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী আজি যে ভারত বক্ষোপরি উড্ডীন হইতেছে তাহারও ইহাই মূলসূত্র, এইরূপে দেখিবে কোন কার্য্যই এই প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি শূন্য নহে, আবার প্রতিযোগিতার এই সুন্দর ফল সন্দর্শনে সকলেই ইহাতে নিমজ্জিত—সকলেই ইহার অনুসেবক। ইহা হইতে কখনই কোন কুফল

উৎপন্ন হয় নাই—যদি উপস্থিত সময় উহা হইতে কোন সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বক্তব্য নহে ; এই ঘটনার শতবৎসর পরে সেই সমাজের যে সুখময় ফল ফলিবে, ইহা হয়ত তাহারই সূত্রপাত দেখিব।

পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতিই এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত, সুতরাং নির্জ্জীব বঙ্গবাসীও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না, তাঁহারও সকল কার্য্যেরই মধ্যে প্রায় এই প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান, কিন্তু বাঙ্গালী কোমল প্রকৃতিক তাই কোমল বিষয়েই বাঙ্গালার প্রতিযোগিতা অগ্রে প্রধাবিত। ধর্ম্মের ন্যায় নীতিপূর্ণ কোমল বিষয় আর কি আছে? তাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রতিযোগিতায় বঙ্গবাসী অদ্বিতীয়—তাই রামমোহনের পবিত্র নাম আজি সমুদায় সুসভ্য জগতে বিঘোষিত হইতেছে। আজি বাঙ্গালী আর জগতের সমক্ষে "জাতি" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাহারও কারণ এই কোমল প্রতিযোগিতা। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালীর এমন কোন কার্য্য ছিলনা, যাহা লইয়া তিনি জগৎ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারেন—যাহা লইয়া তিনি গৌরব করিতে পারেন সেই বাঙ্গালী এক্ষণে আর তত ঘৃণিত নহেন। সেই বাঙ্গালী এই অল্প দিনের মধ্যে এমন এক কার্য্য সাধন করিয়াছেন, যাহা লইয়া তিনি সগৌরবে পৃথিবী সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারেন তাহা এই কোমল প্রতিযোগিতার ফল। বঙ্গবাসী আপনার সাহিত্য লইয়া জগৎ সমক্ষে অনায়াসে গৌরব করিতে পারেন, স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তাঁহারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এমন পৃথিবীর অন্য জাতি পারিয়াছে কিনা সন্দেহ, যাঁহার যে জাতি এত অল্প দিনের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ যশপ্রভা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে জাতির ভবিষ্যৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নহে। এক্ষণকার বঙ্গবাসী আর তত কোমল প্রকৃতির নহে, শতাধিক বৎসর বলবান জাতির সংঘর্ষে বঙ্গীয় সমাজে কথঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছে, সুতরাং বঙ্গবাসীর ইদানীন্তন প্রায় সমুদায় কার্য্যই কিঞ্চিৎ বল মিশ্রিত কোমল, তাই যে বাঙ্গালী পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে কোন ইংরাজ দেখিলে, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত, কিম্বা গৃহের সমুদায় অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিয়া রমণীর বসনাঞ্চল মধ্যে লুক্কায়িত হইত, আজি সেই বাঙ্গালী সহস্র ইংরেজের সমক্ষে খাস ইংরাজের বাসস্থান মহানগরীর প্রধান গৃহে

যাহারই অযথা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত, আবার শুধু তাহাই নহে, আজি সেই বাঙ্গালী আর ইংরাজের মাতৃভূমি—স্বাধীনতার খনি ইংলণ্ডে যাইয়াও ইংরাজের নিকট তাঁহাদেরই ভারতস্থিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবগণের অযথা কার্য্যের দোষকীর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। প্রতিযোগিতাই ইহার মূল। আজি যে প্রশান্ত ভারতবর্ষ এক দিন লইয়া মহা আন্দোলিত হইতেছে—ইংরাজ সমাজ হইতে ভয়ানক প্রতিযোগিতা প্রাপ্ত হইতেছেন, বাঙ্গালী এ সময়ে নিরস্ত থাকিতে পারিবেন কেন? তাই আজি ভারতীয় ইংরাজ ও ভারতবাসী এই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। একের যুক্তি নিশ্চয় বালুকা রাশির উপর স্থাপিত, অন্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ম্মিত, একের লক্ষ্য রাজার বিরুদ্ধে—অন্যের উদ্দেশ্য রাজার আজ্ঞাপালনে, রাজাজ্ঞার বিষময় ফল প্রমাণ করণার্থ একদল বদ্ধ পরিকর—তাহার অমৃতময় ফল দেখাইবার জন্য অন্যদল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়া দুইদল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। বঙ্গবাসী ইতিপূর্ব্বে আর কখনই এরূপ সমরে প্রবৃত্ত হন নাই, এ বিষয়ে ইঁহার এই প্রথম উদ্যম, ইহার প্রসারও অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যদি এত বিস্তারের পরও ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত রম্যফল সঙ্ঘটিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্তরের সুরমা অভিলাষ—মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা বীজ—তাঁহাদের অন্তরেই বিলীন হইয়া যাইবে, আর কখনও উদ্দীপিত হইবে কি না কে বলিবে? এমন শুভ সুযোগ ঘটিয়াও, ইহা যদি কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি এক্ষণেও সুদূরে অবস্থিত। তাই বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য—জাতীয় বল উজ্জীবিত করিবার জন্য এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা প্রয়োজনীয়, না হইলে বাঙ্গালী আর কখন সহজে এইরূপ অসম সমরে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করিবে না, কাজেই তাহার উন্নতির পথ ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে। সেই জন্যই ইহাতে জয়লাভ করা বঙ্গবাসীর ভারতবাসীর প্রার্থনীয় পদার্থ হওয়া কর্ত্তব্য, ইহার জয়ের সহিত ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ আশা জড়িত আছে, সুতরাং ইহা বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়; এবং সেই জন্যই বলি যে সকল স্বদেশবাসী ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান—যাঁহারা ইহার এই অমৃত

ফল লক্ষ্য করিতেছেন না, তাঁহারা আপনার দেশের, সমুদায় ভারতের ঘোর শত্রু। তাঁহারা স্বর্গ হইতেও গরিয়সী জন্মভূমির মঙ্গল দেখিতে ভাল বাসেন না—তাঁহারা ঘোর স্বার্থপর আপনার নীচ স্বার্থলাভেই বিজৃম্ভিত, তাহাতেই ইহার পরিণামে অমৃতময় ফল তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না; তাঁহাদিগকে শত ধিক্।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

পাঁচুর পাগ্‌লামী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাঁচু সহরে।

বর্ষাকাল—দেশভ্রমনের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, তাও বটে আর পাঁচু ইতিহাসে, জীবন চরিতে সংসার এবং মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিয়াছিলেন একবার একদিনের জন্য পল্লীগ্রামে গিয়া যে দু একটী কার্য্য দেখিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামের লোকের স্বভাব, আচার ব্যবহার রীতি নীতি যতদূর দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে জগৎসংসারকে চিনিতে হইলে, সংসার চিত্র দেখিতে হইলে সমাজ মিশ্রিত হইতে, এবং সংসারের বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত দেখা শুনা কথা বার্ত্তা আত্মীয় অন্তরঙ্গতা ভাল করিয়া রাখিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লোকের সহিত যত ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে যতদূর তাহাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারা যায় ততদূর তাহাদিগকে চিনিতে সমর্থ হওয়া যায়। মনুষ্যই সমাজের ও সংসারের প্রধান উপাদান, সংসার চিনিতে হইলে, অগ্রে ভাল করিয়া মনুষ্যকে চিনা আবশ্যক। পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনাতিবাহনের দুইটী পথ—সংসার ও সন্ন্যাসাশ্রম। তন্মধ্যে প্রথমাশ্রমটী মনুষ্য জন্মে অপরিহার্য্য। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উহাকে অবলম্বন করিতে হয়। জগতের মধ্যে কেবল একজনের মাত্র নাম শুনাযায় তিনি নাকি জননী জঠর বিনির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই যোগাভ্যাস জন্য বন প্রয়ান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা ন্যায় যুক্তির নিতান্ত বিরোধী বলিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ মাত্র সংসারে অবস্থিত, সংসারে লালিত পালিত, যতদিন জ্ঞানজ্যোতি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ না পায়, যতদিন না সদসৎবিবেচনা শক্তি জন্মে, ততদিন মনুষ্যকে সংসারাশ্রমে থাকিতেই হইবে। সত্য বটে যতদিন তিনি না সংসার মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হয়েন ততদিন তাহাকে সংসারী বলি না, কিন্তু তা বলিয়া সংসার প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাকে সন্ন্যাসীও বলিতে পারি না। অতএব যে সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, যাহাকে অবলম্বন করিয়া, জীবনের ভাবী সুখ দুঃখের বীজ বপন সময় বাল্যকালে ক্ষেপণ করিতে হয়, সে সংসার উপেক্ষার সামগ্রী নয়, তাহার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। আশ্রমান্তর অবলম্বন করিতে হইলেও মনুষ্যকে অত্রাশ্রমের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচুর সংসার ও মনুষ্য সমাজ দেখিবার বড়ই কৌতুহল জন্মিল, আমাদের পঞ্চানন, এখন হইতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব দিগের বাটীতে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করিলেন, সকলের সহিত প্রফুল্লমনে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে, যে কোন প্রকারে সংসারের ভূয়োদর্শনের অধিকারী হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে বিডেন্‌ ও ইডেনোদ্যানে ভ্রমন করেন, ব্রাহ্মসমাজে, থিয়েটরে যাতায়াত করেন। রাস্তার ধারে খৃষ্টান মিসনরীদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবন করেন, যেখানে সংসার শিক্ষা আছে, সেই খানেই যান সেই খানেই থাকেন। একদিন পাঁচু সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মাঠে বেড়াইতেছিলেন; বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্তি জন্মিলে তিনি লর্ড ডালহৌসীর পাষাণ মূর্ত্তির নিকট সবুজ ঘাসেঢাকা ঢালু জমিতে বসিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির পদতলস্থ স্তম্ভের

পার্শ্বলিখিত ডালহৌসীকীর্ত্তি পান করিতে করিতে বিরার, নাগেশ্বর এবং অযোধ্যার দুর্গতি ও ললাটলিপির অখণ্ডনীয়তা আর সেই সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য বংশের শৌর্য্য সংরক্ষিত ভারতের অধঃপতন চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে একজন পাঁচুর চক্ষু টিপিয়া ধরিল। পাঁচু আপন হাতে অগন্তুকের হাত ধরিলেন, মুখে হাত দিলেন, ঠাওরাইতে পারিলেন না, বলিলেন "হারি মানিলাম" এই কথা মাত্রে তাঁহার চক্ষু খুলিল; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন কেহ নাই, উঠিয়া প্রস্তর মৃত্তিকার স্তম্ভের চারিদিকে ঘুরিলেন কাহাকেও দেখিলেন না, ক্ষণেক কাল দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন এমত সময়ে সম্মুখে একটী যুবা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন "পাঁচু বাবু মনে পড়ে?" পাঁচু বেশ ঠাওরাইতে পারিলেন না, একটু চকিতচক্ষে স্থির থাকিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা বড়—"

আগন্তুক "সেই হিন্দুস্কুলে।"

পাঁচু। হাঁ হাঁ আপনার নাম বিনোদ বাবু নয়!

বিনো। আজ্ঞা হাঁ।

পাঁচু। এখন কোথায়!

বিনো। এখন কর্ম্ম কাজ করছি।

পাঁচু। কোথায় কি কাজ করচেন?

বিনো। সদাগর আপিসে মুচ্ছুদ্দীর কাজে আছি, দু তিন টা হাউস আছে। পাঁচু বাবু, ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবদিগে এখন দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা যায়। আপনাদের বাড়ী ত অধিক দূর নয় এক এক বার দেখা শুনা হইলে বড় সুখী হওয়া যায়।

পাঁচু। আজ্ঞা হাঁ, পূর্ব্বে আমার এরূপ ছিল না, কেবলই ঘরে থাকিতাম, আজি কাল আর দুজন একজন ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা শুনা কথা বার্ত্তা না করে সুখী হওয়া যায় না।

বিনো। চলুন আজি আমাদের বাড়ী যাই?

পাঁচু কোন আপত্তি করিলেন না। বিনোদ তাঁহার হাত ধরিয়া আপন ফিটেনে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী খানি ঘর্ঘর্ শব্দে ছুটিয়া বিশ মিনিটের মধ্যেই বিনোদ বিহারী বাবুর সিমলার বাড়ীর গাড়ী বারান্দায়

আসিয়া লাগিল। বাড়ীটী দেখিয়া পাঁচু বিনোদকে ভাল করিয়া চিনিলেন, তাঁহার পাঠদ্দশার স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল, বিদ্যালয়ে আসিয়া পাঁচু অনেক সময় বিনোদদের বাটীতে আসিতেন, বিদ্যালয়ের অবকাশ কাল এই বাটীতেই কাটিয়া যাইত। পাঁচু বিনোদ বিহারী দিগের পরিবারে এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে বাটীর ভৃত্য স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে চিনিত। বিনোদ বাল্যকালে বড় কৃশছিলেন বয়োপ্রাপ্ত ও মনের সুখসাচ্ছন্দ্য হেতু বিনোদের আকার প্রকারের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সময়, মন এবং অবস্থার গতিকে মনুষ্যের দেহ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের পাড়ায় রামা তেলির ছেলে রাখা লোক দশবৎসর পূর্ব্বেও যেমন ময়লা ময়লা পাকাটে পাকাটে চেহারা দেখিয়াছি আজিও সেইরূপ দেখিতেছি। আর গোপীগজেন্দ্রপুর রাজ্যের নিম্নদেশের রাজা রায় মকরধ্বজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দীনেন্দ্র নারায়ণকে আজি দেখিয়া তাঁহার পরবৎসর দেখিলে চিনিতে পারি না। সে কি আমাদের চক্ষুর দোষ? দীনেন্দ্র নারায়ণের দোষ না দীনেন্দ্রের সময় এবং ভোগৈশ্বর্য্যের দোষ? আমরা বৎসরের পরে দীনেন্দ্রকে চিনিতে পারি না, পাঁচুও সেই দোষে বিনোদকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই, পাঁচু মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন যে বাল্য সহচর বিনোদকে এতক্ষণ ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছিলেন না। পাঁচুর কুণ্ঠিতভাব দেখিয়া বিনোদ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। পাঁচুর কুণ্ঠিতভাব দূর করিবার জন্য বিনোদ পাঁচুকে অধিকতর যত্ন সহকারে আপন বৈটক খানায় লইয়া চলিলেন আর যাইতে যাইতে বাল্যকালের নানাম্ কথায় তাঁহাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন। দুই বন্ধুতে বৈটক খানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তিনটী যুবা তথায় বসিয়া আছেন, বিনোদকে দেখিবা মাত্র তিন জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন well gentleman আমরা অনেক ক্ষণ তোমার জন্য wait করছি, বিনোদ যত্ন সহকারে পাঁচুকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন; অনেক দিনের পর একজন বাল্য বন্ধুকে পাইয়া উঁহাকে আনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে এজন্য আপনাদের কাছে pardon চাইছি। অপর তিনটী যুবাই পাঁচুর মুখ পানে চেয়ে বিনোদের

মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে পাঁচুর পরিচয় চাহিলেন। বিনোদ তাহা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বেঙ্গল আফিসের প্রফুল্লানন বাবুকে বোধহয় জানেন, ইনি তাঁহারই সর্ব্ব কনিষ্ঠ নাম পঞ্চানন আমার বাল্যবন্ধু——বাল্যকালে সর্ব্বদাই প্রায় একত্রে থাকিতাম, আজি কয়েক বৎসর ছাড়া ছাড়ি! পাঁচুর দিকে চাহিয়া বলিলেন আপনার স্মরণ আছে কিনা বলিতে পারিনা আমরা যখন Eighth year ক্লাসে পড়ি, তখন শিবপ্রসাদ বাবু যিনি Ninth year ক্লাশে পড়িতেন, শেষ তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেনিতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Scholarship পান (১ম বাবুটির দিকে চাহিয়া) ইনি তাঁহার কনিষ্ঠ নাম রাধা প্রসাদ, ইনি একটী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, বাঙ্গালা ইংরাজী বেশ লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় ফার্ষ্ট্ আর্টস পরীক্ষায় ফেল হওয়ায়, অগত্যা কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। (২য় বাবুটীর দিকে চাহিয়া) ইনি একজন বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি plucked B. A. ইহার সহিত কার্য্যোপলক্ষে পরিচয় এক্ষণে Bengal office এ কাজ করেন, সংপ্রতি Shakspeare রের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছেন—এছাড়া অনেক ইংরাজী বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় রীতিমত লিখিয়া থাকেন। আর তৃতীয় বাবুটীকে আপনি ভাল চিনিবেন না উনি বর্দ্ধমান জেলার একটী স্কুলের টীচার ছিলেন Education department এ উন্নতির আশা বড় কম দেখিয়া Teachership ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টায় এখানে আসিয়াছেন——রাধা প্রসাদ বাবুর সহিত এক বাসায় থাকেন। এই রূপে সকলের পরিচয় দান সমাপন হইলে বিনোদ বাবু একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে পাঁচু ভিন্ন সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন সকলেই যেন সীতার বনবাসের দুর্ম্মখের ন্যায় রাম সমীপে জানকীর অপবাদ বার্ত্তা কথনে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়!

লেখকের টীকা——পাঁচু যাহা বলে আমি তাহা লিখি—অদ্য পাঁচু এই পর্য্যন্ত বলিয়া বলিল তাহার মাথা ধরিয়াছে। এত দোহাই দস্তুর পাড়িলাম পাঁচু বলিল আজি আর হইবেনা। ওরে সর্ব্বনেশে করিস্ কি পরিচ্ছেদ যে শেষ হইলনা লোকে বলিবে কি? উত্তর করিল "লোকে যাই বলুক লোক আমার ওড়িকলম, গোলাপজল নয় যে তাঁহাদের

তুমি আমি কে?

———oo———

এই ভৌর্য্যত্রিক ময় নানাবঙ্গের সংসার ক্ষেত্রে তুমি রাজা, আমি প্রজা, সে দরিদ্র ও ধনী, অমুক প্রভু অমুক ভৃত্য এই ভাবে আপনাপন অভিনীতব্য অংশ অভিনয় করিতেছে। রাজা আপন প্রসাদ শিখরে বসিয়া রাজভোগে আপনি অঙ্গপুষ্ট করিতেছেন, ভৃত্য তাঁহার অঙ্গসেবা করিতেছে। তিনি আপনার রাজ্যের উন্নতি কামনায় মস্তিষ্ক পীড়ন করিতেছেন, রাজ্য বিস্তৃতি, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, প্রকৃতি পুঞ্জের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আপনার সুকীর্ত্তি স্থাপনে প্রাণপণ করিতেছেন, বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হইতে আপন রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিতেছেন; সেই সঙ্গে রাজ্য বিস্তৃতির জন্য কতকি উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই দুর্ব্বিসহ রাজ্য ভার বহন করিবার জন্য তাঁহাকে কখন বিবাদের কঠিন হস্তে আত্মসমর্পন করিতে হইতেছে। রাজপ্রাসাদে রাজভোগে, দাস-দাসীর পরিসেবায় যেমন অতুল সুখে ইহজীবন সার্থক করিতেছেন আবার পরক্ষণেই তাঁহাকে ভীষণ শত্রুমধ্যে পতিত হইয়া

হতে আমার মাথা ছাড়িয়া যাইবে, আমি যেখানে থামিব সেই "পরিচ্ছেদ" পঞ্চানন শর্ম্মাকে নিরর্থক ভর্ৎসনা করবেন না; চিতের সুখে গীত, আজি পাঁচুর চিত্ত ভাল নহে।" পাঁচু সে কি গতিকের লোক পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। এরূপ লোকের কথা শুনিয়া কোন বিষয় প্রকাশ করিতে উদ্যত হওয়া মস্ত অপরিণামদর্শীর কাজ। তবে শুনিয়া ছিলাম লোকটা বেস লেখা পড়া শিখিয়াছে অনেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে, অবশ্য তাহার নিকট সংসারের অনেক রহস্য জানিতে পারাযাইবে. তা আজি আর কি করিব এবার হইতে সতর্ক হইব।

শ্রীজগন্নাথ চতুর্দ্ধুরীণ

সমরক্ষেত্রে আপন জীবনের জন্য অশ্রুপাত করিতে হইতেছে। রাজার রাজ ভোগ দর্শনে সকলে বলে রাজা সুখী, কিন্তু রাজাকে যখন আপন বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে হয়, তখন কেহ তাঁহার দুঃখ চাহিয়াও দেখে না বা মনেও চিন্তা করে না। রাজা সুখী বা দুঃখী সিদ্ধান্ত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। রাজা আপন রাজ্যভার বহনে সহজেই বিব্রত, কিন্তু তিনি আপন রাজ্য লইয়া প্রজাগুলি সুখে রাখিয়া সেই সঙ্গে আপনার সুখ সৌভাগ্য মানমর্য্যাদা, যশোকীর্ত্তি উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারই জন্য সংসারে আত্ম বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন। আমি এক জন সামান্য প্রজা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র নাই, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই শ্রম করি, স্বল্প অর্থে কষ্টে স্বষ্টে আপন ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ পোষণ করি, দিনান্তে আপনার পুত্র কন্যাগুলিকে হাসিতে খেলিতে দেখিয়া স্বর্গেরসুখ হাতে পাই—মনে করি আমার মতন সুখী আর পৃথিবীতে নাই, আবার যখন সেই সুখের পরিবারের মধ্যগত থাকিয়া অর্থাভাবে সেই সকল হাসি হাসি মুখগুলিকে সময়ে আহার মনের মত বসন ভূষণ না দিতে পারি, অথবা যখন তাহাদিগকে রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া রোগ যন্ত্রণাজনিত অস্থিরতায় ব্যাকুল করে, আমাকে আর্ত্তস্বরে সম্বোধন করে, তখন আমি জগৎসংসার অন্ধকার দেখি, আপন জীবন দিয়াও যদি তাহাদের রোগযাতনার উপশম করিতে পারি তাহার কামনা করি; আমি তখন যেন সংসারের মনুষ্য অপেক্ষাও কোন নিকৃষ্ট জীব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তখন হারাইয়া ফেলি। আমি এই সংসারে নানা রকমে নানাকার্য্যে নানা অবস্থায় হাসি কান্নায় বিভোর হইয়া পাগলের ন্যায় কত কি করিতেছি। দরিদ্র দারিদ্র্য যাতনায় ব্যাকুল হইয়া আপন জীবনের অসারতা এবং তজ্জনিত সংসারে থাকিবার নিষ্প্রয়োজনতা ভাবিতেছে, হা অর্থ যো অর্থ করিয়া সে পাগল, অর্থের জন্য সে কত পাপই কি করিতেছে, হায় অর্থ—বলিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতেছে। যিনি ধনী তিনি যে ইহজন্মতে কোন জাতীয় জীব তাহা বলিতে লিখিতে কম্পিত। তিনি যেন অন্ধ—ধনের জন্য তিনি আত্মজ্ঞান শূন্য স্বার্থান্ধ। তিনিই সংসার অভিনয়াঙ্গনের অনুরূপ অভিনেতা। তিনিই অভিনয়ে মজবুত, ধনের জন্য কখন দরিদ্রকে কাঁদাইতেছেন, মানীর মান সংহার করিতেছেন; শঠকে হাসাইতেছেন

নিরীহকে পীড়ন করিতেছেন। সংসারে তিনিই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহারই জন্য সংসার, তিনিই সংসারের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আর যিনি কর্ম্ম বলে প্রভূত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহার কথা কি বলিব, তিনি সংসারে এক অবতার। তিনি মনে করেন ভৃত্যগণ তাঁহার পালিত জন্তু, তাঁহার অনুমতি পালনের জন্যই ভৃত্যের জীবন—তিনি ইহ জগতে ভৃত্যের এক মাত্র উপাস্য দেবতা, এবং ভৃত্যের জীবন তাঁহারই বিলাসের জন্য ; তিনি আমোদ করিবেন আর ভৃত্য আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আমোদে দাসত্ব করিবে। এই সংসারে যে দিকে যাহার পানে তাকাই তাহাকেই দেখি যেন স্বার্থের জন্য বিব্রত ; যেন তেন প্রকারেণ, স্বার্থসিদ্ধি হইলেই হইল—জগৎ স্বার্থ পর বলিয়া স্বার্থপর ? ঘোর স্বার্থপর জগতের লোক স্বার্থের জন্য পাগল স্বার্থই জীবনের উদ্দেশ্য—স্বার্থই মনুষ্য জীবনে যেন একমাত্র সার পদার্থ। কিন্তু সে যে কে, আর তার নিজের অর্থ যে কি, তাহা লোক বুঝিতেছে না এই মহাদুঃখ ! তুমি আমি কি ? তোমার আমার ইহজগতে আসিবার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিলাম না—ইহা অপেক্ষা অনুতাপের বিষয় আর কি আছে ! ওহে রাজন্ ! ওহে ধনিন্ ! প্রভো, তোমাদিগেকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা এক একজন কে ? রাজন্ তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি বল দেখি তুমি কে ? বলিবে তুমি রাজা—দেশের অধীশ্বর, তোমার কথায় রাজ্য চলে, ধনী দরিদ্র হয়, দরিদ্র ধনী হয়, সংসারে তোমার অসীম ক্ষমতা, তোমার অনুকম্পা প্রত্যাশায় শতসহস্র লোক ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে—তুমি কে ? তোমাকে আমি চিনিতে পারিলাম না। ধনীকেও আমি জিজ্ঞাসা করি—আর প্রভুকেও জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে ? ইহসংসারে ধনী মানী রাজা প্রজা দরিদ্র কেন ? আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করি তোমরা কে ? তোমাদের আপনাপন ক্ষমতা কি ? হে রাজন্ ! আপনি পৃথিবীস্থ অধীশ্বর সর্ব্বাগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি বলুন দেখি আপনি কে ? তদুত্তরে আপনি বলিবেন আমি রাজা, আমি সকলের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, আমার অনুমতিতে সব হয়, ধনী দরিদ্র হয়—দরিদ্র ধনীহয়,—আমি সুখীকে দুঃখী এবং দুঃখীকে সুখী করিতে পারি, আমার আজ্ঞায় কি না হয় !' আচ্ছা রাজন্ তোমাকে তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল তুমি কে ? তুমি ইহ

সংসারে রাজা সত্য, তোমার ক্ষমতাও অটুট—কিন্তু তুমি আপনাকে চেন ? তোমার কথার ভঙ্গীতে বোধ হয় তুমি আপনাকে যেন চিনিয়াছ—কিন্তু আমার মতে—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় তুমি আপনাকে চিনিয়াছ কি না সন্দেহ—যদি তুমি আপনাকে চিনিতে যদি তুমি কে ইহা জানিতে পারিতে তবে তোমার এ অভিমান থাকিত না, যে আমি সকলের রাজা ; আমার আজ্ঞায় সংসার চলে আমি সকলের সুখ দুঃখের-নিয়ন্তা। কিন্তু তাহাই কি সত্য ? কে যে কাহার অদৃষ্টের নিয়ন্তা, কে যে কাহার সুখ দুঃখের বিধাতা কে বলিতে পারে ? তুমি যে তোমার স্বার্থের জন্য বিব্রত ; তুমি যে তোমার রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণপণ প্রয়াসী কিন্তু তুমি তাহাতে কি ? তোমার তাহাতে কি ? মনে ভাব দেখি তুমি যে দিন আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের জীবন সংশীয় পীড়ার প্রতিকার জন্য চিকিৎসকের অজ্ঞানুবর্ত্তী এমন কি দাসানুদাস বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হও না, তখন তোমার তোমাত্ব কোথায় থাকে ? তুমি রাজা—কিন্তু তোমার উপরিতন রাজা চিকিৎসক নয় ? মনে করিও ইহজগতে কেহ কেহ নয় ; কাহার কিছু নয়। তুমি রাজন্ তুমি যে আপনি রাজা, আপনার রাজ্য এই ভাবিতেছ ইহা কতদূর সত্য—আপনার বলিয়াই বলিতেছি অন্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, যেহেতু আপনিই সংসারের অধিস্থানীয় আপনাকে বলিলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে, সাধারণতঃ আপনাকেই আমি বলিতেছি আপনি কে ? আপনার রাজ্য আপনি রাজা এই বলিয়াই যদি অভিমান করেন তবে আপনাকে আমি কি বলি ! বস্তুতঃ আপনিই এক রাজা তা ত নয় ? আপনি যে লক্ষ্য মাত্র—বিশ্ববিধাতার এই বিশ্ব রাজ্যের আপনি একটী উপলক্ষ মাত্র, এই বিশ্বসংসারে রাজদণ্ড সম্বন্ধীয় আপনার নিকট উপযুক্ত উত্তর পাইয়াছি, আপনাকে আবার যখন জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কে ? তখন ইহার ভিতর একটু গুঢ়তত্ত্ব আছে ! আপনি কে ? না আপনিও যে, আমিও সে, শ্যামাপ্রসাদও সে, কাহাতে কিছু ভেদ নাই। কর্ম্ম কার্য্যে শ্যামাবামা, আমি আদরিণীর লেখক, আর আপনি আমাদের মাথার চূড়া রাজা, কিন্তু তথাপি সকলেই এক। রাজন্ ! আপনার পরিণাম কি আমার পরিণাম কি, আর শ্যামারাও বা পরিণাম কি ? পরিণামে সকলেরই এক

তুমিও মরিবে, আমিও মরিব, আর শ্যামাও মরিবে, আবার দেখ তোমার যে যন্ত্রণায় মৃত্যু হইবে, আমারও কি সেইরূপ যন্ত্রণায় মৃত্যু হইবে, আর শ্যামাও সেই প্রকার যন্ত্রণায় মরিবে, তবেই তুমি আমি শ্যামা সকলেরই ত পরিণাম এক। তোমার রাজ্য তোমার রাজসুখ আমার পরিবার আর আমার পরিবার সুখ, আর শ্যামার সংসার শ্যামার সংসারের সুখই হউক আর দুঃখই হউক এক রূপে সবি সমাপ্ত হইবে। তোমার সংসার আমার সংসার আর শ্যামার সংসার একইরূপে থাকিবেক তবে, তুমি কে ? আমার মহাদুঃখ যে তুমি আপনা চিনিলে না, আর তুমি আপনি ভাবিলে না যে তুমি কে। আমি তোমাকে স্থির করিয়া বলিতে পারি যে তুমি আমি এ সংসারের কেহই নই যখন আমরা ইহসংসার ত্যাগ করিব, হে রাজন্! তোমায় রাজার রাজভাব থাকিবে না—শ্যামার শ্যামাত্ব থাকিবে না আর আমারও আমিত্ব থাকিবে না। তুমি আমি কে, ইহজগতে কর্ম্মভোগ করিতে জন্মিয়াছি কর্ম্মভোগ করিব আর কর্ম্মভোগ করিয়া ইহসংসার হইতে প্রস্থান করিব। অতএব তোমার আমার সহিত সংসারে কোন সংশ্রব নাই। তুমি আমি সংসারে আসিয়াছি আসিয়া কাঁদিব বা হাসিব দুইদিন থাকিব তাহার পর কোথায় যাইব তাহার ঠিকানা থাকিবে না। সংসারের সহিত চিরসম্বন্ধ কার ? যাহার আছে, তাহাকে তুমি আমি চর্ম্মচক্ষে চিনি নাই, আমাদের আঁধারময় জ্ঞানে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনিই সংসারের সার ধন, তাঁহারই সংসার তিনিই আমাদের জীবন তিনিই আমাদের রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট তিনিই আমাদের সংসারের যাবতীয় লোকের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা। তাঁহার সংসার তাঁহার জগৎ তাঁহারাই তুমি আমি যেমন আসিয়াছি তেমনি যাইব তুমি আমি কেহই নয়।

আত্মদান বা বলিদান।

—oo—

পাঠক! বলিদান কাহাকে বলে জান কি? অনেকে হয়ত এই প্রশ্ন উত্থিত হইবা মাত্র বলিবেন জানি বই কি, কোন অস্ত্র দ্বারা গলদেশ দ্বিখণ্ড করিবার নাম বলিদান। এ কার্য্য সম্পাদন হইবা মাত্র আহূতের রক্তস্রাব হয় এবং ক্ষণকাল যাতনাসূচক চিহ্ন দেখাইয়া অনন্ত কালের জন্য অব্যাহতি পায়, প্রাণ অনন্তে মিশায়। এ বিশ্বসংসারের সকল বস্তু অনন্ত উদ্দেশে অনন্তাভিমুখে অনন্তকাল পরিচালিত হইতেছে, যদ্যপি বলিদানে সেই অনন্তলাভ হয় তবে বলিদান ত সুখের। কিন্তু তুমি বল বলিদান ভয়ঙ্কর আমিও বলি বলিদান ভয়ঙ্কর, কিন্তু তুমি যাহা বলিলে তাহা ভয়াবহ নহে। যাহাতে একেবারে নিবৃত্তি একেবারে পরিশেষ তাহা কখনই তত ভয়াবহ নহে।

যদ্যপি কাহাকেও ভাল বাসিয়া থাক, প্রাণে প্রাণে মনে মনে অন্তরে অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে ভাল বাসিয়া থাক, হৃদয়ের সহিত আত্ম সমর্পণ করিয়া থাক তবে তুমি বুঝিতে পারিবে যে বলিদান কি? এ বলিদান বড় ভয়ানক। তুমি একবার যদি সেই বলিদানের কুহক মন্ত্রে দিক্ষীত হও তবে আর তোমার নিস্তার নাই। এ বলিদান ফুরায় না। খড়্গ উঠিল ও নামিল কার্য্য সমাধা হইল, ইহাতে তাহা নাই, যতকাল বাঁচিবে, যতকাল একবিন্দু রক্ত তোমার ধমনীতে বহিবে ততকাল তোমার বলিদান ফুরাইবে না। আবার যদি হিন্দুশাস্ত্র মান যদ্যপি পরলোক মান যদ্যপি মৃত্যুর পর স্বর্গবাস অনন্ত সুখ কামনা কর তবে জানিও যে তোমার আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই, তোমার বলিদানেরও নিবৃত্তি নাই।

এ বলিদানে যেমন ভয়ও আছে তেমন পরিতৃপ্তিও আছে যদ্যপি একবার বলিস্বরূপে আত্মত্যাগ করিতে পারিলে তুমি পূর্ণকাম পূর্ণাঙ্গ। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধ, শতদুঃখ সত্ত্বেও সুখী। আর যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে তাহা না

পার তবে বলিদান বড় ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর দ্বিতীয় নাই।

যদ্যপি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে বলিদান দিতে পার তবে সুখও পাইতে পার। হৃদয়ে অনন্ত অসহ্য যাতনা নিরন্তর বিরাজমান থাকিলেও সুখ, সে সুখ বড় মধুর সে সুখ মনকে উন্নত করে, মনুষ্যকে পূর্ণাঙ্গ করে। আর যে তাহা না পারে তাহাকে আজীবন অনন্তপাবকে দগ্ধ হইতে হয়, সে মর্ম্ম জ্বালায় অস্থির হইয়া যায়। সে দহনের ইহজন্মে সান্ত্বনা নাই।

এ বলিদানের উচ্চ আদর্শ আয়েষা। আয়েষার তুল্য আত্মসমর্পণ বিরল। সুতরাং আয়েষার তুল্য সুন্দর বলিদান, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়েষা আত্মসমর্পণ করিল,—জগৎসিংহকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিল। সে ভালবাসা অতলস্পর্শি। সে ভালবাসা জগৎসিংহের ক্ষুদ্র প্রেমাধারে স্থান পাইল না, যে স্থান টুকু ছিল সেখানে তিলোত্তমার ভালবাসা বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং আয়েষা রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে আত্মসমর্পণ বড় মধুর। মধুর না হইলে সকলে তাহাকে মধুর বলে কেন? কিন্তু আয়েষা জানিত তাহা কত ভয়ঙ্কর। আয়েষা জানিত যে তাহা কত প্রাণ-দগ্ধকারী। আয়েষা সে বলিদানে যে যাতনা অনুভূত করিয়াছিল সে যাতনা প্রকৃত নামধারি বলিদানে নাই। কিন্তু আয়েষার প্রতি বিধি বৈরি বলিয়া আয়েষা এত যাতনা ভোগ করিয়াছিল, বস্তুতঃ আত্মসমর্পণে এত নিরাশা বড় বিরল। আত্মসমর্পণরূপ বলিদান সুখপ্রদ নহে তাহা নয়। তাহার যাতনা বড় মর্ম্মভেদি তথাপি প্রীতিকর। অনন্তকাল যাতনা ভোগ করিবে তথাপি ভালবাসিতে ছাড়িবে না, যে বস্তু অপ্রীতিকর তাহা ত্যাগ করা যায়, কিন্তু যাহা প্রীতিকর তাহা কদাচ ত্যাগ করা যায় না। প্রাণত্যাগ করিতে পারা যায় তথাপি প্রিয়বস্তু ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং যখন আত্মদান অনিবার্য্য তখন তাহা প্রার্থনীয় বলিয়া প্রীতিকর।

স্বর্গীয় প্রতিভ সম্পন্ন দেশদিমোনার বলিদান আরও সুন্দর, পামর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্রাক্ষণাদতার ওথেলো হত্যা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত, আঘাত করিল সাংঘাতিক আঘাত করিল, কিন্তু সতী পূর্ব্ববৎ প্রণয় ও প্রীতির

পূর্ব্বোচ্ছ্বাসে স্বামীকে পূজা করিল মনের কথা মনেই রহিল, ভালবাসা জন্ম প্রকাশ করিতে পারিল না, ইহাই প্রণয়ের, অপূর্ব্ব ভালবাসার জলন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু এ প্রণয়ের সূত্রপাত আত্মসমর্পণ হইতে, সুতরাং সে আত্মসমর্পণরূপ বলিদানের নিকট সকল উত্তেজনা পরাভূত হইল।

যদি বল আত্মসমর্পন প্রনয়ের পূর্ব্বরাগ বা সূচনা মাত্র তবে প্রণয়ে ও আত্মসমর্পণে প্রভেদ কি? প্রণয়ে শুধু পরস্পরে ভালবাসা, তাহাতে স্বার্থ প্রতিদান প্রতিগ্রহণ প্রভৃতি সমস্তই থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মসমর্পণে তাহা নাই, আত্মসমর্পণ, আপনা বিস্মৃত হওয়া, আপনার বিষয় ভুলিয়া পরের হওয়া, ইহা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বতন্ত্র বস্তু। আত্মসমর্পণে প্রণয় আছে কিন্তু প্রণয়ে আত্মসমর্পণ না থাকিতে পারে, তাই বলি সেই আত্মসমর্পণের নৈরাশ্য অপেক্ষা ঘোরতর হৃদয়বিদারী বলিদান আর ইহজগতের কোথায় সম্ভবে? সে বলিদানের তুল্য বলিদান আর কি থাকিতে পারে? ইহা হইতে অব্যাহতি নাই, চিরকাল মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে হয়, সে মর্ম্মপীড়া অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশসাধ্য বস্তু ইহজগতে আর কি থাকিতে পারে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ভারত সুহৃদ—মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভারত-সুহৃদের অনেকগুলি লেখা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিলেই আমরা পত্র খানির আবির্ভাব সার্থক জ্ঞান করিব।

নীলিমা (উপন্যাস) সারস্বত যন্ত্র কলিকাতা।

আমরা এ উপন্যাসখানির গুণ অপেক্ষা দোষই অধিক দেখিলাম। গ্রন্থকার একস্থানে একটী গীত মধ্যে লিখিয়াছেন—

"আমি ধল্লাম জড়ায়ে আমায় দাও'না * * দান।
* * * ভিতর * * রেখে দেও জড়ায় করি পান।"

যিনি এরূপ অশ্লীলতাপূর্ণ অরুচিকর জঘন্য পুস্তক লিখিতে পারেন আমরা তাঁহার পুস্তক সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের প্রিয়ভগ্নি শ্রীমতী সাধারণী ইহার সমালোচনায় লিখিয়াছেন "এখনও লেখকের হাত পাকে নাই" ইহা সাধারণী বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি রসিক লেখকের যে হস্ত হইতে এত রসের ছড়াছড়ি হইয়াছে সে হাত আর না পাকিয়া তাহাতে পক্ষাঘাত হউক।

মনুসংহিতা ও কুল্লুক ভট্ট। ভূতপূর্ব্ব আর্য্য প্রতিভা সম্পাদক শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্র। মূল্য।০ আনা

পুস্তক খানিতে মহর্ষি মনুর মতের সহিত কুল্লুক ভাট্টর মত তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে, আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার যে সকল যুক্তিদ্বারা আপন মতের পোষকতা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। সংক্ষেপে ইহার ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে গ্রন্থকারের অসীম শ্রম অধ্যবসায় যত্ন, বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইতেছে। গ্রন্থের ভাষা পরিষ্কার পরিপাটী এবং নির্দ্দোষ।

কিরণ—পদ্যময় মাসিক পত্র, নারার ভারত সুহৃদ যন্ত্রে মুদ্রিত।

খণ্ড কবিতা প্রকাশ করাই পত্রখানির উদ্দেশ্য। কবিতা গুলিও নিতান্ত মন্দ নয়। শ্রীযুক্ত মো এস্লেম হক্ নামক জনৈক মুসলমান যুবক ইহাতে প্রায়ই পদ্য লিখিয়া থাকেন, তিনি ইহাতে দুই একটী বেশ সুমধুর কবিতা লিখিয়াছেন। "আত্মোপদেশ" নামক একটী কবিতা একজন 'আমিনা বিবি' নাম্নী মুসলমান বালা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রমণীর বাঙ্গালা কাব্যে এতদূর যত্ন দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম আমরা "আত্মোপ দেশের' শতদোষ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত, আশা করি অপরাপর মুসলমান

রমণীরাও আমিনা বিবিকে আদর্শ করিবেন। কিরণের কিরণ সম্প্রতি আলোক দীপ্তিশালী নহে কিন্তু স্নিগ্ধ বটে।

সারস্বত পত্র। ইহা একখানি সপ্তাহিক সংবাদ পত্র, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

ইহার ছাপা ভাল, লেখা ভাল, কাগজ ভাল, নিয়মিত সময়ে প্রকাশও হয়, ইহা অপেক্ষা সংবাদ পত্রের আর অধিক কি প্রশংসার বিষয় আছে। সমধিক গ্রাহক সংখ্যাই সংবাদ পত্রের জীবন, মূল্য সুলভ হইলে গ্রাহক সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই আমরা পত্রখানির মূল্য হ্রাস করিবার পরামর্শ দিতেছি।

ভাগলপুর নিউস। পাক্ষিক পত্র। ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত।

ইহা ইংরাজী ও হিন্দিভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণ বেহারী দিগের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের রুচি জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ করি ইহার জন্ম। উদ্দেশ্য প্রসংশনীয় বটে।

হীরাপ্রভা।—(রহস্য মূলক নীতিগর্ভ নবন্যাস) খণ্ডে খণ্ডে মাসিক প্রকাশিত হইতেছে। বুধোদয় যন্ত্র, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

পুস্তক খানি শেষ হয় নাই, সুতরাং ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, লেখক লিপিকুশল বটেন। কিরূপে রহস্য লিখিলে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।